এইচ্ জি ওয়েল্‌সের গল্প

সম্পাদক

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৬১
জুলাই ১৯৫৪

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেপেছেন
প্রথম সাত ফর্মা—পুলিনবিহারী টাট
এইচ্ এস্ প্রেস, বরাহনগর
বাকী বই—শ্যামসুন্দর ঘোষ
ঘোষ আর্ট প্রেস,
১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

এইচ. জি ওয়েল্‌সের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

এমন একদিন ছিল, খুব দূরে নয়, যখন বাঙলা সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ কোন আদর ছিল না। সেই জন্য অবস্থার চাপে এক শ্রেণীর লেখক অনুবাদ-কার্যকে পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের খুশি মতন অবৈজ্ঞানিক করে তোলেন। সৌভাগ্যের বিষয় পাঠকের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। আজ অনুবাদ-কার্য তার যোগ্য আসন অধিকার করতে চলেছে। এবং সেই সঙ্গে অনুবাদকের দায়িত্বও যথাবিধি নির্দিষ্ট হতে চলেছে। এই দায়িত্ব-বোধ সম্বন্ধে একান্ত সজাগ হয়েই অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির এইচ্ জি ওয়েল্‌সের এই অপূর্ব ছোট গল্পগুলিকে বাংলা ভাষার অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছেন।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-জগতে যাঁরা লেখনী চালনার দ্বারা সাহিত্যে আলোড়ন আনতে পেরেছেন, ওয়েলস তাঁদেরই একজন। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান তিনি। প্রথম জীবনে বহু ধাক্কা সামলে তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে পৌছতে হয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা কিশোরকালেই তাঁকে টাকা রোজগারের তাগিদে দোকানে ঠেলে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজের চেষ্টায় তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়। সামান্য স্কুল মাষ্টারী করতে করতে তিনি নিজের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানের দিকে ছিল তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করেন। সৌভাগ্যবশতঃ কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে তিনি সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী টি এইচ্ হাক্সলের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তাধারায় এই বিজ্ঞান-নায়কের দান বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ওয়েল্‌স্ সাহিত্যে বিজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র স্থান করে দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর নাগরিক হিসাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে, ওয়েল্‌স্

তার সুযোগ নিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে কবি-কল্পনাকে মিশিয়ে এক অপূর্ব রহস্যলোকের সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞানের সম্ভাব্য সত্যকে তিনি পাকা ওস্তাদের মতন দুর্দান্ত কল্পনার সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করেন যে অসম্ভবকে আর অসম্ভব বলে মনে হয় না, কল্পনাকে শুধু রূপকথা বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। তাঁর ছোট গল্পগুলির মধ্যেই তাঁর এই সাহিত্যিক কৌশল সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এবং বর্তমান গ্রন্থের প্রত্যেকটি গল্পই সেই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই গল্পগুলির মধ্যে পাঠক বর্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কলা-কুশলী সাহিত্যিকের নিপুণতা ষোল আনাই সম্ভোগ করতে পারবেন এবং সেই সঙ্গে মানব-মনের দুর্জ্ঞেয় এক রহস্য-লোকের সংস্পর্শে এসে নব নব আনন্দ ও বিস্ময়ের চেতনা অনুভব করবেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণে সমস্ত গল্পগুলি পরিমার্জিত হল, দুটো নতুন গল্পও সংযোজিত হল।

প্রকাশক

দৃষ্টিহীনের দেশ

শিম্বোরাজো থেকে তিনশোর বেশী, কোটোপ্যাক্সির তুষারের থেকে একশো মাইল দূরে, ইকুয়েডরের এ্যাণ্ডেস্ পাহাড়ের সবচেয়ে বন্য ও দুরধিগম্য অনুর্বর দেশে, সমগ্র পৃথিবীর লোক-চক্ষুর অন্তরালে রয়েছে সেই রহস্য-ঘন পাহাড়ী উপত্যকা, দৃষ্টিহীনের দেশ। অনেক, অনেক দিন আগে পরিচিত পৃথিবী থেকে বিপদসঙ্কুল, তুষার-শুভ্র সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করে এই উপত্যকার প্রশান্ত ঘনশ্যাম তৃণভূমিতে লোকের আসা সম্ভব ছিল এবং সত্য সত্যই পেরুদেশীয় অন্ত্যজদের একটি পরিবার তাদের স্পেনীয় শাসনকর্তার লালসা আর অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেই উপত্যকায় এসেছিল। তারপরেই মিন্দোবাম্বার সেই প্রবল বিপর্যয়—সতের দিন ধরে কুইটোতে রাত্রির মত অন্ধকার, ইয়াগুয়াচির ফুটন্ত জলে সুদূর গুয়ায়াকুইল পর্যন্ত সমস্ত মাছের মরে ভেসে ওঠা, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত তীরব্যাপী পাহাড় ধ্বসা, বরফ জমে যাওয়া, হঠাৎ বন্যা নামা,—অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা। তারপর একদিন উন্মত্ত আরাউকার একদিকের সমগ্র চূড়া বজ্রের বেগে ভেঙে পড়ে এই দৃষ্টিহীনের দেশকে চিরকালের জন্য অনুসন্ধানী মানুষের পদচিহ্ন থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছে। কিন্তু সেই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে একজন পৃথিবীর এই মহাবিপর্যয়ের সময়ে উপত্যকার ঠিক এই দিকে রয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে বাধ্য হয়ে ভুলতে হল ওপাশের সুন্দর-শ্রী উপত্যকা, তার স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, তার ধন সম্পত্তি; নীচের অপরিচিত পৃথিবীতে আবার নতুন

করে তাকে জীবনযাত্রা শুরু করতে হল। দুরারোহ পর্ব্বতের আশা-বাদী অভিযাত্রী সে, এই অভাবনীয় বিপদে মুহ্যমান হয়ে পড়ে নি; চেষ্টা করেছিল নতুন করে বাঁচতে—কিন্তু অসুখে সে অন্ধ হয়ে গেল এবং তার মৃত্যু হল এক খনির গভীরতম অন্ধকারে। কিন্তু তার মুখের কাহিনী আজও এ্যাণ্ডেসের আশেপাশে উপকথা হয়ে বেঁচে আছে।

সেই উপত্যকার দুর্গ থেকে তার ফিরে এদেশে আসার কারণ সে জানাল। শৈশবে একদিন একটা লামার পিঠে কতক মাল-পত্রের সঙ্গে বেঁধে তাকে ঐ উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ উপত্যকায় মনুষ্য-প্রার্থিত কোনো বস্তুরই অভাব নেই—সুস্বাদু জল, শস্য-শ্যামল ক্ষেত আর স্নিগ্ধ জলবায়ু; পাহাড়ের উর্বর মেটে ঢালুতে সুস্বাদু ফলের বাগান, আর একদিকে শৈল-স্খলিত তুষার-স্তূপের ওপর দুর্ভেদ্য ও উন্নত পাইন-বন। মাথার ওপর অনেক, অনেক উঁচুতে তিনদিক ঘিরে রয়েছে তুষার-মুকুট ধূসর-শ্যামল উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখর, কিন্তু প্রবল তুষারস্রোত সেদিক দিয়ে না গিয়ে পাহাড়ের অন্য পাশ দিয়ে বয়ে যায়, শুধু মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড তুষার-স্তূপ উপত্যকার দিকে ভেঙে ভেঙে পড়ে। এই উপত্যকায় নেই মেঘ-মেদুর বর্ষার ঘনঘটা বা তীব্র তুষারপাত, কিন্তু উচ্ছল ঝর্ণার প্রাচুর্যে সমস্ত উপত্যকা নদীমাতৃক দেশেই মতই শস্যশ্যামল। সেখানকার অধিবাসীরা সুখেই ছিল। তাদের গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু একটি কারণে তাদের সমস্ত সুখ নষ্ট হয়ে গেল। তাদের সমস্ত সুখ নষ্ট করার পক্ষে কারণটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। এক অজানা অসুখে সে দেশ সংক্রামিত হয়ে উঠেছিল,—নবজাত সমস্ত শিশু, এমন কি কিশোরদেরও অনেকেই অন্ধ হয়ে গেল। এই অন্ধ মহামারীর করালগ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই কোনো ওষুধ বা মন্ত্রের সন্ধানে সে সমস্ত বিপদ, দুর্বার পথ,

তুচ্ছ করে, সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়ে উপত্যকার এদিকে চলে এসেছিল। তখনকার দিনে এই সব অসুখের কারণ তাদের পাপের ফল বলেই ধরে নেওয়া হত, জীবাণুর বিষাক্তকরণের কথা কেউ চিন্তা করত না। তাই তার ধারণা হয়েছিল যে, ওই উপত্যকায় পুরোহিত-বিহীন প্রথম অধিবাসীদের মন্দির-প্রতিষ্ঠায় অবহেলাই এই দুরারোগ্য অসুখের একমাত্র কারণ। সে চেয়েছিল এই উপত্যকায় তৈরি হোক সুন্দর, সাধাসিধে, বাঞ্ছিত-ফল-প্রদানক্ষম একটি মন্দির। সে মন্দিরে থাকবে কোনও সাধুসন্তের পবিত্র চিহ্ন, দেবতার আশীর্বাদ আর মানুষের বিশ্বাসের সমন্বয়ে গ্রথিত কোনও রহস্যপূর্ণ পদক বা অন্য কিছু। তার থলিতে ছিল উপত্যকা থেকে নিয়ে আসা খানিকটা কাঁচা রূপোর টুকরো। কি করে সেটিকে পেল তার কোনও সদুত্তর দিতে পারত না, অথচ এত জোর গলায় সে জানাত যে সে যে উপত্যকা থেকে আসছে সেখানে একটুকরোও রূপো পাওয়া যায় না, যে তাকে এক অপটু মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই মনে করা যেত না। সে জানাল, উপত্যকার অধিবাসীদের অর্থে বা অলঙ্কারে বিশেষ কোনো প্রয়োজন না থাকায় তারা সমস্ত একত্র সংগ্রহ করে তাকে দিয়েছে, শুধু তাদের এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে কোনো দৈব সাহায্য লাভের জন্য। কল্পনা করতে পারি নিচের এই পৃথিবী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সেই ক্ষীণদৃষ্টি, রোদে-পোড়া, দুর্বল পাহাড়িয়া তার কাহিনী কোনো এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি মনোযোগী পুরোহিতের কাছে বলছে; আরও একটি ছবি চোখের উপর ভেসে ওঠে—উপত্যকাকে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কোনো অমোঘ দৈব প্রতিষেধক নিয়ে ফেরার জন্য তার উদগ্র ব্যাকুলতা, সেই বিরাট ভূকম্পের পর গিরিসঙ্কটের মুখে অলঙ্ঘনীয় উত্তুঙ্গ স্তূপ দেখে অসীম হতাশায় উদ্বেলিত হৃদয়ে স্থাণু হয়ে থাকা। তার এই দুর্ভাগ্যের কাহিনীর শেষটুকু আমার জানা নেই,

শুধু জানি, কয়েক বছর পর তার শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল। হায়রে, দূরদেশী গৃহহারা! যে ঝর্ণার জল-প্রবাহে একদিন গিরিসঙ্কট তৈরী হয়েছিল, তা আজ একটি গুহার মুখ ভেদ করে ঝরে পড়ছে এবং তার এই অসংলগ্ন কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরে, 'কোন্ এক অজানা অন্ধ জগতের রূপকথা'য় পরিণত হয়েছে। আজও সে কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়।

সেই বিস্মৃত, বিচ্ছিন্ন উপত্যকার সামান্যসংখ্যক অধিবাসীদের মধ্যে সেই অসুখটি চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। বৃদ্ধেরা ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে গেল, যুবকেরা অত্যন্ত অল্প দেখতে লাগল এবং তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানেরা হল একেবারে অন্ধ। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর অগোচরে সেই তুষার-বেষ্টিত উপত্যকায় জীবন-যাত্রা ছিল সুন্দর, সরল এবং সহজ। সেখানে ছিল না কোনো কাঁটা গাছ বা ঝোপ, কোনো পতঙ্গ বা হিংস্র জন্তু—শুধু ছিল একপাল লামা, যাদের তারা একদিন সেই গিরিশঙ্কটের শুকনো নদীর বালি ধরে তাদের আসার সময় অতি কষ্টে টেনে এনেছিল। এত ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল যে তারা তাদের এই চরম ক্ষতি লক্ষ্য করেনি। তাদের অন্ধ সন্তানদের তারা এই উপত্যকায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এত সুপরিচিত করে দিয়েছিল যে তার প্রতিটি আনাচ কানাচ পর্যন্ত তাদের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সেই উপত্যকার সকলের কাছ থেকে দৃষ্টি চিরকালের জন্য হারিয়ে গেলেও সে জাত নিঃশেষ হয়ে যায় নি। পাথরের উনুন তৈরি করে আগুনের ব্যবহারেও তারা পারদর্শী হয়ে উঠল। তারা সরল প্রকৃতির ছিল, শিক্ষার বিশেষ ধার ধারত না। স্পেনীয় সভ্যতাও তাদের মধ্যে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি। প্রাচীন পেরুর ললিত কলা আর হারিয়ে-যাওয়া দর্শনের ক্ষীণ ধারা মাত্র তাদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। এক এক করে কেটে গেল কয়েক পুরুষ।

কত জিনিষ তারা ভুলে গেল, কত জিনিষ আবার উদ্ভাবন করে নিল। যে বিশাল পৃথিবী থেকে তারা একদিন এই উপত্যকায় এসেছিল, তার অতীত ঐতিহ্য আজ রূপকথা। সববিষয়েই তারা ছিল সক্ষম শক্তিমান, ছিল না শুধু দৃষ্টি। তারপর তাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করল একজন অপূর্ব মৌলিক মন নিয়ে—তার বাক্‌পটুতা, তার যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতায় সে তাদের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠল। তারপর এল আর একজন। তারা চলে গেল, কিন্তু ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনে তারা অক্ষয় রেখাপাত করে গেল। এই অল্পসংখ্যক নাগরিক সংখ্যায় ও বুদ্ধিতে ক্রমবর্ধমান হয়ে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত সমস্যার সমাধানও যথাসম্ভব করতে লাগল। এক এক করে কেটে গেল কয়েক পুরুষ। আবার কয়েক পুরুষ কেটে গেল। যে লোকটি একদিন সামান্য একটি রূপোর টুকরো নিয়ে এই উপত্যকার বাইরে বিশাল পৃথিবীর জনতার মধ্যে চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছিল, তার পরে পনের পুরুষ কেটে গেছে। এমন সময় হঠাৎ বাইরের পৃথিবী থেকে একজন এই অধিত্যকার জন-সমাজের মধ্যে এসে পড়েছিল। এবং সেই লোকটিরই এই কাহিনী।

কুইটোর কাছাকাছি কোনো এক জায়গার সে ছিল পাহাড়িয়া,—উত্তাল সাগরযাত্রায় দেশদেশান্তরের জীবনের সঙ্গে ছিল তার পরিচয়, অভিনব মৌলিক পন্থায় হয়েছিল তার শিক্ষা সমাপন। এক অভিযাত্রী ইংরেজদল এসেছিল ইকুয়েডরে পাহাড়ে চড়ার জন্য; তিনজন সুইস্ পথপ্রদর্শকের মধ্যে একজন হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় এই উৎসাহী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবককে তার জায়গায় নেওয়া হয়েছিল। একটি দুটি করে একে একে প্রায় প্রত্যেকটি পর্বতশিখর সে অতিক্রম করল, তারপর এল তার এ্যাণ্ডেসের সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ পেরাস্‌কোটোপেটল অভিযান। এখানেই সে বহির্জগতের কাছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কাহিনী অনেকবার

লেখা হয়েছে, তার মধ্যে পয়েণ্টারের বিবরণীই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি নাটকীয় ঘাতে-সংঘাতে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন স্নেঙ্কের সেই রোমহর্ষক অন্তর্ধান-কাহিনী—কী অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই অভিযাত্রী দল খাড়াই পাহাড় বেয়ে অতি কষ্টে শেষ এবং সর্বোচ্চ পর্বত-শিখরের পাদদেশ পর্যন্ত উঠেছিল, কীভাবে একটি পাথরের উপর তুষারের মধ্যে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করেছিল এবং কি করে তারা জানতে পারল যে স্নেঙ্ক তাদের মধ্য থেকে চলে গেছে। তারা সকলে চীৎকারে দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পায় নি। তাদের সমবেত চীৎকার আর বাঁশির শব্দে সমস্ত পাহাড় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, অবশিষ্ট রাতে আর তারা চোখের পাতা এক করতে পারে নি।

ভোরের আলোয় স্নেঙ্কের পড়ে যাওয়ার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। কোনো আর্তনাদের সময়ও বোধহয় সে পায় নি। পূবে, পাহাড়ের অজানা দিকে—অনেক, অনেক নীচে খাড়াই ঢালুতে শৈল-স্খলিত তুষার-স্তূপের মধ্যে সে পিছিলিয়ে পড়েছিল। তার স্খলিত পথের শেষ হয়েছিল উত্তুঙ্গ ভয়াবহ পর্বত-শৃঙ্গের পাদদেশে, তারপর সব অন্ধকার। অনেক, অনেক নীচে এক সঙ্কীর্ণ, পর্বত-বেষ্টিত উপত্যকা, সেই বিস্তৃত দৃষ্টিহীনের দেশের সারবন্দী গাছ দূরত্বে মলিন হয়ে আছে। কিন্তু তারা জানতে পারেনি যে ওই-ই সেই দৃষ্টিহীনের দেশ,—অন্য কোনো সঙ্কীর্ণ উপত্যকা থেকে তার প্রভেদ লক্ষ্য করতে তারা পারেনি। এই দুর্ঘটনায় ভীত হয়ে তারা বিকেল বেলায় পর্বতাভিযান পরিত্যাগ করল এবং আর একবার চেষ্টা করার পূর্বেই পয়েণ্টারকে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়েছিল। আজও পেরাস্কোটোপেটল তার অজেয় পর্বতশৃঙ্গ উন্নত করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শুধু পর্বত-শৃঙ্গের পাদদেশে পয়েণ্টারের আশ্রয়-শিবিরের ধ্বংসাবশেষ তুষার-স্তূপে সমাধিলাভ করেছে।

কিন্তু যে মানুষটি পড়ে গিয়েছিল, বেঁচে গেল সে।

প্রায় দু'হাজার ফুট নিচে আগেকার চেয়েও অনেক খাড়াই একটি বরফের ঢালের ওপর তুষার-মেঘের মাঝে এসে পড়ে সে অজ্ঞান হয়ে গেল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার শরীরের একটা হাড়ও ভাঙেনি। সেখান থেকে আবার ছিট্‌কে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে গিয়ে পড়ল সেখানকার ঢালু ততটা গড়ানে নয়। খানিকটা গড়াবার পর তার সঙ্গে নেমে-আসা নরম সাদা তুষার-স্তূপের মধ্যে সে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। জ্ঞান হলে পর তার যেন কেমন মনে হতে লাগল যে সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তারপর তার সহজাত পাহাড়ী বুদ্ধিতে সে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারল। নিজেকে কোন রকমে তুষারমুক্ত করে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আকাশের তারা লক্ষ্য করে বাইরে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে চুপচাপ শুয়ে সে ভাবতে লাগল—সে এখন কোথায়, তার কী হয়েছে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভাল করে লক্ষ্য করল। কোটের বোতামগুলো চূর্ণ হয়ে গেছে. কোটটি মাথার সঙ্গে জড়ানো। ছুরিটা পকেট থেকে পড়ে গেছে, থুতনির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও টুপিটা কোথায় গেছে হারিয়ে। মনে পড়ল, পাহাড়ের ওপর তার আশ্রয়-স্থানটির দেওয়াল উঁচু করার জন্য সে আল্‌গা পাথর খুঁজছিল। তার বরফ-কাটা কুঠারও নিরুদ্দেশ হয়েছে।

মনে হল, সে নিশ্চয়ই পড়ে গেছে এবং কতখানি পড়েছে, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। উদীয়মান চাঁদের আলো তার স্খলন-পথকে অস্বাভাবিক উঁচু এবং ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। শুয়ে শুয়ে সে হতবুদ্ধির মত দেখতে লাগল—ওপরের পর্বত-শৃঙ্গ কেমন করে অপস্রিয়মান অন্ধকার ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। তার ভৌতিক ও রহস্যময় সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে সে হাসতে হাসতে হঠাৎ উন্মাদের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ...

অনেকক্ষণ পরে তার মনে হল সে তুষার-শৃঙ্গের নিম্নতম প্রান্তে এসে পড়েছে। চাঁদের আলোয় দেখা যায়, নীচে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের এক অন্ধকার কোণে যেন পাথর-ছড়ানো একটুকরো সবুজ ঘাস বিছোনো রয়েছে। কোনও রকমে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, শরীরে অত্যন্ত বেদনা। সর্বাঙ্গের স্তূপীকৃত তুষার ঝেড়ে ফেলে কোনো রকমে সেই সবুজ ঘাসজমিতে নেমে গেল। তারপর একটা বড় পাথরের পাশে ঝুপ্ করে শুয়ে পড়ল। ভিতরের পকেট থেকে ফ্লাস্ক বের করে একবার গলা ভিজিয়ে নিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক, অনেক নীচে থেকে গাছের পাখিদের সমবেত কলতানে তার ঘুম ভাঙল।

উঠে বসল সে। তাকিয়ে দেখল, খাঁজকাটা পাহাড়ের পাশে এক গভীর খাদের পাদদেশে ছোট একটুকরো ঘাসজমির ওপর সে রয়েছে; তারই সামনে আর একটা পাহাড়ের দেয়াল আকাশ পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পূব-পশ্চিমমুখী গিরিপথ প্রভাত-কিরণে ঝলমল করে উঠেছে; স্খলিত পাহাড়ে অবরুদ্ধ পশ্চিমের ঢালু গিরি-সঙ্কট পর্যন্ত সে আলোয় হেসে উঠেছে। মনে হল, তার নীচেও ঠিক এই রকমই আর একটি খাঁজ নেমে গেছে; সেই নালি-পথের তুষার পার হয়ে একটা চিমনির মত চোখে পড়ল। চিমনিটার ফাটল দিয়ে ঝিরঝির করে তুষার-গলা জল ঝরছে, কোনো দুঃসাহসিক হয়ত মরিয়া হয়ে সেটা বেয়ে নামতে পারে। যতখানি কঠিন মনে হয়েছিল, তার চেয়ে সহজই সে দেখল এবং সেখান থেকে আর একটি সবুজ ঘাসজমিতে সে নেমে এল। তারপর তেমন কোনো কঠিন চড়াই পাহাড় না ভেঙে সে ঢালু জমির ওপরে একসার ঝাউ গাছের কাছে এসে উপস্থিত হল। নিজের উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে সে সেই গিরি-

সঙ্কটের দিকে মুখে ফেরাল। এই গিরিসঙ্কট শেষ হয়েছে এক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিতে, কতকগুলো অপরিচিত ধরণের পাথরের কুটির সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এক এক সময় তাকে হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর ভোরের সূর্যের কাঁচা আলো গিরি-সঙ্কটের অন্তরালে মিলিয়ে গেল, কলমুখর পাখির সঙ্গীত হারিয়ে গেল, হিমশীতল বাতাসে প্রাতঃকালীন উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে এল। কিন্তু দূরের সেই উপত্যকা আর তার কুটির আরও উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। পাহাড়ের গায়ে এক অপরিচিত গুল্ম একটা ফাটল থেকে তার সবুজ ডালপালা ছড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তারই একটি ডাঁটা তুলে নিয়ে কামড়ে দেখল, বেশ সুস্বাদু।

অবশেষে প্রায় দুপুরে সেই গিরিসঙ্কটের মুখ-গহ্বর পার হয়ে যখন সে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সমতল ভূমিতে এসে পড়ল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। অত্যন্ত শ্রান্তদেহে একটা পাথরের ছায়ায় বসে পড়ল। ঝর্ণার জলে জলপাত্র পূর্ণ করে আকণ্ঠ পান করল। সামান্য বিশ্রামের পর সে কুটিরগুলোর দিকে যাত্রা করল। সমস্তই কেমন যেন অদ্ভুত বোধ হতে লাগল। যতই এগিয়ে যেতে লাগল, সেই উপত্যকার সমস্ত পারিপার্শ্বিক আরো বিচিত্র, আরো অপরিচিত বলে মনে হল। সুন্দর রঙিন ফুল-ছড়ানো দূর্বাশ্যামল সমতল উপত্যকাটির প্রায় সর্বত্রই অত্যন্ত যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে জল-সেচন ও চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপত্যকার ওপরে একটা প্রাচীর, মনে হয় যেন একটা জলপ্রণালীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছোট ছোট জলের ধারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত উপত্যকার গাছপালার মধ্যে সজীবতা এনে দিয়েছে। ওপরের পাহাড়ের ঢালু গায়ে অপ্রচুর তৃণভূমিতে একপাল লামা চরে বেড়াচ্ছে। সীমান্ত দেয়ালের এখানে সেখানে লামাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। জল-সেচনের নালাগুলি উপত্যকার মাঝখানে একটি প্রধান খালে গিয়ে পড়েছে। এই খালটি খুব সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে

বাঁধ দেওয়া। এই জলসেচনের প্রণালী আর সাদা-কালো পাথরে বাঁধানো অদ্ভুত রাস্তাগুলো এই নির্জনতার বুকে নাগরিকতার ছাপ এঁকে দিয়েছে।

মধ্য-গ্রামের বাড়িগুলো তার পরিচিত পাহাড়ী গ্রামের ঘর বাড়ির মত ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ও অপরিষ্কার নয়। মাঝের রাস্তাটি আশ্চর্য রকমের পরিষ্কার, তার দু'পাশে বাড়িগুলো সারবন্দী ভাবে সাজানো। বাড়ির সামনের দিকটা রঙচঙে, একটা করে দরজা সেখানে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু কোথাও জানলার চিহ্নমাত্র নেই। অসতর্কভাবে ও অনিয়মে বাড়ীগুলো রঙ করা—কোথাও ধূসর, কোথাও মেটে, কোথাও শ্লেটের মতো কালো, কোথাও গাঢ় বাদামী রঙ। এই অদ্ভুত রঙ বাহারী পলস্তারা দেখে সেই অভিযাত্রী পথিকের মনে 'অন্ধ' কথাটি সন্দেহ হয়। তখনই তার মনে হয়, বাদুড়ের মত অন্ধ কোনো লোক এই পলস্তরা করেছে।

খাড়াই ধরে নেমে দেয়ালের কাছে এসে সে দেখল, উপত্যকার শেষ প্রান্তে একদল স্ত্রী ও পুরুষ স্তূপীকৃত ঘাসের ওপর বসে সামান্য বিশ্রাম করছে, গ্রামের কাছাকাছি কতগুলো ছেলে শুয়ে আছে, এবং তারই খুব কাছে তিনটি লোক কাঁধের ভারে জলপাত্র নিয়ে একটা সরু রাস্তা ধরে ঘরবাড়িগুলোর দিকে যাচ্ছে। তাদের পরিধানে লামার চামড়ার পোষাক, চামড়ার জুতো এবং বেল্ট, কাপড়ের টুপি। পর পর এক সারে সারা রাত্রির অনিদ্রাগ্রস্ত লোকের মত হাই তুলতে তুলতে ধীরে ধীরে তারা যাচ্ছিল। তাদের হাবে-ভাবে এমন সম্ভ্রান্ত আচরণ প্রকাশ পাচ্ছিল যে নুনেজ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করল, কিন্তু তারপর একটা পাথরের ওপর উঠে নিজেকে স্পষ্ট করে জাহির করে সে এক তীব্র চীৎকার করল—সারা উপত্যকায় সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াতে লাগল।

লোক তিনটি হঠাৎ থেমে পড়ে চারিদিকে মাথা ঘোরাতে লাগল। মনে হল, তারা যেন কাকে খুঁজছে। তাই নুনেজ তার

হাত-পা ছুঁড়ে তাদের ইশারা করতে লাগল। কিন্তু তারা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের কিছুই দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ পরে দূরের পাহাড়ের দিকে তারই চীৎকারের প্রত্যুত্তরে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল। মুনেজও চীৎকার করে উঠল, তারপর আরও একবার, তারপর নিষ্ফল হাত-পা ছোঁড়ার পর তার মনে আর একবার 'অন্ধ' কথাটা সাড়া দিল। বলে উঠল, 'বোকা লোকগুলো নিশ্চয়ই অন্ধ'।

অবশেষে অনেক চীৎকার আর আক্রোশ প্রকাশের পর সে যখন একটা ছোট পুল দিয়ে ঝর্ণা পার হয়ে দেয়ালের মাঝের দরজা অতিক্রম করে ভিতরে তাদের কাছে এল, তখন সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে তারা একেবারে অন্ধ। এইটিই যে সেই রূপকথার দৃষ্টিহীনের দেশ, তাতে আর তার সন্দেহ রইল না। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতেই এক দুঃসাহসিক অভিযান তার মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠল। লোক তিনটে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার দিকে একেবারও না তাকিয়ে, শুধু তার দিকে কান পেতে তারা তার অপরিচিত পদধ্বনি লক্ষ্য করতে লাগল। ভয়-পাওয়া লোকের মত তারা গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের চোখের পাতা বোজা, চোখ গর্তে বসানো—চোখের তারা যেন কোথায় শুকিয়ে বসে গেছে। তাদের পীতাভ মুখে ভীত পাংশু ছায়া।

'মানুষ,' দুর্বোধ্য স্পেনীয় ভাষায় কে একজন বলল, একটা মানুষ—কিংবা কোন ভৌতিক আত্মা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে।

কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠ যুবকের নবযৌবনের দৃপ্ত পদক্ষেপে মুনেজ এগিয়ে এল। হারানো উপত্যকা আর দৃষ্টিহীনের দেশের সমস্ত কাহিনী তখন তার মনে ভীড় করে এসেছে, তার চিন্তার জালে কোনো গানের সঞ্চারীর মত একটি কলি শুধু বারবার ঘুরে বেড়াতে লাগল:

দৃষ্টিহীনের দেশের রাজা একচক্ষু মানুষ
দৃষ্টিহীনের দেশের রাজা একচক্ষু মানুষ

তাই অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে সে তাদের অভিবাদন করল। সোজা তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ও কোথা থেকে আসছে ভাই পেড্রো? একজন প্রশ্ন করল।

পাহাড়ের ভেতর থেকে।

পাহাড়ের ওপার থেকে আমি আসছি, নুনেজ বলে উঠল—, ঐ উঁচু পাহাড় থেকেও অনেক দূরে আমার দেশ—যেখানে মানুষ দেখতে পারে। বোগোটার কাছাকাছি সে জায়গা; সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, সেখানে শহরের শেষ প্রান্ত দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে যায়।

দৃষ্টি! পেড্রো বিড় বিড় করে উঠল, দৃষ্টি?

পাহাড়ের ভেতর থেকে ও আসছে, দ্বিতীয় অন্ধ বলে উঠল।

নুনেজ লক্ষ্য করল, ওদের কোটের কাপড় অদ্ভুত ধরণের; প্রত্যেকটিই বিভিন্নভাবে সেলাই করা।

তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে সকলকে এক সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে চমকে উঠল। এই প্রসারিত হাতগুলো এড়াবার জন্য পিছু সরে গেল সে।

তার এই সরে-যাওয়া আন্দাজ করে চট্ করে তার হাতটি আঁকড়ে ধরে তৃতীয় অন্ধটি বলল, এদিক এস।

নুনেজকে ধরে তারা হাত দিয়ে তার সমস্ত শরীর অনুভব করতে লাগল। তাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটিও কথা সে বলল না।

সাবধান, একটা চোখে আঙুল চেপে সে চীৎকার করে উঠল। তার চোখের পাতার ওঠা নামা অনুভব করে তারা যেন তার শরীরে এক অদ্ভুত জিনিষের সন্ধান পেয়েছে। আবার তারা তার চোখের পাতাটা অনুভব করার চেষ্টা করল।

পেড্রো নামে লোকটি বলল, এ এক অদ্ভুত জীব, কোরিয়া। ওর খস্‌খসে চুলে হাত দিয়ে দেখ, যেন লামার ঘন লোম!

যে পাহাড়ে ওর জন্ম, ও ঠিক তারই মত কর্কশ, মুনেজের অ-কামানো দাড়িতে তার ভিজে, নরম হাত বুলিয়ে কোরিয়া বলল, পরে হয়ত ও একটু সুন্দর হবে। মুনেজ তাদের পরীক্ষার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটু চেষ্টা করল, কিন্তু তারা তাকে বজ্রমুষ্টিতেই ধরে রেখেছিল।

সাবধান, আবার বলে উঠল সে।

কথা বলছে,—তৃতীয় লোকটি বলল, তবে নিশ্চয়ই এ একটা মানুষ।

উঃ! তার কোটের অমসৃণতায় পেড্রো চমকে ওঠে।

তুমি তাহলে পৃথিবীতে এসেছ? পেড্রো জিজ্ঞাসা করল।

পৃথিবীর বাইরে এসেছি। পর্বত আর তার তুষার-নদী ছাড়িয়ে, এখান থেকে সূর্যের দূরত্বের আধাআধি দূরে আমার দেশ। বারো দিন সমুদ্রের পথ পেরিয়ে বিশাল পৃথিবীর বাইরে এসে পড়েছি।

তারা তার কথায় কান-ই দিল না। কোরিয়া বলল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন যে প্রাকৃতিক উপাদানে মানুষের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন ধর,—উত্তাপ, জলীয় বাষ্প, আর যত সব পচা আর গলিত পদার্থ।

পেড্রো বলল, একে মাতব্বরদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাক্‌।

কোরিয়া বলল, আগে চীৎকার করে সকলকে সাবধান করে দাও, নয়ত ছোটরা ভয় পাবে। কী মজার ব্যাপার!

তারা চীৎকার করে উঠল। পেড্রো এগিয়ে গিয়ে মুনেজের হাত ধরে তাদের বাড়ীর দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আমি দেখে চলতে পারি।

দেখা! কোরিয়া আকাশ থেকে পড়ল।

হ্যাঁ, দেখা, তার দিকে ফিরে মুনেজ বলে উঠল, কিন্তু তক্ষুনি পেড্রোর জলপাত্রের ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ল।

ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় এখনো অপরিণত, তৃতীয় অন্ধটি জানা'ল—ধাক্কা খায়, আজে-বাজে অর্থহীন কথা বলে। ওকে হাত ধরে নিয়ে চল।

বেশ, তোমাদের যা ইচ্ছে, মুনেজ হাসতে হাসতে তাদের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

মনে হয়, তারা দৃষ্টির কথা কিছুই জানে না। যাই হোক্, সময় মত তাদের সমস্ত সে শিখিয়ে দেবে।

দূর থেকে মানুষের কোলাহল স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গ্রামের মাঝের রাস্তায় কতক লোকের মূর্তি জড় হতেও দেখা যায়।

দৃষ্টিহীনের দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যতখানি সে আশা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী তার শক্তি ও ধৈর্য পীড়ন করল তাকে। কাছে এগিয়ে এসে দেখল, জায়গাটা অনেক বড়, সেই পলস্তরা আরো অদ্ভুত এবং একদল শিশু ও স্ত্রী-পুরুষ তাকে ঘিরে তাদের নরম হাতে ধরে, তার কথা শুনতে শুনতে চলেছে (চোখ বোজা সত্ত্বেও মেয়েদের অনেককে বেশ সুন্দরী দেখে তার মনে আনন্দও হল)। কয়েকটি শিশু আর তরুণী ভয়ে ভয়ে তার কাছ থেকে দূরে দূরে হাঁটছিল। তাদের নরম কণ্ঠস্বরের কাছে নিজের কর্কশ ও ভারী গলা সত্যিই কেমন বিসদৃশ মনে হচ্ছিল। তার তিনটি পথ-প্রদর্শক তাকে ধরে ভারিক্কি চালে হাঁটতে হাঁটতে অনুসরণকারীদের বলল, পাহাড়ের ভেতরের একটা বুনো লোক।

বোগোটা,—সে উত্তর দিল, বোগোটায়, পাহাড়ের চূড়ার ওপারে আমার বাস।

পেড্রো বলল, বুনো লোক, তাই বুনো কথা বলছে। শুনলে না,—বোগোটা! ওর মন এখনো তৈরী হয় নি; এই সবে কথা বলতে শিখেছে।

একটা ছোট ছেলে তাঁর হাত ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে ভেংচি কেটে বলে উঠল,—বোগোটা!

হ্যাঁ, বোগোটা। তোমাদের এই গ্রামের তুলনায় সে এক মহানগর। আমি এসেছি বিশাল পৃথিবী থেকে—সেখানে মানুষের চোখ আছে, দেখতে পারে।

ওর নাম বোগোটা, সকলে বলাবলি করতে লাগল।

কি কাণ্ড! বলে উঠল কোরিয়া—এইটুকু আসতেই ও দু'বার হোঁচট খেয়েছে!

চল চল, ওকে নিয়ে মাতব্বরদের কাছে যাওয়া যাক্।

তারা হঠাৎ তাকে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। ঘরটি অন্ধকার, পিচের মত কালো। শুধু এককোণে একটা আগুন টিপ টিপ করে জ্বলছে। তার পিছনে যে জনতা ভিড় করে দাঁড়াল, দিনের আলোর ক্ষীণতম আভা ছাড়া আর সবই তাদের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তাদের অতর্কিত ধাক্কা থেকে সামলে নেবার চেষ্টা করার আগেই সে একজন বসে-থাকা মানুষের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়বার সময় তার প্রসারিত হাত কার মুখের ওপর সজোরে গিয়ে পড়ল, অনুভব করল তার নরম শরীরের কোমলতা এবং শুনতে পেল এক ক্রুদ্ধ চীৎকার। কতগুলো হাত তার দিকে এগিয়ে আসছিল,—তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ তাকে লড়াই করতে হল। এক তরফা যুদ্ধ। হঠাৎ সমস্ত পরিস্থিতি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠায় নিঃসাড় হয়ে শুয়ে রইল সে।

বলল, আমি পড়ে গেছি, এই দারুণ অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

সামান্য নিস্তব্ধতা, মনে হল যেন তার চতুর্দিকের দৃষ্টিহীন লোকেরা তার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করছে। তারপর কোরিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ও এই সবেমাত্র তৈরি হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে টলে

টলে পড়ে, আর মাঝে মাঝে এমন কথা বলে যার কোনো মানেই হয় না।

অন্য সকলেও তার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলতে লাগল যা সে স্পষ্ট শুনতে বা বুঝতে পারল না।

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, উঠে বসব কি? আমি আর আপনাদের সঙ্গে হাতাহাতি করব না।

পরামর্শের পর তাকে বসতে দেওয়া হল।

বৃদ্ধের গলায় কে একজন তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল, আর উত্তরে এই দৃষ্টিহীনের দেশের অন্ধকারের বর্ষীয়ান অধিবাসীদের নুনেজ বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল—এই উপত্যকার বাইরের বিশাল পৃথিবীর রহস্য; আকাশ, পাহাড়, দৃষ্টি এবং এই ধরণের আশ্চর্য জিনিষ। কিন্তু তারা কিছুতেই তার কোনো কথা বিশ্বাস করবে না বা বুঝবে না। এতটা নুনেজ আশঙ্কা করতে পারেনি। তার অনেক কথার মানেও তারা বুঝতে পারে না। চৌদ্দ পুরুষ ধরে এখানকার অধিবাসীরা অন্ধ, দৃষ্টির জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তাদের ছিন্ন, সমস্ত জিনিষের নাম তাদের মন থেকে মুছে বদলে গেছে। বাইরের পৃথিবীর কথা আজ তাদের কাছে ছোটদের রূপকথার মত; এবং তাদের চারিপাশের পাহাড়ের পাঁচিলের বাইরের সবকিছুর সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্কও লুপ্ত। এই অন্ধ অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করেছেন; বিগত দিনের দৃষ্টিমান পূর্বপুরুষদের যত বিশ্বাস যত সংস্কার তাদের মধ্যে তখনো ছিল—তার মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করে জানালেন,—ও সব কল্পনা, বুজরুকি। তার বদলে তাঁরা সে-সবের নতুন অর্থ করে দিলেন। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ওদের কল্পনাশক্তিও খর্ব হয়ে এসেছিল। ওদের কল্পনা ছিল প্রথমে চক্ষু সম্পর্কিত। কিন্তু ধীরে ধীরে তা নিজের রূপ বদলে নতুন করে কান আর আঙুলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে নুনেজ

একথা বুঝতে পারল, বুঝতে পারল যে তার জন্ম এবং প্রতিভার জন্য এদের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা বা বিস্ময় সে আশা করেছিল, সেদিক থেকে তাকে নিতান্ত নিরাশ হতে হবে। দৃষ্টির সঠিক ব্যাখ্যার জন্য সুনেন্দ্রের ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে ওরা কোনো আমলই দিলনা—দৃষ্টি নাকি নবজাত প্রাণীর অসংলগ্ন অনুভূতির বহিঃ-প্রকাশ! একটু হতাশ হয়ে সে এবার তাদের কথায় কান দিল। অন্ধ অধিবাসীদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি তাকে জীবন, দর্শন এবং ধর্মে শিক্ষা দিতে লাগলেন—প্রথমে এই পৃথিবী (অর্থাৎ তাঁদের উপত্যকা) শুধু পাথরের মধ্যে এক নির্জন বিশাল গর্ত মাত্র ছিল, তারপর এল নিষ্প্রাণেরা, তারপর লামা এবং অন্যান্য জীবজন্তু যাদের সামান্য বোধশক্তি আছে, তারপর এল মানুষ। সব শেষে এলেন পরীরা—যাঁদের গান কিংবা ঝটপট শব্দ শোনা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায়না। সুনেন্দ্র তো প্রথমে বুঝতেই পারল না তারা কারা—হঠাৎ মনে হল, হয়ত পাখি হতে পারে।

তিনি সুনেন্দ্রকে বলে চললেন, কি করে সময়কে 'উষ্ণ' এবং 'শীতল' করে ভাগ করা হয়েছে,—অন্ধদের দিন আর রাত—গরমে ঘুমোতে এবং ঠাণ্ডায় কাজ করতে কী আনন্দ! সে না এলে এতক্ষণে এই দেশের সকলেই ঘুমে নিঃসাড় হয়ে পড়ত। তিনি বললেন, সুনেন্দ্রকে আলাদা করে এই জন্য তৈরী করা হয়েছে যে, তাঁরা যে জ্ঞান আহরণ করেছেন তা তাকে শিখতে হবে এবং তার মানসিক বিকাশের অপরিপূর্ণতার ও টলে টলে পড়ে যাওয়ার জন্য তাকে অত্যন্ত যত্ন এবং সাহসের সঙ্গে সমস্ত কিছু শিখতে হবে। তাই শুনে দরজার আশেপাশের সকলেই সানন্দ গুঞ্জনে সমর্থন জানাল। তিনি বললেন, এখন অনেক রাত হয়েছে—কারণ অন্ধরা দিনকে রাত বলে—তাই সকলেরই এখন ঘুমিয়ে পড়া দরকার। সুনেন্দ্র ঘুমোতে জানে কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। সুনেন্দ্র জানাল সে জানে, কিন্তু তার আগে সে চায় খাবার।

খাবার এল—বাটিতে করে লামার দুধ আর পোড়া শ্লেষ্মা রুটি। তাকে ধরে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল, যেখান থেকে তারা তার খাওয়া শুনতে পারবে না। যতক্ষণ না আবার পাহাড়ী সন্ধ্যার শীতলতায় দিন শুরু করতে তাদের উঠতে হয়, ততক্ষণ যেন সে সেখানে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু নুনেজ একটুও গড়াল না।

বরং সে সেখানে উঠে বসল, এবং তার এখানে আসার পর থেকে অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি মনের মধ্যে বারবার আলোচনা করতে লাগল।

প্রতি মুহূর্তেই সে হেসে উঠছিল—কখনও ঘৃণায়, কখনও বা কৌতুকে।

অপরিণত মন!—নিজের মনে বলল,—এখনও ইন্দ্রিয়-শক্তি পায় নি! ওরা জানে না যে ওদের স্বর্গ-প্রেরিত রাজাকে, ওদের প্রভুকে ওরা অপমান করছে। ওদের আমার মতে এবং পথে আনতেই হবে! আমার এখন শুধু ভেবে দেখা দরকার।

সূর্যাস্ত হল, তখনও সে ভাবছে।

নুনেজ ছিল সৌন্দর্যের উপাসক। সেই উপত্যকার চারপাশের পাহাড়ের ওপরে জমাট তুষারে ও তুষার-স্রোতে সূর্যাস্তের রক্ত-রঙীন আলোর খেলা—এরকম সে কোনো দিন আর তার জীবনে দেখে নি। উত্তুঙ্গ পর্বত-শিখর থেকে তার দৃষ্টি নেমে এল গোধূলির ম্লান আলোয় স্তিমিত ছোট গ্রামে আর তার সযত্নকর্ষিত শস্যশ্যামল ক্ষেতের ওপর। হঠাৎ সে অভিভূত হয়ে উঠল, তাকে এই অবিনশ্বর সৌন্দর্য উপভোগের জন্য দৃষ্টিশক্তি দেওয়ায় সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

গ্রাম থেকে তাকে ডাকছে সে শুনতে পেল,—ওহে, ও বোগোটা! এদিকে এস।

শুনে সে হেসে উঠে দাঁড়াল। একবার শেষবারের মত সে দেখাতে চায়, দৃষ্টির সাহায্যে মানুষের পক্ষে কী করা সম্ভব! তারা তাকে খুঁজে ফিরবে, কিন্তু ধরতে পারবে না।

নড়ো না, বোগোটা! সেই গলা শোনা গেল।

নিঃশব্দে হেসে ও পথ থেকে সন্তর্পণে দু'পা পাশে সরে দাঁড়াল।

ঘাস মাড়িও না, বোগোটা। ও নিয়ম নেই।

নুনেজ নিজেই তার পায়ের শব্দ শুনতে পায় নি! তাহলে তার এই কথায় আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেই গলার মালিক কালো-সাদায় খচিত পথ ধরে ছুটে এল।

আবার পথের ওপর ফিরে এসে নুনেজ বলল,—এই যে আমি।

তোমাকে ডাকা মাত্র কেন তুমি এলে না? অন্ধ লোকটি বলে উঠল,—তোমাকে কি ছোট ছেলের মত হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে? তুমি কি হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে পথ শুনতে পাও না?

নুজেন হাসল,—আমি দেখতে পারি।

'দেখা' বলে কোনো কথা নেই,—একটু থেমে অন্ধ লোকটি জানাল। এই পাগলামি ছেড়ে আমার পায়ের শব্দ ধরে চল।

একটু বিরক্ত হয়েই নুনেজ চলল। বললে,—আমারও সময় আসবে।

হ্যাঁ, তুমি শিখতে পাবে, অন্ধ লোকটি উত্তর দিল,—পৃথিবীতে অনেক কিছু শেখার আছে।

তোমাদের কি কেউ বলে নি যে, 'দৃষ্টিহীনের দেশের রাজা একচক্ষু মানুষ'?

ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধ লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলল, দৃষ্টিহীন মানে কি?

চার দিন কেটে গেল, পঞ্চম দিনেও দৃষ্টিহীনের দেশের রাজাকে তাঁর প্রজারা এক অপদার্থ ও নির্বোধ বিদেশী —এর বেশী আর কিছু মনে করতে পারল না!

নুনেজ দেখল, নিজেকে জাহির করা যতখানি সোজা সে মনে করেছিল তা নয়; অনেক, অনেক কঠিন। মনে মনে অতর্কিত আক্রমণে রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার জল্পনা-কল্পনা করা সত্ত্বেও সে তাদের প্রতিটি কথা শুনছিল, শিখছিল দৃষ্টিহীনের দেশের আচার ব্যবহার, নিয়ম-কানুন। রাতে হাঁটা, চলা বা কাজ করা তার কাছে অত্যন্ত

বিরক্তিকর বোধ হল, সে স্থির করে ফেলল যে এই নিয়মের মূলেই প্রথমে আঘাত করে সে পরিবর্তন আনবে।

ওরা শ্রমজীবি, অনাড়ম্বর ওদের জীবন। ধর্ম বলতে সুখ বলতে মানুষ যা বোঝে, সবই মানত ওরা। পরিশ্রম ওরা করত, কিন্তু অতিরিক্ত নয়; প্রয়োজনের মত খাদ্য ও পরিধেয় ওদের ছিল, বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল দিন আর ঋতু; ছিল নাচ-গান-বাজনা, ছিল ভালবাসা, ছিল শিশু-সন্তান।

তাদের নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে দরদ ও আত্মনির্ভরতা দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। যে দিকেই তাকাও, সমস্তই তাদের প্রয়োজনের মত তৈরি করা। উপত্যকার প্রত্যেকটি রাস্তাই পরস্পরের সঙ্গে সমান এক কোণ করে চলেছে, শুধু বাঁকের ওপর পৃথক এক খোঁচ দিয়ে তাদের পার্থক্য বোঝানো যায়। পথ আর মাঠ থেকে সমস্ত বাধা, সমস্ত অসুবিধে দূর করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা নিজেদের সুখ-সুবিধা অনুযায়ী করা। তাদের ইন্দ্রিয়-শক্তি অত্যন্ত সজীব, দশ বারো পা দূরের লোকের সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালন পর্যন্ত তারা শুনতে পারে, বুঝতে পারে। আরো প্রখর তাদের ঘ্রাণ শক্তি, পরস্পরের পার্থক্য তারা কুকুরের মত তৎপরতার সঙ্গে শুঁকেই বলে দিতে পারে। যে লামারা পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে খাবারের লোভে নেমে এসেছিল, তাদের তারা সহজে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে চরায়। নুনেজ নিজের শক্তি জাহির করার লোভ যখন আর সামলাতে পারল না, তখনই সে প্রথম বুঝতে পারল, কত সহজ ও নিঃশঙ্ক তাদের গতি।

প্ররোচনায় সফল না হওয়াতে সে বিদ্রোহ করল।

প্রথমে সে সকলকে অনেকবার এই দৃষ্টির কথা জানাল। বলল, তোমরা শোন, লক্ষ্য কর,—আমার মধ্যে এমন সব জিনিষ আছে, যা তোমরা বুঝতে পারছ না।

তাদের মধ্যে দু'একজন দু'একবার তার কথা শুনেছে, মুখ নীচু করে

বুদ্ধিমানের মত তার দিকে কান পেতে বসেছে, আর সে তাদের বুঝিয়ে গেছে—'দেখা' মানে কি। তার শ্রোতাদের মধ্যে ছিল একটি মেয়ে,—অন্য সকলের মত তার চোখের পাতা লাল কিংবা গর্তে বসানো নয়; মনে হয়, যেন লজ্জায় সে তার চোখ আড়াল করে রাখতে চায়। ন্যুনেজের একমাত্র আশা, অন্তত তাকেও যদি বোঝানো যায়। সে বলে যেত দৃষ্টির কথা সৌন্দর্যের কথা, দূর নীল আকাশের আস্তরণে ধূসরাভ পাহাড়ের কোলে রক্ত-রঙীন সূর্যোদয়, পাহাড় ঘিরে ঘন পাইন ও দেবদারু গাছ, উচ্ছল ঝর্ণা...আর তারা তার এই সব কথা শুনত অত্যন্ত ব্যঙ্গজনক সন্দিগ্ধতায়।

তারা তাকে জানাল যে পৃথিবীতে পাহাড় বলতে কিছুই নেই, যে পাথরের শেষে লামারা চরে বেড়ায়, তা-ই হল পৃথিবীর শেষ; সেখান থেকে এক বিবর-বহুল ছাদ উঠে গেছে—সেই গর্ত দিয়ে শিশির আর তুষার-পাত হয়। সে দৃঢ়কণ্ঠে যদি জানাত যে তাদের বিশ্বাসমত পৃথিবীর শেষ নেই বা ছাদ নেই, তারা বলত যে তার এ কল্পনা অলীক। আকাশ, মেঘ, আর তারা সম্বন্ধে তার সাধ্যতম বিশদ বিবরণ সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাসমত মসৃণ ছাদের পরিবর্তে তাদের তারা এক বিপদাকীর্ণ বিশাল শূন্যতা ভিন্ন আর কিছু চিন্তা করতে পারত না।

দৃষ্টিহীনের দেশের ধর্মশাস্ত্রে বলে, মাথার ওপরের গোলাকার ছাদ অত্যন্ত মসৃণ। ন্যুনেজ ভেবে দেখল, এভাবে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মানো সম্ভব হবে না; বরং এতে তাদের মনে আঘাত দেওয়াই সম্ভব—তাই ওভাবে তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাবার দুরাশা ত্যাগ করে সে চেষ্টা করতে লাগল দৃষ্টির ব্যবহারিক মূল্য দেখাতে। এক সকালে সে দেখলে পেড্রো সতের নম্বর পথ ধরে ভিতরের কোনো বাড়ি থেকে এদিকে আসছে; কিন্তু তখনো সে শ্রবণ বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নাগালের অনেক দূরে। এ কথা সে তাদের জানাল। ভবিষ্যৎ-বক্তার মত সে বলে উঠল, আর একটু পরেই পেড্রো এখানে এসে উপস্থিত হবে। সে কথা শুনে এক বৃদ্ধ

জানালেন যে সতের নম্বর রাস্তায় পেড্রোর কোনো কাজ নেই, এবং তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন পেড্রো কিছুদূর এসেই লম্বালম্বি দশ নম্বর পথ ধরে আবার বাইরের পাঁচিলের দিকে ফিরে গেল। পেড্রো না আসাতে তারা নুনেজকে বিদ্রূপ করে উঠল। পরে যখন সে পেড্রোকে তার ঐ অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করল, সে প্রথমে সমস্ত অস্বীকার করে প্রচুর মিথ্যা কথা বলতে লাগল, এমন কি শেষপর্যন্ত মারমুখো হয়ে উঠল।

তারপর নুনেজ জানাল, দেয়ালের কাছাকাছি উঁচু সমতলভূমির ওপর দাঁড়িয়ে দূরের বাড়িগুলোর ভিতর কী হচ্ছে তা বলে দিতে পারে। দূর থেকে শুধু মানুষের চলাচলই লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তারা চেয়েছিল, ঘরের ভিতর কি হচ্ছে তাই জানতে। জানলা-বিহীন ঘরের ভিতর কী হচ্ছে তা সে কি করে বলতে পারবে? এই ব্যর্থতা, এবং তার জন্য তাদের ব্যঙ্গ পরিহাসই তাকে তাদের বিরুদ্ধে দেহ-শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য করেছিল। একবার মনে হল, একটা বর্শা নিয়ে হঠাৎ দু'একটা লোক মেরে চোখের উপকারিতা দেখিয়ে দেওয়া উচিত। এই চিন্তা তাকে এতদূর অভিভূত করেছিল যে সত্যই সে একটা বর্শা হাতে তুলে নিল। তারপর একটি সত্য সে নিজের সম্বন্ধে আবিষ্কার করল যে, আর যাই হোক, কোনো অন্ধকে সজ্ঞানে আঘাত করা একেবারে অসম্ভব।

নুনেজ একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু ততক্ষণে তারা সকলেই তার বর্শা ধরার কথা জানতে পেরে গেছে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল তারা, একদিকে মাথা হেলিয়ে, তার দিকে কাণ ফিরিয়ে তারা জানতে চাইল, শেষ পর্যন্ত তার মতলব কী।

বর্শাটা রেখে দাও,—একজন বলে উঠল। সমস্ত শরীরে তার এক অসহায় বিভীষিকা। আর একটু হলেই পেড্রো তার আদেশ মেনে নিতে গিয়েছিল।

তারপর হঠাৎ সে একজনকে এক ধাক্কায় একটি বাড়ির দেয়ালের ওপর ফেলে দিয়ে ছুটে গ্রামের বাইরে পালিয়ে গেল।

একটা ক্ষেত আড়াআড়িভাবে পার হয়ে সে রাস্তার ধারে এসে বসল। মাঠের ওপর ঘাস-মাড়ানো পায়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। যুদ্ধকালীন উৎসাহের আভাস সত্ত্বেও নুনেজের মনে কিংকর্তব্য ভাবটাই প্রবলতর হয়ে উঠছে। তার মনে হল—মানসিক নিম্নস্তরের জীবের সঙ্গে যুদ্ধ করা উচিত নয়। অনেক দূরে একদল লোক বর্শা আর লাঠি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ধরে তার খোঁজে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে; মাঝে মাঝে থেমে বাতাসে ঘ্রাণ নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে উঠছে।

প্রথমবার তাদের ঐভাবে দেখে নুনেজ হেসে উঠেছিল, কিন্তু পরে আর হাসে নি।

একজন সেই ক্ষেতে তার পায়ের দাগের সন্ধান পেয়ে গেল। তারপর নীচু হয়ে তার সেই পায়ের দাগ অনুভব করে অগ্রসর হতে লাগল। পুরো পাঁচ মিনিট ধরে সে দেখল অনুসরণকারী গ্রামবাসীদের ধীর অগ্রাগমন, তারপর......তখনই তার কিছু একটা করা দরকার—এই কথাটা মনে হতেই সে ক্ষেপে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘিরে-আসা অনুসরণকারীদের দিকে একবার এগিয়ে গিয়ে কি মনে হওয়াতে আবার ফিরে এল। তারা তখন অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে কি যেন শুনছে।

বজ্রমুষ্টিতে তার বর্শাটিকে ধরে সে-ও স্থির হয়ে দাঁড়াল। ওদের আক্রমণ করা কি উচিত হবে?

তার কানের কাছে যেন বাজতে লাগল বিস্মৃত এক সুর—'দৃষ্টিহীনের দেশের রাজা একচক্ষু মানুষ'।

ওদের আক্রমণ করা কি উচিত হবে?

উঁচু দুরারোহ পর্বতশিখরের দিকে একবার সে তাকাল, আর

একবার তাকাল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আস. অনুসরণকারীদের দিকে। আরো অনেক লোক তাদের পিছনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে।

ওদের আক্রমণ করা কি উচিত হবে?

বোগোটা! একজন চীৎকার করে উঠল, বোগোটা, কোথায় তুমি?

আরো শক্ত মুঠোয় বর্শাটা ধরে সে এগিয়ে গেল। তার নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও ঘিরে ফেলতে লাগল তাকে। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল,—আমার গায়ে হাত দিলে ওদের আমি খুন করে ফেলব—একেবারে খুন করে ফেলব! তারপর সে চীৎকার করে বলল,—শোন তোমরা, এই উপত্যকায় আমার যা খুসি আমি তাই করব। শুনতে পেলে? শুনতে পেলে তোমরা? আমার যা ইচ্ছে তাই করব এবং যেখানে খুসী সেখানে যাব।

তারা তার দিকে দ্রুত এগিয়ে এল—চার-হাত-পায়ে, তবু তাড়াতাড়িই বলতে হবে। এ যেন কানামাছি খেলা, একজন ছাড়া সকলেরই চোখ বাঁধা। একজন চীৎকার করে উঠল,—ওকে ধরে ফেল!

হঠাৎ নিজেকে একদল অনুসরণকারীর রচিত একটি বৃত্তের মধ্যে আবিষ্কার করে সে বুঝতে পারল, আর ইতস্তত করা নয়, এখনি তাকে কাজে নামতে হবে।

গলা চড়িয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে চীৎকার করতে গিয়ে তার গলা ভেঙে পড়ল,—তোমরা বুঝতে পারছ না, তোমার অন্ধ, দৃষ্টিহীন; আর আমার দৃষ্টি আছে। সরে যাও আমার কাছে থেকে।

বোগোটা! বর্শা ফেলে দিয়ে ঘাসের ওপর থেকে চলে এস! নাগরিক-সুলভ রূঢ়তার সঙ্গে ক্রোধের অভিব্যক্তিও তাদের এই হুকুমে প্রকট হল।

আমি মারব,—উত্তেজনায় ফুঁপিয়ে উঠল সে, ভগবানের দোহাই, আমি মেরেই ফেলব। সরে যাও আমার কাছ থেকে।

কোথায়, কোথায় সে যাবে এই ব্যূহ ভেদ করে? সে জায়গা

সে জানে না, তবু ছুটতে লাগল। সব চেয়ে কাছের অন্ধ লোকটির কাছ থেকে সে ছুটে পালাল—কি করে আর অন্ধকে সে আঘাত করে! তাকে আঘাত করা নির্মম পাশবিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। একবার থেমে চারিদিকে তাকিয়ে তাদের পরিবেষ্টন থেকে মুক্তিলাভের আশায় সে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। যেখানে ফাঁক একটু বেশী সেখানেই ছিল তার লক্ষ্য, কিন্তু তার চারপাশের লোকেরা যেন তার মতলব বুঝতে পেরেই সেই জায়গাটিকে বন্ধ করে ফেলল। সামনে লাফিয়ে পড়ে যখন দেখল এবার আর নিস্তার নেই, ধরা পড়তেই হবে,—সাঁ—হ্যাঁ, সাঁ করে বর্শাটি ছুঁড়তেই ঠিক বিঁধে গেল। একটি নরম হাতের কোমল স্পর্শ এক মুহূর্তের জন্য সে তার দেহে অনুভব করেছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই লোকটি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

ছুটতে ছুটতে সে রাস্তার কাছে এসে পড়ল, আর তার পিছু পিছু অন্ধের দল বর্শা আর শাবল ঘুরিয়ে যথাসম্ভব শীগ্‌গির এগিয়ে আসতে লাগল।

ঠিক সময়েই সে তার পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তাকিয়ে দেখল, একজন লম্বামত লোক তার দিকে ছুটে এসে তার পায়ের শব্দ শুনে বর্শাটি ঘুরিয়ে মারমার চেষ্টা করছে। রাগে ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে সে তার আততায়ীকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়েই ঘুরে দাঁড়াল। বর্শাটি তার গায়ে না লেগে একগজ দূরে গেঁথে পড়ল। তারপর সামনের একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে কোন রকমে পথ পরিষ্কার করে চীৎকার করতে করতে ছুটে পালাল।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে তখন সে ক্ষ্যাপার মত এপাশে ওপাশে ছুটে বেড়াতে লাগল, প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে তাকাতে গিয়ে হোঁচট খেতে লাগল বারবার। হঠাৎ একবার সে পড়ে গেল—তার পড়ার শব্দ শুনতে

পেল তারা। অনেক দূরে সীমান্তের পাঁচিলের ছোট দরজাটি দেখা যাচ্ছে। ওই যেন তার স্বর্গ! পাগলের মত তার দিকে সে ছুটে চলল। সেখানে না পৌঁছোনো পর্যন্ত একবার পিছন ফিরে আক্রমণকারীদের দিকে তাকাবার কথাও তার মনে হল না; কোনো রকমে পোলটি পার হয়ে পাহাড়ের কিছুদূর বেয়ে উঠে গেল। একটা লামা শুধু বিস্মিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে তার দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে গেল। সে ততক্ষণে সেইখানে শুয়ে পড়ে বেদম হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হঠাৎ-রাজ্যাধিকারের সমস্ত স্বপ্ন এইভাবে তার ব্যর্থ হল।

শুধু এই অভাবনীয় ঘটনা চিন্তা করেই দৃষ্টিহীনের উপত্যকার দেয়ালের বাইরে সে দুই রাত দুই দিন অনাহারে আর নিরাশ্রয়ে কাটিয়ে দিল। এই চিন্তার মধ্যেই সে প্রায়ই গভীর বিদ্রূপের সঙ্গে মনে মনে আউড়ে যেত নিরর্থক মিথ্যা প্রবাদটি—দৃষ্টিহীনের দেশের রাজা একচক্ষু মানুষ। যুদ্ধে এই লোকদের জয় করে আধিপত্যের কথা সে প্রায়ই চিন্তা করত, কিন্তু এতক্ষণে একটি কথা তার স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে এ কাজ একেবারে অসম্ভব। তার কোনো অস্ত্র নেই, আর এর পর এখন তা সংগ্রহ করাও প্রায় অসম্ভব।

সভ্যতার বৃশ্চিক দংশন সে বোগোটাতে থাকতেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছে, কোনো অন্ধকে হত্যা করতে সে অন্তর থেকে সাড়া পায় না। কিন্তু সত্যিই যদি সে তা পারত, তবে সকলকে নৃশংস হত্যার ভয় দেখিয়ে তার আদেশ প্রতিপালন করাতে তার বাধা থাকত না। কিন্তু—একদিন, আজ কিংবা কাল—তাকে তো ঘুমোতেই হবে!......

পাইন বনে ঘুরে ঘুরে খাবার সংগ্রহের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, রাত্রে তুষার-পাতে পাইন শাখার নীচে উত্তপ্ত থাকার ব্যর্থ চেষ্টা, আর কোন কৌশলে একটি লামাকে ধরে ফেলবার সুদূর-পরাহত আশা—হয়ত বা

পাথরের আঘাতেই তাকে মেরে ফেলে তার মাংস খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা,—সব চেষ্টাই সে করেছে। কিন্তু লামারা তাদের অন্ধিকারী বাদামী চোখে বরাবর তাকে সন্দেহ করে এসেছে, তাকে কাছে দেখলেই বিরক্তি জানিয়ে দূরে সরে গেছে। দ্বিতীয় দিনে এক প্রবল আতঙ্ক তার মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দিল। অবশেষে সে দৃষ্টিহীনের দেশের দেয়ালের কাছে সন্ধির উদ্দেশ্যে গুঁড়ি মেরে নেমে এল। একটা ঝর্ণার ধার দিয়ে চীৎকার করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল সে। দু'জন অন্ধ শেষ পর্যন্ত চীৎকার শুনে তার কাছে এগিয়ে এল।

আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম,—সে বলে উঠল,—কিন্তু জান তো, তখন আমি সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করেছি।

সে আরও জানাল যে এখন তার জ্ঞান হয়েছে এবং সে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে লাগল।

সে এত দুর্বল আর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, অনেক চেষ্টা সত্বেও কান্না সামলাতে পারল না। তারা এই কান্নাকে সুলক্ষণ বলে ধরে নিল।

তারা প্রশ্ন করল, সে এখনো দৃষ্টির কথা ভাবে কিনা।

না, না,—সে প্রতিবাদ করে উঠল,—ও আমার বোকামি। ও কথার মানে হয় না—কোনো মানেই হয়না।

মাথার ওপর কি আছে?—এরপরে তাদের প্রশ্ন।

একজন মানুষের একশো গুণ উঁচুতে এই পৃথিবীর অতি মসৃণ পাথরের তৈরী ছাদ। এই পর্যন্ত বলে সে আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, বলল,—আর কোনো প্রশ্ন করার আগে আমাকে খেতে দাও, নয়ত আমি মারা যাব।

এদের কাছ থেকে সে আশা করেছিল কঠিনতম শাস্তি, কিন্তু এই অন্ধেরা সহ্য করতে জানে। তার এই বিদ্রোহকে তারা তার মূর্খতা ও নিকৃষ্টতার আর একটি প্রমাণস্বরূপ ধরে নিল। তাই শুধু তাকে

কয়েক ঘা চাবুক মারার পর তাকে সবচেয়ে সহজ অথচ সবচেয়ে ভারী কাজ করতে দিল। অন্য কোনো উপায় না দেখে সে-ও তাই মেনে নিল।

কয়দিন সে অসুস্থ হয়ে থাকায় তারা তাকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেবা করল। এতে তার আনুগত্য আরও বেশী হয়ে উঠল। কিন্তু তার সবচেয়ে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল তাকে জোর করে অন্ধকার ঘরে শুইয়ে রাখা। অন্ধ দার্শনিকেরা এসে তার মনের অস্থিরতা আর মাথার অস্থিরতা আর মাথার ওপরের পাথরের ঢাকনা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধতার জন্য এমন ভীষণভাবে বকুনি দিতে লাগল যে মাঝে মাঝে তার সত্যসত্যই সন্দেহ হল যে সে হয়ত নিজের ভুলেই মাথার ওপরের সেই পাথরের ছাদ দেখতে পাচ্ছে না।

এইভাবে নুনেজ ক্রমশ সেই দৃষ্টিহীনের দেশের পুরোপুরি অধিবাসী হয়ে গেল, সেই দেশের জনসমষ্টিও এক একজন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার চোখে ধরা দিতে লাগল, তার সঙ্গে পরিচিত হল। সেই সঙ্গে পাহাড়ের ওপারের জগৎ ক্রমেই দূরে, বহুদূরে সরে গিয়ে এক অলীক কল্পনায় পরিণত হল। সে পেল মনিব ইয়াকুবকে,—না রেগে গেলে অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি। পেড্রো ইয়াকুবের ভাইপো; আর মেডিনা-সারোটে ইয়াকুবের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। মেডিনা-সারোটের মুখ সুন্দর, সুগঠিত, কিন্তু অন্ধদের নারী-সৌন্দর্যের আদর্শ মত তেলতেলে মুখ না হওয়ায় অন্ধদের জগতে তার কোনো আদর ছিল না। কিন্তু নুনেজের তাকে প্রথমেই অপূর্ব সুন্দরী বলে মনে হল; পরমুহূর্তে মনে হল, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে সবচেয়ে সুন্দরী। তার মুদ্রিত চোখের পাতা সেই উপত্যকার আর সকলের মত গর্তে ঢোকান কিংবা লাল নয়; বরং মনে হত, যেকোনো সময়েই সে চোখ মেলে তাকাবে। আর তার ছিল টানা টানা ভ্রূ—অন্ধদের মতে যা সৌন্দর্যের হানিকর। তার কণ্ঠস্বরও বলিষ্ঠ, উপত্যকার কোনো যুবকের তীক্ষ্ণ কানকে

আনন্দ দিতে পারার মত নয়। তাই তার একজনও প্রেমাস্পদ ছিল না।

তাই একদিন মুনেজের মনে হল, যদি সে একবার তার হৃদয় অধিকার করতে পারে তবে তার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সে এই উপত্যকায় সুখেই কাটাতে পারবে।

সে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল, তার ছোটখাট কাজ করে দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ সে গ্রহণ করত এবং একদিন দেখল যে মেডিনা-সারোটেও তাকে লক্ষ্য করছে। এক বিশ্রামের দিনে তারা দু'জন তারার আবছা আলোয় পাশাপাশি বসেছিল, দূর থেকে এক মিষ্টি গান ভেসে আসছিল। মেডিনা-সারোটের হাতের ওপর সে হাত রাখল, তারপর একটু সাহস করে সেই হাত চেপে ধরল। সেও প্রতিদানে অত্যন্ত কোমলভাবে একটু চাপ দিল। আর একদিন অন্ধকারে খাবার সময় সে হঠাৎ লক্ষ্য করল, মেডিনা-সারোটের হাত অতি চুপিচুপি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ আগুনটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠামাত্র মুনেজ তার মুখের কমনীয় ভাব লক্ষ্য করল।

মুনেজের অত্যন্ত ইচ্ছা হল তার সঙ্গে কথা বলে।

এক জ্যোৎস্না-ঝলসিত রাত্রে যখন মেডিনা-সারোটে বসে চরকা কাটছিল, মুনেজ তার কাছে গেল। সেই আলোয় তাকে ঘিরে এক রহস্যের রূপোলী জাল সৃষ্টি হয়েছিল। সে তার পায়ের কাছে বসে প্রেম-নিবেদন করল। জানাল সে তাকে কত ভালবাসে, তার তাকে কত সুন্দর মনে হয়। তার প্রেমিক কণ্ঠের সসম্ভ্রম কোমলতা মেডিনা-সারোটেকে প্রথমে একটু ভীত করে তুলেছিল, কারণ সেদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে কেউ সোহাগের সুরে কথা বলে নি। মেডিনা-সারোটে কোন উত্তর দিল না, তবে বোঝা গেল, মুনেজের কথা তার খুব ভাল লেগেছে।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই সে তার সঙ্গে কথা বলত। সেই উপত্যকাই ক্রমে তার চোখে একমাত্র জগৎ হয়ে দাঁড়াল, আর এই

পাহাড়ের ওপারের সেই সূর্যালোকিত পৃথিবী মনে হল রূপকথা, হয়ত সে-ই একদিন মেডিনা-সারোটের কানে কানে তার রঙীন গল্প শোনাবে। অত্যন্ত ভয়ে, সতর্কভাবে সে তাকে দৃষ্টির কথা জানাল।

মেডিনা-সারোটের কাছে দৃষ্টি মস্ত এক কবি-কল্পনা হয়ে দাঁড়াল। নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত আর তার সুন্দর আলোকোজ্জ্বল মুখের কথা সে এক ভীত অপরাধীর মত শুনত। বিশ্বাস করতে পারত না, বুঝতেও পারত অল্পই—কিন্তু আনন্দে তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত, মনে করত, সে যেন সমস্ত বুঝতে পেরেছে।

নুনেজের ভালবাসা ভীরুতা কাটিয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে চাইল ইয়াকুব আর অন্যান্য মাতব্বরদের কাছে গিয়ে তাকে দাবী করতে, কিন্তু মেডিনা-সারোটে ভয় পেয়ে দেরী করতে লাগল। তার এক বড় বোনই প্রথম ইয়াকুবকে গিয়ে জানাল যে নুনেজ আর মেডিনা-সারোটে পরস্পরকে ভালবাসে।

প্রথম হতেই কিন্তু নুনেজ আর মেডিনা-সারোটের বিয়ের প্রস্তাবে ভীষণ প্রতিবাদ হল; তার কারণ, তাদের ধারণায় নুনেজ হীনস্তরের জীব, মূর্খ, অযোগ্য এবং সাধারণ মানুষের থেকে অনেক নিম্নস্তরের। তাদের সকলের আভিজাত্যে কলঙ্ক আনবে বলে তার বোন প্রতিবাদ জানাল; আর বৃদ্ধ ইয়াকুব তার নম্র, খেয়ালী ভৃত্যটিকে সামান্য মায়া-মমতা করলেও এ প্রস্তাবে একেবারে অমত জানাল। সমস্ত জাতিকে কলুষিত করা হবে বলে যুবকদল ক্ষেপে উঠল, একজন শেষ অবধি নুনেজকে হত্যা করতে পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু নুনেজই প্রথমে তাকে আঘাত করল। ক্ষীণালোক গোধূলিতেও এই প্রথম সে দৃষ্টির সুবিধা এখানে পেল, তাই সে মারামারি শেষ হওয়ার পরও আর কেউ তাকে আঘাত করতে সাহস করে এগিয়ে যায়নি। তবু তারা বলল, এ বিয়ে অসম্ভব।

বৃদ্ধ ইয়াকুব তার ছোট মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসত, তাই তার কাঁধের ওপর মাথা রেখে তাকে কাঁদতে দেখে সে দুঃখই পেল।

জান তো মা, ও একটা এক নম্বরের বোকা ; ও কোনো জিনিষই ঠিকভাবে করতে পারে না। আর তা ছাড়াও ওর অনেক অদ্ভুত খেয়াল আছে।

আমি জানি বাবা,—মেডিনা-সারোটে কেঁদে উঠল, কিন্তু ও আগের চেয়ে ভাল হয়েছে, দিন দিনই ভালো হচ্ছে। আর বাবা, ও কত স্বাস্থ্যবান, কত দয়ালু—পৃথিবীর সকলের চেয়েই ও ভাল। আর ও আমাকে ভালবাসে—আর, আর, বাবা—আমি—আমিও ওকে ভালবাসি।

বৃদ্ধ ইয়াকুব দেখল, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া অসম্ভব। আর তা ছাড়া সত্য কথা বলতে গেলে কি, কতগুলো কারণের জন্য সে নুনেজকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তাই জানলা-বিহীন মন্ত্রণাকক্ষে বসে সে উপত্যকার মাতব্বরদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে সময় বুঝে বলল,—ও আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। একদিন হয়ত দেখব, ও আমাদেরই মত জ্ঞানী হয়েছে।

তারপর মাতব্বরদের একজন অনেক ভেবে চিন্তে একটি উপায় আবিষ্কার করলেন। তিনি ছিলেন এদের মধ্যে একজন মস্তবড় চিকিৎসক, তাঁর ছিল অদ্ভুত প্রতিভাদীপ্ত দার্শনিক ও আবিষ্কারকের মন। নুনেজের অদ্ভুত বিশেষত্বগুলো সারানোর মতলব তাঁর মনে বেশ লাগল। একদিন ইয়াকুবের উপস্থিতিতে তিনি নুনেজের কথা তুললেন।

আমি বোকোটাকে পরীক্ষা করে দেখেছি,—তিনি বললেন, ওর অসুখের সমস্ত কারণই আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, খুব সম্ভব ওকে একেবারে সারানো যাবে।

বৃদ্ধ ইয়াকুব বলল, আমিও বরাবর সেই আশাই করে এসেছি

ওর মস্তিষ্কে গণ্ডগোল আছে, জানালেন অন্ধ চিকিৎসক।

অন্য মাতব্বরেরা ফিস্‌ফিস্ করে তা স্বীকার করলেন।

এখন দেখতে হবে, কিসের জন্য গণ্ডগোল।

সত্যি, কিসের জন্য ? বৃদ্ধ ইয়াকুব প্রশ্ন করল।

নিজের প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন ডাক্তার, কিসের জন্য? ওই যে অদ্ভুত জিনিষ—যাকে ও বলছে চোখ, যা মুখের উপর থাকায় টিপলে সামান্য গর্ত হয়ে যায়,—সেখানেই ওর রোগ। আর তার জন্যই বোগোটার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। তাছাড়া ওর চোখের পাতায় লোম আছে, চোখের পাতা ওপরে নীচে নামে—এবং সেইজন্য ওর মস্তিষ্ক তালে তালে বেড়ে কমে এক আলোড়নের সৃষ্টি করছে।

য়্যাঁ, বৃদ্ধ ইয়াকুব আশ্চর্য হল,—তাই নাকি?

হ্যাঁ। আর আমি একরকম নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, তাকে একেবারে সারিয়ে তুলতে হলে আমাদের শুধু একটি সহজ ও সরল অপারেশন করতে হবে, অর্থাৎ এই দুষ্ট জিনিষটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

তবে কি সে প্রকৃতিস্থ হবে?

হ্যাঁ, তবে সে একেবারে প্রকৃতিস্থ হবে, একজন অভিজাত ভদ্রলোকে পরিণত হবে।

বিজ্ঞানের জয় হোক,—বলে উঠল বৃদ্ধ ইয়াকুব, তারপর তক্ষুনি নুনেজকে এই আনন্দ-সংবাদটি দিতে ছুটল।

কিন্তু নুনেজের এই শুভ-সংবাদ গ্রহণের ধরণ তার খুব ভাল লাগল না—কেমন যেন হতাশা, উৎসাহের অভাব, তার ব্যবহারে ফুটে উঠল। তাই ইয়াকুব বলল,—তোমার ধরণ দেখে পাঁচজনে বলতে পারে যে তুমি আমার মেয়েকে ভালবাস না।

তারপর মেডিনা-সারোটে এসে তাকে অন্ধ ডাক্তারের কাছে যেতে অনুরোধ করতে লাগল।

তুমি কি চাও যে আমার এই দৃষ্টি আমি হারাই? সে জিজ্ঞাসা করল।

মেডিনা-সারোটে শুধু মাথা নাড়ল।

দৃষ্টিই আমার জগৎ!

মেডিনা-সারোটের মাথা আরো ঝুঁকে পড়ল।

পৃথিবীতে কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ আছে, ছোট সুন্দর সুন্দর জিনিষ—রঙীন ফুল, পাহাড়ের গায়ে গায়ে গাছ-শ্যাওলা, দিমের সুন্দর নরম কমনীয়তা, আকাশে চলমান মেঘ, সূর্যাস্ত, নক্ষত্রদল। আর তুমি! শুধু তোমার জন্যই চোখ থাকা দরকার। তোমার সুন্দর পবিত্র মুখ, তোমার রক্তিম অধর, তোমার সুন্দর কোমল যুক্ত কর।.... এই চোখকেই তুমি একদিন বিহ্বল করেছিলে, এই চোখই আজ তোমাকে আমার কাছে ধরে রেখেছে ; অথচ মূর্খের দল এই চোখকেই নষ্ট করতে চায়! কি হবে! এর পর থেকে আমি তোমাকে শুধু স্পর্শ করব, তোমার কথা শুনব, কিন্তু আর কোনোদিনই তোমাকে দেখতে পারব না। এই পাহাড়, পাথর আর অন্ধকারের আচ্ছাদনের নীচে আমাকেও আশ্রয় নিতে হবে—সেই ভয়ঙ্কর আচ্ছাদন, যার গণ্ডীতে তোমাদের সমস্ত কল্পনা খর্ব হয়ে আছে।.......না, না, তুমি আমাকে তা হতে দিও না।

এক অস্বস্তিকর সন্দেহ তার মনে জেগে উঠল। সে সেখানেই এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করে একেবারে নীরব হল।

আমার মনে হয়,—মেডিনা আস্তে আস্তে বলল, সব সময়—তারপর আর কথা শেষ করতে পারল না, থেমে গেল।

কি বলছ? একটু ভীত ভাবেই সে প্রশ্ন করে উঠল।

আমার ইচ্ছা, সব সময় তুমি ওরকম কথা বোলো না।

কী রকম?

আমি জানি, কথাগুলো খুব ভাল,—তোমার কল্পনা, তাও জানি, আমি ভালও বাসি, তবু এখন—

এক ভীত সংশয়ে শীতল হয়ে গিয়ে সে অস্ফুটস্বরে বলল—এখন?

মেডিনা-সারোটে একেবারে নীরব, নিথর।

তুমি কি বলতে চাও—তোমার মনে হয়,—আমার ভাল হবে, এতে আমার ভাল হবে—

সমস্তই যেন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছিল। সর্বাঙ্গে একটা জ্বালা, ইয়্যাসিগ্যার এই পরিণতির জন্য একটা জ্বালা তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলছিল। কিন্তু সব ছাপিয়ে মেডিনা-সারোটের কোনো কিছু না-বোঝার জন্য মনে জাগল এক সংবেদনা—করুণার মত এক অনুভূতি।

হা ভগবান, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে বলল। মেডিনা-সারোটের রক্তহীন পাংশু মুখে সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল,—শুধু যে কথা সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না, তার জন্য তার সমস্ত হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে কত কষ্ট সে স্বীকার করে নিয়েছে। দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে উঠল, তারপর দুজনে নীরব হয়ে বসে রইল।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে সে বলল, আচ্ছা,—যদি আমি রাজি হই?

আর সে তার উদ্বেল হৃদয়কে ধরে রাখতে পারল না, দুই হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মেডিনা-সারোটে হু-হু করে কেঁদে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, যদি তুমি রাজি হও, সত্যি যদি তুমি রাজি হও!

যে অস্ত্রোপচার তাকে দাস্য আর নিকৃষ্টতা থেকে অন্ধ অধিবাসীর পর্যায়ে আনবে, তার এক সপ্তাহ আগে থেকে নুনেজের চোখে ঘুম নেই। সূর্যকরোজ্জ্বল উষ্ণ দিনের বেলায় যখন সকলে নিদ্রায় মগ্ন, সে তখন বসে ভাবছে বা লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তার এই উভয়-সঙ্কটের সময়ে মনকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। সে তার শেষ উত্তর দিয়ে দিয়েছে, জানিয়েছে তার পূর্ণ সম্মতি; তবু সে নিশ্চয় হতে পারছে না। দেখতে দেখতে কাজের সময় কেটে গেল, সূর্য আকাশে উঠল, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ছড়িয়ে পড়ল তার সোনালি আলো, আর সেই সঙ্গে শুরু হল তার দৃষ্টির শেষ দিন। মেডিনা-সারোটে ঘুমোতে যাবার আগে তার সঙ্গে সে কিছুক্ষণ একত্র ছিল।

বলল, কাল এ্যা আমি দেখতে পারব না।

বোলনা, ওকথা বোলনা!—মেডিনা-সারোটে ফুঁপিয়ে উঠল। নুনেজের হাত দুটো তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে নিজের রুদ্ধ বেদনাকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ওরা তোমাকে একটুও আঘাত করবে না,—মেডিনা-সারোটে বলল, এই যে যন্ত্রণা তুমি সহ্য করতে যাচ্ছ, এই ব্যথা স্বীকার করে নিচ্ছ, সে তো শুধু আমারই জন্য। ওগো, যদি কোনো নারীর হৃদয় দিয়ে, জীবন দিয়ে কখনো সম্ভব হয়, তবে আমি তা প্রতিপূরণ করবই করব।

নিজের এবং মেডিনা-সারোটের জন্য সে করুণায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল; সবল বাহু দিয়ে তাকে সজোরে বেষ্টন করে, অধর দুটো তার অধরে চেপে ধরে, তার সুন্দর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে নুনেজ শেষ বারের মত চেয়ে রইল। বিদায়! তার দৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে অস্ফুট স্বরে সে বলল, বিদায়!

তারপর ধীর পদক্ষেপে সে সেখান থেকে চলে গেল।

মেডিনা-সারোটে তার অপসৃয়মান পদধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। সেই পদধ্বনিতে সে এমন এক ছন্দ খুঁজে পেল যাতে সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না, কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

নুনেজ স্থির করেছিল, সাদা নার্সিসাস ফুলে ঝলসিত নির্জন দূর্বা-শ্যামল এক মাঠে গিয়ে তার এই আত্মত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত একা থাকবে। কিন্তু যেতে যেতে সে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল নবারুণ সূর্যোদয়—দেবদূতের মত স্বর্ণবর্মে শোভিত প্রভাত খাড়াই পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে........

মনে হল, এই অনন্ত ঐশ্বর্যের কাছে সে, এই উপত্যকার অন্ধ জগৎ, তার প্রেম আর অন্যান্য সমস্ত কিছু নরককুণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগেবার মতানুযায়ী সে মাঠের দিকে বেঁকে গেল না, এগিয়ে চলল

সামনে। অন্ধ জগতের প্রাচীর পার হয়ে পাহাড়; তার দৃষ্টি তখন উত্তুঙ্গ পর্বতশিখরের সূর্য-ঝলসিত তুষারের ওপর একাগ্রনিবদ্ধ।

এই অনন্ত সৌন্দর্য সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করল, তার কল্পনা নীল আকাশে ডানা মেলে এই সৌন্দর্যেরও উর্ধ্বে উড়ে গেল। আর এই দৃষ্টিই সে আজ চিরকালের মত হারাতে চলেছে!

যে দেশ ছেড়ে সে চলে এসেছিল, যে দেশকে সে আপনার মত পেয়েছিল, আজ সেই বিশাল জগতের কথা তার বারবার মনে পড়তে লাগল। এই পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে গেল দূরে, বহুদূরে—দিনের গরিমা, রাত্রের আলোকোজ্জ্বল রহস্যময় সেই অগণ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত বোগোটায়; সহরের সর্বত্র সুন্দরভাবে সাজান তার প্রাসাদ তার ঝর্ণা, প্রস্তরমূর্তি আর শ্বেত মর্মরের অট্টালিকার মধ্যে। কল্পনায় ভেসে উঠল এক অনাগত ভবিষ্যতের ছবি,—এক গৃহোন্মুখ পথিক এই গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে তার সহরের জনাকীর্ণ পথের ধারে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসবে। দিনের পর দিন নদীপথ ধরে বিশাল বোগোটা থেকে বিশালতর পৃথিবীর পানে যাত্রা—সহর ছাড়িয়ে, গ্রাম পার হয়ে, বন মরুভূমি অতিক্রম করে, চলোর্মি-চঞ্চল নদীর পথে—একদিন তার তীর হারিয়ে যাবে, বিশাল স্টীমার জলে আলোড়ন তুলে আসবে, দেখা যাবে সমুদ্র—অনন্ত সাগর, তার হাজার দ্বীপ, হাজার হাজার দ্বীপ, আর তার জাহাজগুলোকে বহুদূরে অস্পষ্ট দেখা যাবে বিশাল পৃথিবীকে ঘিরে অবিরত যাত্রায় নিরত। সেখানে পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে আকাশ দেখা যায়—এখানকার মত ছোট্ট এতটুকু থালার মত নয়—বাঁকানো অমেয় নীল আকাশ, যেন এক গভীর নীল সমুদ্র, তাতে ঘূর্ণায়মান তারার দল ভাসছে.........

সে পাহাড়ের পর্দাটিকে আরো গভীর, সন্দিগ্ধ চোখে লক্ষ্য করতে লাগল।

যদি কেউ ওপরের চিমনির মত পাহাড়ে জায়গাটা ছাড়িয়ে উঠতে

পারে, তবে হয়ত সে খর্বাকৃত পাইনের মাঝে এসে দাঁড়াবে—যে পাইনের সারি গিরিসঙ্কট পার হয়ে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে। তারপর? হয়ত সেই পর্বতশিখরের ভগ্নস্তূপ অতিক্রম করাও অসম্ভব হবে না। সেখান থেকে হয়ত আরো একটু উঠে তুষার-শৃঙ্গের নীচে কোনো একটা উঁচু জায়গা পাওয়া যাবে। সেই চিমনির মত পাহাড়ে জায়গাটায় অকৃতকার্য হলে আরো পূর্বে কোনো জায়গা দিয়ে হয়ত সে উঠে যেতে পারবে। তারপর? মুক্তি···স্বচ্ছ প্রভাতের পীতাভ আলোয় তৃণের মত ঝলসে-ওঠা তুষারের ওপর, উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের মাঝামাঝি জায়গায় তার মুক্তি।

একবার গ্রামের দিকে তাকিয়ে সে সোজা পিছন ফিরে সামনে চোখ মেলে একমনে লক্ষ্য করতে লাগল।

একবার মেডিনা-সারোটের কথা মনে হল, কিন্তু সে ততক্ষণে অনেক ছোট, অনেক দূরে চলে গেছে।

যেখান থেকে সে দিনের আলো দেখতে পেয়েছিল একবার সেই পাহাড়ের দেয়ালের দিকে তাকাল।

তারপর ধীর পায়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে সে উঠতে শুরু করল।

এইভাবে চলতে চলতে যখন সূর্যাস্তের সময় হল, তখন সে বিশ্রামের জন্য থামল। সে তখন অনেক, অনেক উঁচুতে। আরো উঁচুতে সে উঠেছিল, যদিও এখনো সে উঁচুতেই রয়েছে। তার পোষাক শতচ্ছিন্ন, তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত; কিন্তু সে যেন সহজভাবে বিশ্রাম করছে, মুখে তখনো হাসি লেগে রয়েছে।

সে যেখানে শুয়ে ছিল, সেখান থেকে উপত্যকাটিকে মনে হচ্ছিল মাইলখানেক নীচে এক গর্তের মধ্যে। কুয়াশায় আর পর্বতের ছায়ায় সেই উপত্যকা তখন মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু তার চার পাশে পর্বত-শিখরের তুষারে তুষারে তখন সূর্যাস্তের রঙীন আলোর রোশনাই। পাহাড়ের মেটে পাথর ভেদ করে সবুজ খনিজ পদার্থের রঙ ফুটে উঠেছে, স্ফটিকের দ্যুতি এখানে সেখানে জ্বলে উঠেছে, সুন্দর ছোট ছোট কমলা

রঙের গাছ-শ্যাওলা তারই মুখের একান্ত কাছে পড়ে আছে। গিরিসঙ্কটের ভিতর গভীর ঘন ছায়া—নীল ঘন হয়ে বেগুনী রঙ নিয়েছে, বেগুনী রঙ উজ্জ্বল আলো-আঁধারিতে পরিণত হয়েছে; আর মাথার ওপরে অনন্ত আকাশের নিঃসীম শূন্যতা।

কিন্তু এসবের দিকে সে আর বিশেষ লক্ষ্য করল না, সেখানেই নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইল। যেখানে সে নিজেকে রাজা বলে মনে করেছিল, সেই দৃষ্টিহীনের উপত্যকা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রশান্তিতে যেন তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

সূর্যাস্তের জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল, রাত এল। তখনো সেই শীতল তারার আলোর নীচে সে তৃপ্ত মনে শান্তিতে শুয়ে রয়েছে।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুন্দর পোষাক

এক ছিল ছোট্ট ছেলে। তার মা তাকে একটা চমৎকার পোষাক তৈরি করে দিয়েছিলেন। সবুজ আর সোনালি, তার রঙ; আর এমন অদ্ভুত তার কারুকার্য, যে বলে বোঝান যায় না। যেমন কোমল, তেমনি সূক্ষ্ম। গলায় আবার একটা কমলা রঙের টাই! নতুন বোতামগুলো তারার মত জ্বলজ্বল করে। পোষাকটা পেয়ে তার সে কী গর্ব, কী আনন্দ! প্রথমবার সেটা পরে সে লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে, অধীর আনন্দে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল; কিছুতেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে নি।

তার ইচ্ছে করত এই পোষাক পরে সব জায়গায় যায়, সব রকম লোককে তার পোষাক দেখায়। মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, কোন্ কোন্ জায়গা সে দেখেছে, কোন্ কোন্ দৃশ্যের কথা শুনেছে। কল্পনা করতে লাগল, সেই নতুন পোষাকটা পরে সে যদি সেই সব দৃশ্য, সেই সব জায়গা দেখতে যায়, কী মজাই না হবে তাহলে! তার ইচ্ছে করে, পোষাকটা পরে এক্ষুনি ছুটে মাঠের লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়,—সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত মাঠ! শুধু পোষাকটা পরে একবার, আর কিছু না হোক! কিন্তু তার মা বললো, না, তা হয় না। জামাটা খুব যত্নে রাখতে হবে, কারণ এমন চমৎকার পোষাক তো আর পরে পাওয়া যাবেনা! খুব যত্ন করে এটাকে রেখে দেবে, বিশেষ কোন অনুষ্ঠানেই কেবল এ ব্যবহার করবে। এটাই তোমার বিবাহের পোষাক। বোতামগুলো নিয়ে তিনি পাতলা কাগজে মুড়ে দিলেন, পাছে তাদের চাকচিক্য ম্লান হয়ে যায়, তারা পুরোনো হয়ে যায়। জামার কব্জির কাছে, কনুইয়ের কাছে, এবং অন্য যে যে জায়গা সহজে জখম হতে পারে সেই

জায়গাগুলোর ওপরে মা সযত্নে ছোট ছোট পটি দিয়ে দিলেন। ওর কিন্তু এ সব বিশ্রী লাগত, ও আপত্তি করত এতে। কিন্তু কী করতে পারে সে? অনেক ধমকে, অনেকবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে অবশেষে মা তাকে রাজী করালেন। পোষাকটা খুলে ফেলে, ভাঁজে ভাঁজে পাট করে সে তুলে রেখে দিল। এ যেন পোষাকটা ফিরিয়ে দেবারই সামিল। সবসময়ে তার ইচ্ছে করত পোষাকটা পরে। কবে আসবে সেই শুভদিন, সে মহা সমারোহ, যখন সে আবার এ পোষাক পরতে পারবে, যখন আর ধূলোয় দাগী হবার ভয়ে তাতে পটি দিতে হবে না, চকচকে বোতামগুলোর ওপরেও থাকবে না পাতলা কাগজের আবরণ! কী আনন্দই না সেদিন হবে, কোন ভাবনা থাকবে না— কী চমৎকারই না দেখাবে!

প্রায়ই সে তার পোষাকের স্বপ্ন দেখত। একদিন স্বপ্ন দেখল, একটা বোতাম থেকে সে পাতলা কাগজ খুলে ফেলেছে। দেখল, বোতামটার জেল্লা যেন কমে গেছে একটু। সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে উঠল। অনেকবার বোতামটা পালিশ করল, কিন্তু তাতে যেন সেটা আরও নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার ঘুম ভেঙে গেল, শুয়ে শুয়ে বোতামটার কথা চিন্তা করতে লাগল—কেমন যেন একটু ম্লান হয়ে গেছে। জামা পরার শুভদিন—তা সে যবেই হোক—যখন আসবে, তখন এই বোতামটার জ্যোতি দেখা যাবে সামান্য ম্লান,—একথা চিন্তা করে কত দিন তার উদ্বেগের ওপর দিয়ে কেটেছে। ওর মা পরে যখন একদিন ওকে জামাটা পরতে দিলেন, ওর খুব ইচ্ছে হল ওপরের কাগজটা একটু খুলে একবার দেখে, বোতামগুলো ঠিক আগের মতই উজ্জ্বল আছে কি না।

ফিটফাট সেজে সে গির্জার দিকে এগোতে লাগল, কাগজ খুলে বোতামটা দেখবার অদম্য ইচ্ছা মনে জাগছে। কারণ, একথা তো ভুললে চলবে না যে, তার মা কেবল মাঝে মাঝেই তাকে এ পোষাকটা পরতে

দিতেন,—এই যেমন, রবিবারে গির্জায় যাবার সময়। তাতেও তাকে অনেক কষ্টে সাবধান করে দিতেন। তাও আবার প্রতি রবিবারে নয়। বৃষ্টিপাতের কিংবা ধুলো ওড়ার কোন রকম সম্ভাবনা থাকবে না বা পোষাকটার কোন রকম ক্ষতি হতে পারে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাবে না,—শুধু এমন সময়েই তিনি তাকে এ পোষাক পরতে দিতেন—বোতামগুলো পাতলা কাগজে সযত্নে মোড়া থাকত, আর এখানে ওখানে পটি দেওয়া থাকত। কড়া রোদ্দুর লেগে পাছে তার রঙ্‌ ফিকে হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় মা তার হাতে একটা ছাতা দিয়ে দিতেন। আর প্রতিবারেই এ-রকম উল্লেখযোগ্য ঘটনার পর পোষাকটা ব্রাশ করে চমৎকার ভাবে ভাঁজে ভাঁজে পাট করে রেখে দিত, ঠিক যেমনটি মা তাকে শিখিয়েছিলেন।

তার পোষাকের ব্যাপারে মায়ের এই সব কড়াকড়ি সে সব সময়ে মেনে চলতো। কিন্তু একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে সে আর থাকতে পারল না। অদ্ভুত রাত্রি, জানলার বাইরে চাঁদের আলো ঝকমক করছে। তার মনে হল, অন্যদিনের সাধারণ চাঁদের আলো এ নয়; এ রাত্রিও সাধারণ রাত্রি থেকে আলাদা। ঘুমের ঘোরে এই অদ্ভুত চিন্তা করতে করতে সে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। চিন্তার সঙ্গে চিন্তার ধারা যুক্ত হয়ে যেন ছায়ায় ফিসফিসিনির মত বোধ হতে লাগল। হঠাৎ সে তার ছোট্ট বিছানার ওপরে অত্যন্ত সন্তর্পণে উঠে বসল। হৃদয়ের স্পন্দন অত্যন্ত বেড়ে গেছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছে থরথর করে। সে তার মন স্থির করে ফেলেছে—এবার সে তার পোষাকটা পরবে, যেমন করে পরা উচিত ঠিক তেমনি করেই পরবে। এ-বিষয়ে তার মনে আর কোন দ্বিধা, কোন ইতস্তত ভাব নেই। তার ভয় করতে লাগল—ভীষণ ভয় করতে লাগল, কিন্তু আনন্দও হল খুব।

বিছানা থেকে উঠে জানলার ধারে একটু দাঁড়াল। বাগানে চাঁদের আলোর বন্যা নেমেছে। সে যা করতে যাচ্ছে, তার কথা

চিন্তা করে শিউরে উঠল। বাতাসে ঝিঁঝির ঐকতান, ছোট ছোট অগণ্য প্রাণীর অস্ফুট চীৎকার। পায়ের তলায় কাঠের মেঝেতে শব্দ হচ্ছে। তার পোষাক যেখানে ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল, অতি সন্তর্পণে—পাছে কারুর ঘুম ভেঙে যায়। ধীরে ধীরে পোষাকটা তুলে নিল। সাবধানে, অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বোতামগুলো থেকে কাগজ খুলে ফেলল, যেখানে যেখানে পটি দেওয়া ছিল সব উঠিয়ে দিয়ে আবার তাকে ঝকঝকে করে তুলল, ঠিক যেমনটি ছিল প্রথম যখন তার মা তাকে এটা দিয়েছিলেন—মনে হয়, সে যেন কতদিন আগের ঘটনা! একটা বোতামও এতটুকু ম্লান হয়নি; এই অতি আদরের পোষাকের কোথাও একটা সুতো পর্যন্ত ফিকে হয়ে যায় নি। নিঃশব্দে পোষাকটা পরতে পরতে কেঁদে ফেলল সে, কিন্তু এই কান্নাও তার আজ ভারি ভাল লাগল। আবার দ্রুত ধীর পদক্ষেপে সে সেই জানলাটার কাছে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়াল সেখানে। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে তার পোষাক, বোতামগুলো তারার মত মিটিমিটি জ্বলছে।

তারপর যথাসম্ভব নিঃশব্দে সে নীচে বাগানের পথে নেমে এল। দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির দিকে তাকিয়ে। সাদা,—দিনের আলোয় যেমনটি দেখা যায় প্রায় তেমনি দেখাচ্ছে। তার নিজের ঘরের জানলা ভিন্ন বাড়ীর সব জানলা বন্ধ, ঘুমন্ত লোকের চোখের মত। গাছের স্থির ছায়া দেয়ালে পড়ে ঘন বুননি-দেওয়া জালের মত রূপ নিয়েছে।

রাত্রির বেলা কিন্তু বাগানটা দিনের বেলার থেকে একেবারে অন্যরকম দেখতে। চাঁদের আলো ঝোপের ভেতরে জড়িয়ে পড়ে এক ঝরণা থেকে অন্য ঝরণা পর্যন্ত ভৌতিক মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। ফুলগুলো সব টাটকা ঝকঝকে, কেউ সাদা কেউ কালচে লাল। গাছের অদৃশ্য অন্তরালে থেকে নাইটিঙ্গেল ডাকছে; ঝিঁঝির একটানা সুরে আর নাইটিঙ্গেলের গানে থেকে থেকে শিউরে উঠছে বাতাস।

জগতে কোথাও অন্ধকার নেই, কেবল মদির রহস্যময় ছায়া। প্রত্যেকটি পাতা, প্রতিটি সরু ডাল রত্নখচিত শিশিরে ঝকমক করছে। অন্য রাতের চেয়ে শীত অনেক কম; আকাশও যেন কোন্‌ মায়ায় হঠাৎ অনেক প্রশস্ত হয়ে উঠেছে, নেমে এসেছে অনেক কাছে। হাতীর দাঁতের রঙের প্রকাণ্ড চাঁদের রাজত্ব থাকাতেও আকাশ তারায় ভরা।

অসীম আনন্দ সত্ত্বেও সে একবারও চীৎকার করে উঠল না, গান ধরল না। ভয় পাওয়া লোকের মত সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত ক্ষীণ শব্দ করতে করতে দুহাত বাড়িয়ে ছুটতে লাগল, যেন বিরাট নিটোল সমস্ত জগৎটাকে সে একসঙ্গে আলিঙ্গনে বদ্ধ করতে চায়। বাগানের চারিদিকে যে পরিষ্কার পথ পাতা রয়েছে, সে পথে সে চলল না,—বাগানের ভেতর দিয়ে, ভিজে, বড় বড়, সুগন্ধ লতাগাছের মধ্যে দিয়ে, রজনীগন্ধা, নিকোটিন, সাদা ফুলের রাশি পেরিয়ে, ল্যাভেণ্ডারের পাশ দিয়ে, একহাঁটু জল ভেঙে—সে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। এইভাবে সে বড় জঙ্গলটার কাছে এসে উপস্থিত হল। তারপর সেই জঙ্গল ভেদ করে ছুটতে লাগল। কাঁটায় বিদ্ধ হতে হতে সে চলল,—তার এত আদরের পোষাক থেকে সুতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো বাধাই সে মানল না, কারণ সে জানে, এ সমস্তই তার সেই পোষাক পরার অঙ্গ-বিশেষ, যে পোষাক পরবার জন্যে সে এতদিন এত লালায়িত হয়ে ছিল। বলল, পোষাক পরে কী আনন্দই না আমার হচ্ছে,—কী মজা!

জঙ্গল পার হয়ে সে গিয়ে পড়ল হাঁসের পুকুরে—অন্তত দিনের আলোয় যাকে হাঁসের পুকুর বলা হয়। রাত্রে কিন্তু এখন তাকে দেখে মনে হল, সে যেন এক প্রকাণ্ড পাত্র, ভেকের ডাকে মত্ত জ্যোৎস্না-ধারায় কানায় কানায় ভরা,—অপরূপ জ্যোৎস্নাধারা এঁকে-বেঁকে জড়িয়ে পাকিয়ে অদ্ভুত প্যাটার্ণে জমে রয়েছে। সেই জলে সে নেমে গেল। এক হাঁটু—এক কোমর,—এক কাঁধ জল। দুহাতে জলে আঘাত করে কালো আর

ঝলমলে ঢেউ তুলল—কাঁপতে কাঁপতে দুলতে লাগল ঢেউগুলো। তাদের মধ্যে দিয়ে দেখা গেল, তীরের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে খচিত রয়েছে তারার দল। সাঁতরে পুকুরটা পার হয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। তার গা বেয়ে বেয়ে পড়ছে—জল নয়, খাঁটি রূপোর ধারা। উইলোর বিকৃত ঝোপ পেরিয়ে, বড় বড় ঘাস ডিঙিয়ে সে চলতে লাগল। রুদ্ধ নিশ্বাসে বড় রাস্তার ওপরে এসে থামল। কী মজা! এই সমারোহের উপযুক্ত পোষাক আছে বলেই না এত আনন্দ!

তীরের মত সিধে বড় রাস্তাটা একেবারে চাঁদের নীচে ঘন নীল আকাশের গায়ে গিয়ে পড়েছে। দুদিকে নাইটিঙ্গেলের গান; মাঝখান দিয়ে চিরে চলে গেছে সাদা ঝকঝকে রাস্তাটা। সেই পথ দিয়ে সে চলতে লাগল—কখনো দৌড়ে, কখনো লাফিয়ে, কখনো সানন্দে হাঁটতে হাঁটতে;—পরণে সেই চমৎকার পোষাক, তার মা অক্লান্ত পরিশ্রমে কত ভালবেসে তার জন্যে যেটা তৈরী করেছিলেন। রাস্তার পুরু ধুলো তার কাছে মনে হল, নরম, সাদায় সাদা। এগিয়ে চলতে লাগল সে। একটা মস্ত প্রজাপতি তার ভিজে শরীরের চারিদিকে পতপত করে উড়ে বেড়াতে লাগল। প্রথমে সে প্রজাপতিটাকে বিশেষ লক্ষ্য করেনি, তারপর সে তাকে দেখে হাত নাড়তে লাগল। প্রজাপতিটা তখন তার মাথার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। সেই তালে তালে সেও নাচতে লাগল—সুন্দর প্রজাপতি! আদরের প্রজাপতি! অদ্ভুত, অপূর্ব রাত্রি! আমার পোষাক তোমার ভাল লাগে না প্রজাপতি? তোমার ডানার মত, পৃথিবী আর আকাশের এই রূপোলি আস্তরণের মত সুন্দর নয়?

প্রজাপতিটা ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই তার কাছে আসতে লাগল; অবশেষে তার ভেলভেটের ডানার ছোঁয়া তার ঠোঁটে লাগিয়ে দিয়ে গেল।.........

পরদিন সকালে পাথরের গর্তের মধ্যে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। তার সুন্দর পোষাকে রক্তের ছাপ লেগেছে—পুকুরের আগাছা লেগে ময়লা হয়ে গেছে, দাগ ধরে গেছে। কিন্তু কী প্রফুল্ল ভাব তার মুখে! দেখলেই বোঝা যায়, কত আনন্দে সে মারা গেছে,—একবারও তার মনে হয়নি, সেই শীতল রক্তের ধারা হাঁসের পুকুরের শ্যাওলা ছাড়া আর কিছুই নয়!

—অমিয়কুমার চক্রবর্তী

নতুন তারা

নতুন বৎসরের প্রথম দিনে তিনটি মানমন্দির থেকে প্রায় এক সঙ্গেই ঘোষণা করা হল যে, সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ নেপচুনের কার্যকলাপ অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। ডিসেম্বর মাসে অগিলভি প্রথম এই বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, নেপচুন গ্রহের গতিবেগে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই নেপচুনের অবস্থিতি সম্বন্ধেই উদাসীন, অতএব এই অভিমত ও পরবর্তী আবিষ্কার—যে নেপচুনের কাছাকাছি অস্পষ্ট একটি আলোকবিন্দু যেন দেখা যাচ্ছে,—নিতান্ত জ্যোতির্বিদ মহলের বাইরে বিশেষ কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি। বিজ্ঞানী মহলে অবশ্য এই আবিষ্কার প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল,—আরো বেশি, যখন ক্রমেই এই আলোক বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিতে লাগল—যখন বোঝা গেল যে নেপচুন আর তার এই নতুন উপগ্রহটি নির্ধারিত কক্ষপথ পরিত্যাগ করে অভূতপূর্ব এক পন্থা অনুসরণ করে চলেছে।

বিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়া খুব কম লোকেরই সৌরজগতের বিরাটত্ব সম্বন্ধে ধারণা আছে। প্রতি মুহূর্তে সূর্য ছুটে চলেছে—তার চারিদিকের অসংখ্য বিন্দুর মত গ্রহ, ধূলিকণার মত উপগ্রহ আর ধূমকেতুর দলকে সঙ্গে নিয়ে.. সূর্যের এই রাজত্বের উন্মুক্ত অসীমতা মানুষের কল্পনারও বাইরে। মানুষের আবিষ্কারে যতটা জানা গেছে তা হচ্ছে এই যে, নেপচুনের গতিপথের প্রান্তে দশ লক্ষের দুকোটি গুণ মাইল পড়ে রয়েছে—যেখানে উত্তাপ নেই, আলো নেই, শব্দ নেই,—কিছু নেই। এই বিপুল আয়তনের প্রান্তে নেপচুনের প্রতিবেশী নিকটতম তারাটির গতিপথ। এর মাঝে কখনো অতর্কিতে কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী ধূমকেতুকে মাত্র দেখা গেছে, যারা মুহূর্তে জ্বলে মুহূর্তপরেই মিলিয়ে

গেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হঠাৎ মানুষ আবিষ্কার করল এই শূন্যের মধ্যে এক নতুন পথিক, এক নতুন তারা—ভারী, দীর্ঘাকার একটা পদার্থ, হঠাৎ আকাশের রহস্যময় অন্ধকার থেকে জন্ম নিয়ে সূর্যের ঔজ্জ্বল্যের দিকে ছুটে চলেছে। দ্বিতীয় দিনেই এই তারাটাকে দেখা গেল যে-কোনো ভালো যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে, লিও তারকামালার মধ্যে রেগুলাসের কাছাকাছি ছোট্ট একটি বিন্দুর মত।

নববর্ষের তৃতীয় দিনে সংবাদপত্র মারফত বিশ্ববাসীকে প্রথম জানানো হল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের এই নতুন অতিথির কথা ও এর উপস্থিতির প্রকৃত গুরুত্ব। লণ্ডনের এক পত্রিকা 'গ্রহ-সংঘর্ষ' এই নাম দিয়ে সংবাদটি ছাপল ও ডুশেনের সঙ্গে একমত হয়ে মন্তব্য করল যে এই অদ্ভুত নতুন গ্রহটির সঙ্গে সম্ভবত নেপচুনের সংঘর্ষ হবে। ছোট্ট খবরটি মুখর হয়ে উঠল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। তেসরা জানুয়ারী তারিখে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান প্রধান সহরের অধিবাসীরা সকলেই খবরটা জানল, সকলেরই মনে জাগল অবছা কেমন আতঙ্ক আকাশের নতুন রহস্য নিয়ে;—আর সমস্ত পৃথিবীতে সূর্যাস্তের পিছনে পিছনে যখন রাত্রি নেমে এল, হাজার হাজার লোক আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল—পুরাতন পরিচিত তারকার দল।

পরদিন প্রত্যুষ পর্যন্ত। লণ্ডন সহরের শীতের প্রত্যুষ। পোলাক্স্ অস্ত গেল, মিলিয়ে গেল তারার দল। রুগ্ন পাণ্ডুর প্রভাতের আলো আস্তে আস্তে জমছে, যে-সব ঘরে লোকজনের ঘুম ভাঙছে সে সব ঘরের জানলায় জ্বলছে গ্যাস আর বাতির হলদে শিখা। কিন্তু এই প্রত্যুষে পথে যারা ছিল, ওটাকে দেখতে পেল সবাই,—বিটের হাই-তোলা পুলিস-পাহারাদার, গৃহহীন পথচারী, গৃহমুখী লম্পট, গোয়ালা আর খবরের কাগজওয়ালা, কারখানাগামী কারিগর,—আর সহরের বাইরে চাষীরা দেখল মাঠে যাবার পথে, ছিঁচকে চোরেরা দেখল ঘরে ফেরবার মুখে, প্রত্যুষের ঘুমভাঙা দেশ জুড়ে সকলে দেখল; আর

সমুদ্রে নাবিকরা দেখল আকাশে তাকিয়ে—বিরাট একটা জ্বলন্ত তারা হঠাৎ পশ্চিম আকাশে এসে ঝুলছে।

এত বড় তারা দেখা যায় না। যেদিন সন্ধ্যাতারাটা সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করে, তার চেয়েও উজ্জ্বল। সূর্যোদয়ের একঘণ্টা পরেও,—মিটমিট করে নয়, স্পষ্ট সাদা জ্বলজ্বলে হয়ে আকাশে ফুটে রইল নতুন তারাটা। যে-সব দেশে বিজ্ঞান-চেতনা পৌঁছয়নি, সে সব দেশের অধিবাসীরা হাঁ করে তারাটা দেখতে লাগল, ভয় পেল; একে অপরকে বলতে লাগল,—আকাশের এই রকম অভূতপূর্ব অগ্নি-চিহ্ন যুদ্ধ আনে, ধ্বংস আনে। বুয়োর আর হটেনটট্, গোল্ডকোস্টের নিগ্রো, ফরাসী, স্প্যানিশ আর পোর্টুগিজ অধিবাসীরা নবোদিত সূর্যের ক্রমবর্ধমান উত্তাপের নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই আশ্চর্য নতুন তারার অস্তগমন।

এদিকে পূর্বরাত্রে শতশত মানমন্দিরে অসম্ভব উত্তেজনা। সুদূর আকাশের দুটি গ্রহ বিপুল বেগে ছুটে আসছে—এই ঘটনা, এই বিশাল ধ্বংসকে দেখবার আর চিত্ররূপে ধরে রাখবার উদ্দেশ্যে নানা যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের কর্মব্যস্ততা। অচেনা একটা গ্রহ কোথা থেকে ছুটে এসে আঘাত করল নেপচুনকে, এই বিরাট সংঘর্ষের ফলে যে প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি হল তাতে দুটি গ্রহ এক সঙ্গে মিলে সৃষ্ট হল শুভ্র উজ্জ্বল উত্তপ্ত এক আলোক-মণ্ডল। সূর্যোদয়ের দুঘণ্টা আগে থেকে এই নবজাত বিরাট শ্বেত তারকা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে শুরু করল। একে দেখে সবচেয়ে আশ্চর্য হল জাহাজের নাবিকরা, থেকে থেকেই যাদের আকাশের দিকে তাকাতে হয়—যারা এর খবর কিছুই আগে শোনেনি। হঠাৎ দেখল, ছোট্ট একটি চাঁদ যেন উঠেছে, একেবারে মাথার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে স্তব্ধ হয়ে, তারপর রাত্রিশেষের সঙ্গে নেমে গেছে, ক্রমে মিলিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে।

পরদিন যখন আবার ইয়োরোপের আকাশে তারাটা উঠল, একে

দেখবার জন্যে ভাড়ের পর ভীড়—যত মাঠ আর বাড়ির ছাদ আর পাহাড়ের ঢালু জুড়ে। জলজ্বলে তারাটার সামনে প্রোজ্জ্বল শ্বেত আভা। আগের দিন যারা তারাটি দেখেছিল তারা আবার দেখে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল—আরো বড় দেখাচ্ছে তারাটাকে, স্তাখো স্তাখো, আরো জলজলে হয়ে উঠেছে! সত্যি, এই নতুন, আশ্চর্য তারা আর তার চারিদিকের শুভ্র বলয়ের ঔজ্জ্বল্যের কাছে চতুর্থীর চাঁদও যেন ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র জনতা সমস্বরে চীৎকার করল,—আরো বড়, আরো জলজলে তারাটা! কিন্তু বিভিন্ন মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদরা রুদ্ধ নিশ্বাসে একে অপরের দিকে মুখ-চাওয়া-চায়ি করলেন, অস্ফুট স্বরে বললেন—আরো এগিয়ে এসেছে, আজ আরো কাছাকাছি এসে পড়েছে ওটা।

'আরো কাছাকাছি'—দুটি কথা খট্‌খট্ করে বেজে উঠল টেলিগ্রাফে, স্পন্দন তুলল টেলিফোনের তারে, আর সহস্র সহরে ছাপাখানার কম্পোজিটররা নোংরা হাতে অক্ষর বসালো—'আরো কাছাকাছি।' আফিসে কাজ করতে করতে লোকে হঠাৎ এক অদ্ভুত উপলব্ধির আঘাতে কলম ফেলে দিল, হাজারো জায়গায় লোকে কথা বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ ভেবে, ঐ দুটি কথার কী ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা! 'আরো কাছাকাছি'—ভোরবেলাকার সগুজাগ্রত পথে পথে ছুটে চলল, মুখরিত হল শান্ত গ্রামের বনবীথিতে।

নাচের আসরে রঙীন মেয়েরা কথাটা শুনে না বুঝেও বোঝার ভান করে হেসে বলল, আরো কাছাকাছি? তাই নাকি? ভারি মজা তো? যারা বার করেছে তাদের বুদ্ধি কিন্তু খুব! শীত-রাত্রের নিঃসঙ্গ যাযাবর কথা দুটিতে সান্ত্বনার আশ্বাস খুঁজল আকাশের দিকে তাকিয়ে,—আসুক না আরো কাছে, তাহলেও কি এই কন্‌কনে ঠাণ্ডাটা একটু কমবে না? সগুমৃতের শিয়রে বসে রোরুদ্যমানা এক নারী ভাবল, নতুন তারা? উঠলেই বা কি আর না উঠলেই বা কি?

দিনের আলো চক্রবালে অদৃশ্য হল, প্রদোষান্ধকারে সমস্ত তারার সঙ্গে সঙ্গে নতুন তারাটাও আকাশে ফুটে উঠল। আর তারাটা এত উজ্জ্বল যে চাঁদকে দেখে মনে হল, এ যেন চাঁদের পাণ্ডুর প্রেতমূর্তি। দক্ষিণ আফ্রিকার এক সহরে এক ধনীর বিয়ে, বর-বধূর আগমনে রাস্তা আলোক-সজ্জিত করা হয়েছে। এক চাটুকার বললে, কর্তার বিয়েতে আকাশেও রোশনাই করা হয়েছে। দুটি নিগ্রো প্রেমিক-প্রেমিকা বন্যজন্তু আর ভুত-প্রেতের ভয় না মেনে এক বাঁশ-বনের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল; সেখানে জোনাকির আলো-অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকিয়ে নতুন তারা ওরা দেখল। ওদের মনে হল, এ তারা যেন ওদের জন্যে উঠেছে। ওর আলোয় কেমন অদ্ভুত শান্তি ওরা পেল।

অঙ্কশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত হাতের সামনে থেকে কাগজগুলো দূরে সরিয়ে রাখলেন। একটা সাদা শিশিতে এখনো কিছুটা ওষুধ রয়েছে যা খেয়ে চার রাত্রি না ঘুমিয়ে তিনি সমানে কাজ করে যেতে পেরেছেন। দিনের বেলা তিনি কলেজে গেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যাপনা করেছেন যথারীতি গাম্ভীর্যে, তারপর ঘরে ফিরে সমস্ত রাত ধরে অতিক্রম করেছেন গণিতের সমুদ্র। আজ পরিশ্রম শেষ, পৌঁছে গেছেন সর্বনাশা উপকূলে। ঔষধ-খাওয়া বিলম্বিত পরিশ্রমের ফলে গম্ভীর মুখে মদির ক্লান্তির শুষ্ক ছাপ। অধ্যাপক কিছুক্ষণ বসে ভাবতে লাগলেন। তারপর টেবল থেকে উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলেন। অগণিত বাড়ির ছাদ আর চিমনির ওপারে আকাশের মাঝামাঝি উঠেছে এই নতুন তারাটা। তারাটার দিকে পণ্ডিত চেয়ে রইলেন, যেন এই সমর্থ শত্রুর চোখের দিকে স্পষ্ট চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন। আমাকে তুমি মারতে পার, অস্ফুট ভাবে বললেন, কিন্তু তোমাকে আমি ধরেছি,—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আমি ধরেছি আমার মস্তিষ্কের মধ্যে। আমার পরিবর্তন নেই, এখনো না।

ওষুধের শিশিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর ঘুমের দরকার হবে না।

পরদিন দুপুরবেলা ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত অধ্যাপক ক্লাসে ঢুকলেন। নিত্য অভ্যাসমত টুপিটা টেবলে রেখে একটুকরো খড়ি বেছে নিয়ে হাতে চেপে ধরলেন। ছাত্ররা জানে, হাতে খড়ি না থাকলে অধ্যাপক পড়াতে পারেন না। ওটা তাঁর এক মজার মুদ্রাদোষ। সামনে তরুণ শিক্ষার্থীর দল—আগামী দিনের প্রতিভূ। স্বাভাবিক ভাবে অধ্যাপক বলতে শুরু করলেন,—এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনা আমার ক্ষমতার বাইরে,—এর ফলে তোমাদের সমস্ত কোর্স শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। সংক্ষেপে একটা কথা কেবল বলার আছে—তা হচ্ছে এই যে, মনুষ্য-সমাজে জীবনটাই বৃথা।

ছাত্ররা মুখ চাওয়া-চায়ি করে এ ওর দিকে—বিজ্ঞানীর মুখে এ কী কথা? পাগল হয়ে গেলেন না কি? কেউ মুখ টিপে হাসল, কয়েকজন স্থির বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অধ্যাপকের দিকে।

এটা গণিতেরই ব্যাপার। যে গণিত-বিচারের ফলে এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি, আজ তোমাদের আমি যতটা সম্ভব তা বোঝাতে চেষ্টা করব।

খড়ি নিয়ে অধ্যাপক এগিয়ে গেলেন ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে।

জীবনটা বৃথা,—সেটা অঙ্কের ব্যাপার! ফিস ফিস করে কেউ বলল। আর কেউ বললে, চুপ, চুপ করো, শোন কি বলছেন!

তারপর আস্তে আস্তে ছাত্ররা বুঝতে লাগল।

সেদিন রাত্রে তারাটা উঠল একটু দেরি করে। যখন উঠল, তার জ্যোতিতে সমস্ত আকাশ স্বচ্ছ নীল হয়ে গেল, কয়েকটা ছাড়া সমস্ত তারা গেল অদৃশ্য হয়ে। সাদা জলন্ত তারাটা খালি চোখেই ধরা পড়ে। আগের চেয়ে অনেক বড়, আর কী অদ্ভুত সুন্দর দেখতে! শীতপ্রধান

দেশের লোকে দেখল, তারাটার চারদিকে ধোঁয়ার মত মস্ত বড় বলয়; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পরিষ্কার আকাশে মনে হল, চাঁদের সিকি ভাগের চাইতে তারাটা ছোট নয়। সে সব দেশের আকাশ, মাটি, নতুন তারার ম্লান মধুর নীলাভ আভায় স্বপ্নিল হয়ে উঠল—নিষ্প্রভ হয়ে গেল বাতির হলদে আলো।

সে রাত্রে পৃথিবীর কারো চোখে ঘুম নেই। পৃথিবীর সমস্ত জনপদ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মৌমাছির গুঞ্জনের মত শব্দ, শহরে শহরে সেই গুঞ্জন রূপ নিল সহস্র ঘণ্টাধ্বনিতে। ছাদে আর গির্জায় আর মন্দিরে মিনারে ঘণ্টা বাজতে লাগল—আর ঘুমিয়ো না, আর পাপ কোরো না, ভগবানকে ডাক। পৃথিবীর পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে, রাত্রি গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ তারাটা বৃহত্তর, উজ্জ্বলতর হয়ে মাথার ওপরে এসে উঠল।

সেদিন রাত্রে পৃথিবীতে কারো চোখে ঘুম নেই। সহরে, বন্দরে আর পথে পথে আলো আর ভয়ার্ত লোকের ভীড়। সমুদ্রচারী সমস্ত জাহাজের পাটাতন ভর্তি যাত্রী উত্তর-আকাশের দিকে তাকিয়ে, কেননা গণিত-বিদ পণ্ডিতের সাবধান-বাণী ইতিমধ্যে তারে বেতারে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে, তার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে একশো ভাষায়। ঐ নতুন তারা আর নেপচুন অগ্নি-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে সূর্যের দিকে। ইতিমধ্যেই এই অগ্নিপিণ্ড প্রতি মুহূর্তে অতিক্রম করছে একশো মাইল, আবার মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে ওর গতিবেগ। পৃথিবী থেকে অবশ্য দশ কোটি মাইল দূরে ওর গতিপথ, কিন্তু সেই পথেরই খুব কাছাকাছি বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি আর তার উপগ্রহটির সূর্য-পরিক্রমার কেন্দ্র। মুহূর্তে মুহূর্তে বৃহস্পতি আর ওর মধ্যে আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠছে। এই আকর্ষণের ফল হবে কী? প্রথমত বৃহস্পতি এই আকর্ষণের ফলে তার সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। আর ঐ জলন্ত তারাটা এই নতুন আকর্ষণ সূর্যে পৌঁছবার সোজা পথ থেকে সরে একটু অর্ধবৃত্ত পথে হেলে যাবে। সেই বঙ্কিম পথ

অনুসরণ করলেই পৃথিবীর সঙ্গে ওর সংঘর্ষ। যদি ধাক্কা নাও লাগে, তাহলেও এত কাছ দিয়ে যাবে, যার ফলে 'ভূমিকম্প হবে, সমস্ত জীবন্ত আর মৃত আগ্নেয়গিরিতে একসঙ্গে আগুন জ্বলে উঠবে, আকাশে দুরন্ত ঝড় উঠবে, সমুদ্র-তরঙ্গ উদ্দামতায় ঝড়কে হার মানাবে, আর অগ্নি-উত্তাপে সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে।'—এই হল বৈজ্ঞানিকের সাবধান-বাণী।

আর তাঁর সাবধান-বাণী সত্যে পরিণত করবার জন্যেই যেন মাথার ওপরে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে আসন্ন সর্বনাশের ঐ নিষ্ঠুর জীবন্ত ভ্রূকুটি—ঐ নিঃসঙ্গ নতুন তারা।

সারারাত ধরে নিষ্পন্দ নেত্রে তারাটার দিকে তাকিয়ে অনেকের মনে হল, সত্যি যেন ওটা সারা আকাশ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। সমস্ত মধ্য-ইয়োরোপ, ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডে যে কুয়াশা আর তুষার জমেছিল তা ক্রমে ক্রমে গলে যেতে লাগল।

অবশ্য সমস্ত পৃথিবীর লোক যে আতঙ্কে মুহ্যমান হয়ে পড়ল এ কথা ঠিক নয়। মানুষ স্বাভাবিক পরিবেশ আর অভ্যাসের দাস। রাত্রের অদ্ভুত দৃশ্য অন্তর্হিত হলে দিনের বেলা আবার অধিকাংশ লোকই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সহরে সহরে দুএকটা ছাড়া সব দোকানই সময়ে খুলল বন্ধ হল, ডাক্তাররা রোগী দেখল, কেরাণীরা চাকরি করল, শ্রমিকরা জড় হল কারখানায়, পড়াশুনো করল ছাত্রেরা, প্রেমিকরা একে অপরকে খুঁজল, সুযোগের খোঁজে ঘুরল চোর, আর কূট চিন্তার জাল বুনল রাজনীতিকের গোষ্ঠী। সমস্ত রাত ছাপাখানায় খবর ছাপা হতে লাগল, কেবলমাত্র কয়েকজন পাদ্রী ঠিক করলেন, মিথ্যা-আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের জমায়েত বন্ধ করার জন্য গির্জার দরজা খুলবেন না। অনেক খবরের কাগজ টিপ্পনী ছাপল, ১০০০ খৃস্টাব্দেও এমনি সবাই ভেবেছিল যে পৃথিবীর বুঝি শেষ হবে। কিন্তু হয়েছিল কি? আর তা ছাড়া ঐ নতুন তারাটা তারাই নয়—কেবল মাত্র গ্যাস, একটা ধূমকেতু

মাত্র। তারা যদি হত তাহলে কখনো পৃথিবীকে ধাক্কা দিতে আসত না। যা অভূতপূর্ব, তার আতঙ্কের গোঁ-টাকে সর্বত্রই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতে চাইল বলিষ্ঠ স্বাভাবিক বুদ্ধি। এইদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রীনউইচ টাইম সোয়া সাতটার সময় নতুন তারাটার বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবার কথা। তখনই সারা পৃথিবী দেখবে, ব্যাপারটা কী হয়। অনেকেরই ধারণা জন্মেছে যে গণিত-বিদ অধ্যাপকের সাবধান-বাণী নিজের নাম জাহির করবার এক ব্যাপক উপায়। অতএব খানিকটা উত্তেজিত তর্কবিতর্কের পর অবশেষে স্বাভাবিক বুদ্ধি পরম আত্মবিশ্বাসে বিছানায় ঘুমতে গেল। আর সারা দুনিয়ার বর্বরতা নতুনত্বের বিস্ময় কাটিয়ে উঠে আবার আপন কাজে নিযুক্ত হল। এখানে ওখানে কয়েকটা কুকুর কেবল ডাকতে লাগল, নতুন তারার বিস্ময়ের কথা স্মরণ করে।

তারপর একঘণ্টা পরে তারাটা ঠিক উঠল ;—আগেকার রাত্রের চাইতে বড় নয় মোটেই। অনেকেই জেগে ছিল, বৈজ্ঞানিকের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা ভেবে সবাই একচোট হাসল, মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—বিপদ কেটে গেছে।

হাসি বন্ধ হতে দেরি হল না। তারাটা বড় হতে লাগল, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, ধীরে ধীরে,...প্রতি ঘণ্টায় একটু করে বাড়ছে, প্রতি ঘণ্টায় আকাশের চূড়ার দিকে এগোচ্ছে। ক্রমে রাত্রি দিনের মত উদ্ভাসিত হয়ে গেল। যদি তারাটা সোজা পৃথিবীর দিকে আসত, বৃহস্পতির আকর্ষণে খানিকটা গতিবেগ হারিয়ে বাঁকা পথ ধরে যদি তাকে এগোতে না হত, তাহলে এক দিনের বেশি লাগত না। লাগল কিন্তু পাঁচদিন ওকে আমাদের গ্রহের কাছাকাছি এসে পৌঁছতে। পরদিন রাত্রে ইংল্যাণ্ডের আকাশে যখন তারাটা দেখা গেল, তখন তার আয়তন চাঁদের তিনভাগের একভাগ। ইংল্যাণ্ডের সমস্ত বরফ গলে গেল। আমেরিকার আকাশে তারাটা দেখাল প্রায় পূর্ণ চাঁদের মত,

চোখ ঝলসে যায় এমনি সাদা আর গরম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত বাতাস বইতে শুরু করল। ভার্জিনিয়া, ব্রেজিল আর সেণ্ট্‌ লরেন্স উপত্যকায় দুরন্ত বজ্রমেঘ, চকিত বিদ্যুৎ আর ঝঞ্ঝাবাতের ফাঁকে ফাঁকে আকাশে থেকে থেকে তারাটা জ্বলজ্বল করে উঠতে লাগল। ম্যানিটোবায় বরফ গলে এল প্রচণ্ড বন্যা। আর পৃথিবীর সমস্ত পর্বত- চূড়ায় যত তুষার, সমস্ত গলে গেল সেইরাত্রে; সুউচ্চ প্রদেশ থেকে সমস্ত নদী পঙ্কিল জলে পরিপূর্ণ হয়ে ফুলে উঠে তীব্র গতিতে নামতে লাগল, বহু ভাঙা গাছ আর মানুষের মৃতদেহকে বহন করে। তারার ভৌতিক আলোয় নদীর জল বাড়ছে, ফুলছে; উপত্যকায় এসে কূল ছাপিয়ে গেল, বন্যায় উন্মত্ত হয়ে অনুসরণ করল পলায়মান জনপদবাসীর পিছু পিছু।

আর্জেন্টিনার উপকূল বরাবর দক্ষিণ আটলান্টিক সাগরের উত্তর দিক জুড়ে সমুদ্রজল অভূতপূর্ব ভাবে ফেঁপে উঠল, বহুস্থানে ঝড়ের বেগ সমুদ্র-বন্যাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল শত শত মাইল অভ্যন্তরে, ডুবে গেল কত শত নগরী। সমস্ত রাত্রি ধরে উত্তাপ এত বাড়ল যে সূর্যোদয়কে মনে হল যেন ছায়ার অভ্যুদয়। মাটির নীচে গুরু গুরু কম্পন বেড়েই চলেছে, শেষে উত্তরমেরু বৃত্ত থেকে হর্ণ উপদ্বীপ পর্যন্ত সমস্ত আমেরিকা জুড়ে পাহাড় ধ্বসে পড়ছে, ভূমি ফেটে গহ্বর হয়ে যাচ্ছে ধূলোয়। কোটোপ্যাক্সি পাহাড়ের পূরো একটা দিক ধ্বসে গেল একটা কম্পনে, লাভা-প্রবাহ অবর্ণনীয় বেগে ছড়িয়ে একদিন উন্মত্ত প্রবাহে সমুদ্রে গিয়ে পৌছল।

এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা, পিছনে চলেছে নিষ্প্রভ চাঁদ, আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ঝঞ্ঝাবায়ু। উৎসুক হয়ে অনুসরণ করছে সমুদ্র-বন্যা, ফুলে ফেঁপে উঠছে তরঙ্গ, দ্বীপের পর দ্বীপের ওপর ঝাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জনমানুষ। প্রচণ্ড উত্তাপ আর চোখ-অন্ধ-করা উজ্জ্বল সেই ভীষণ তরঙ্গ, পঞ্চাশ ফুট উঁচু জলের একটা দেয়ালের মত ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে ক্ষুধিত হুহুঙ্কারে ছুটতে ছুটতে

অবশেষে এসিয়ার দীর্ঘ উপকূলে আছড়ে পড়ল, চীনের উপত্যকার ওপর দিয়ে বয়ে গেল বন্যার মত। সূর্যের চেয়ে বৃহদাকার, সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল আর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তারাটা। জনাকীর্ণ বৃহৎ ভূখণ্ডের ওপর নির্মম জ্যোতিতে তাকিয়ে রইল সে,—আর সহর আর গ্রাম, কতো প্যাগোডা আর পথ, গাছপালা আর শস্যক্ষেত্র আর জলন্ত আকাশের দিকে অসহায় আতঙ্কে নিদ্রাহীন চোখ মেলে চাওয়া লক্ষ লক্ষ লোকের ওপর পড়ল তার দৃষ্টি ;—তারপর এল দূরাগত ক্রমবর্ধমান বন্যার শব্দ। সেই রাত্রে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের এলোমেলো পলায়ন—উত্তাপে শিথিল-হয়ে-আসা শরীর, নিরুদ্ধ নিশ্বাস ; পিছনে প্রাচীরের মত বিরাট সাদা বন্যা আগুয়ান। তার পরে মৃত্যু।

সমস্ত চীন দেশ ঐ তারার শ্বেত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল, কিন্তু জাপান, জাভা আর পূর্ব-এসিয়ার অন্যান্য দ্বীপগুলির ওপর তারাটা জলতে লাগল ঝাপসা লাল রঙের একটা গোলার মত ;—কেননা এসব দ্বীপের প্রত্যেকটি আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হল আগন্তুকের অভিনন্দন। ধোঁয়া আর ছাই আর বাষ্পে ছেয়ে গেল আকাশ। ওপরে ছুটছে লাভা আর বাষ্প আর অঙ্গার, নিচে ফুঁসছে বন্যা, সমস্ত পৃথিবী যেন ভূমিকম্পে দুলে দুলে উঠছে, কেঁপে উঠছে মুহুর্মুহু!

তিব্বত আর হিমালয়ের স্মরণাতীত যুগের তুষার একটু পরেই গলতে শুরু করল, লক্ষ লক্ষ ঝরণা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে একে অপরের অঙ্গে মিশে মিশে ঝরে পড়তে লাগল ব্রহ্ম আর হিন্দুস্থানের সমতলভূমিতে। ভারতের মধ্যভূমির জটিল শিখরে শিখরে জলে উঠল সহস্র আগুন ; আর পাদদেশে চঞ্চল জলধারায় লেলিহান রক্তশিখার ছায়া কাঁপতে লাগল ; সেখানে কত কালো কালো প্রাণী নির্বীর্যভাবে শেষ চেষ্টা করতে লাগল আত্মরক্ষার। আর বিস্তীর্ণ নদীপথ বেয়ে অসংখ্য নরনারী কাণ্ডারহীন বিমূঢ়তায় ভেসে চলল উন্মুক্ত সমুদ্রের সন্ধানে—সর্বশেষ আশায়।

এবার থেকে তারাটা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হতে লাগল, বাড়তে লাগল তার উত্তাপ আর জ্যোতি। উষ্ণ মহাসাগরের উজ্জ্বল প্রভা ম্লান হয়ে গেল, ঝটিকা-তাড়িত জাহাজের বিন্দু-শোভিত কালো কালো তরঙ্গ দাপাদাপি করতে লাগল অবিরাম। সেই স্ফুরিত তরঙ্গমালা থেকে ভৌতিক ফলার মত পাকচক্রে আকাশে উঠতে লাগল বাষ্প।

তারপর ঘটল এক প্রহেলিকা। ইয়োরোপে যারা আবার তারাটা ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাদের মনে হল, পৃথিবীর আবর্তন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাহাড়-ধ্বসা, অট্টালিকা ধ্বসা আর বন্যার হাত এড়িয়ে যারা অজস্র উঁচু নীচু উন্মুক্ত ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসহ্য প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল আকাশের দিকে,—তারাটা কিন্তু উঠল না। অনেক পুরোণো নক্ষত্রবৃন্দ, লোকে যাদের ভেবেছিল চিরকালের মত হারিয়ে গেছে, তারা আবার দেখা দিল। ইংল্যাণ্ডের উত্তপ্ত মাটি কেবল কেঁপে কেঁপে উঠলেও আকাশ কিন্তু উত্তপ্ত, পরিষ্কার হয়ে গেল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও সিরিয়াস্, ক্যাপেলা, আর এ্যাল্‌ডেবেরন্ প্রভৃতি কয়েকটি তারা আবার দেখা গেল বাষ্পের আস্তরণের মধ্যে দিয়ে। প্রায় দশঘণ্টা পরে আবার বিরাট তারাটা উঠল; তখন দেখা গেল তারাটার ঠিক মাঝখানে কালো একটা বৃত্ত। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই উঠল সূর্য।

এসিয়া মহাদেশের ওপর আকাশের চক্রমণ থেকে যেন পিছনে পড়ে যেতে লাগল তারাটা। হঠাৎ ঠিক ভারতবর্ষের ওপরে যখন, ওর আলো এল নিষ্প্রভ হয়ে। সিন্ধুনদ থেকে গঙ্গানদী পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতভূমি সারা রাত যেন জলজলে বিরাট একটা জলাভূমি, তার ওপর জেগে আছে যত মন্দির আর প্রাসাদ, টিলা আর পর্বত, তাদের ওপরে মানুষের জটলা। যেখানে জলের ওপর জেগে আছে একটু জমি, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে মানুষের পর মানুষ, তারপর গরমে ঝলসে আর আতঙ্কে কেঁপে টুপটাপ করে জলে নেমে পড়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে একটা সুবিপুল

হাহাকার যেন উঠছে, এমনি সময় এই হতাশার অগ্নিকুণ্ডের ওপর কিসের ছায়া যেন বুলিয়ে গেল, ঠাণ্ডা বাতাস বইল এক ঝলক, আর ঘনিয়ে এল মেঘ। তারাটার দিকে তাকালে চোখ যেন অন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু এখন দেখা গেল, কালো একটা চাকা তারাটার মাঝখানে যেন ভেসে উঠছে। ওটা আসলে চাঁদ, নতুন তারা আর পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়েছে। সমস্ত লোক এই হঠাৎ-রক্ষা-পাওয়ার আবেগে ভগবানকে ডেকে উঠল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এক অদ্ভুত ধারণাতীত বেগে পূর্ব-দিগন্ত থেকে লাফিয়ে ছুটে এল সূর্য। তারপর সূর্য, চন্দ্র আর ঐ নতুন তারা আকাশপটে দুরন্ত ভাবে বিচরণ করতে লাগল।

ইয়োরোপের দর্শকের চোখে তারা আর সূর্য পূর্ব-চক্রবাল থেকে যেন ঠিক পরপর উঠল। তারপর আকাশের কিছুটা অংশ ধরে একের পিছনে অপরে উন্মাদের মত ছুটল। তারপর আস্তে আস্তে ওদের গতি গেল মন্থর হয়ে; ক্রমে ঠিক মাথার ওপরে আকাশের চূড়ার ওপর উঠে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল দুটি মণ্ডল, উভয়ের প্রচণ্ড জ্যোতি এক সঙ্গে যেন মিশে গেল। চাঁদকে আর তারার ছায়ারূপে দেখা গেল না, সারা আকাশের আলোয় কোথায় হারিয়ে গেছে সে। যে সব মানুষ তখনো বেঁচে ছিল, ক্ষুধা, উত্তাপ ক্লান্তি আর হতাশায় বিমূঢ়,—বিভ্রান্ত চোখ মেলে এই দৃশ্য দেখল। কোন কোন মানুষ অবশ্য বুঝতে পারল এই সঙ্কেতের অর্থ কী।

এই ধরিত্রী আর তারা নিকটতম হয়ে এসেছিল, একে অপরকে আকর্ষণ করছিল চরম আমন্ত্রণে, তারপর হঠাৎ তারাটা সরে গেল দূরে। এখন ঐ আগন্তুক চলেছে, সরে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তে। এবার সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের অভ্যন্তরে তার চরম যাত্রা!

এবার জমলো মেঘের পরে মেঘ, নভোমণ্ডল হারিয়ে গেল দৃষ্টির ওপারে, বজ্র আর বিদ্যুতের অলঙ্কারে সজ্জিত হল ধরণী। বৃষ্টি নামলো সারা পৃথিবী জুড়ে—এমন বর্ষণ, যা কেউ কখনো দেখেনি। যেখানে যেখানে আগ্নেয়গিরি অগ্নিদাহ উৎক্ষেপ করেছিল, মেঘের চন্দ্রাতপ

থেকে সেখানে অঝোরে ঝরতে লাগল কাদা ; সর্বত্র ভূমি ভাসিয়ে কর্দমাক্ত ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ফেলে রেখে এগিয়ে চলল জল, আবার উঠল ডাঙা, ঝড়ের পরের সমুদ্রতীরের বিস্রস্ত কঙ্কালের মত রইল সৃষ্টির আবর্জনা আর কত মানুষ আর অমানুষের মৃতদেহ। দিনের পর দিন ধরে এমনি জল সরে যেতে লাগল, কত বাড়ি ঘর গাছপালা টেনে নিয়ে যেতে লাগল, স্রোতের টানে মাটি সরে সরে তৈরি হতে লাগল কত গভীর নালা আর কত বিরাট বাঁধ। তারকা বিদায় নিয়েছে, নিভে গেছে উত্তাপ আর আলো, এবার কদিন ধরে শুধু অন্ধকার। এ অন্ধকার কেটে যাবার পরেও অনেক দিন ধরে ভূমিকম্প কিন্তু থামল না।

তারাটা যখন বিদায় হয়েছে, আবার ক্ষুৎপীড়িত মানুষের পাল সাহস সঞ্চয় করে গুটি গুটি ফিরে আসছে। বিধ্বস্ত নগরী, মৃৎপ্রোথিত খাদ্যাগার আর বিনষ্ট শস্যক্ষেত্রে ক্রমে আবার তারা জমায়েত হচ্ছে। একদিনের প্রলয় এড়িয়ে যে কটা জাহাজ ভেসে আছে, তারা পালছেঁড়া হালভাঙা হয়ে পরিচিত বন্দরের কাছে ফিরে আসছে আস্তে আস্তে নতুন পথ আর স্বল্প জলের নতুন নিশানাকে সন্ধান করে করে। ক্রমে ঝড় একেবারে শান্ত হয়ে এল। দিনগুলো আগের চেয়ে আরো গরম, সূর্য যেন আরো বড় বোধ হতে লাগল, আর চাঁদের চেহারা শুকিয়ে হয়ে গেল আগের তিনভাগের একভাগ ; অমাবস্যা আসতে লাগল পুরো আশীটা দিন।

পুরোনো সভ্যতার কতটা গেল কতটুকু বাঁচল, বিজ্ঞান নীতি আর সংস্কৃতি কতটা রক্ষা পেল, মানুষে মানুষে নতুন করে কী সম্বন্ধ গড়ে উঠল, সে খবর এ গল্পে নয়। নতুন যুগের নাবিকরা দেখল, আইসল্যাণ্ড গ্রীণল্যাণ্ড আর ব্যাফিন উপসাগরের তীরভূমি শস্যশ্যামলা হয়ে উঠছে। উত্তপ্ত পৃথিবীর মানুষরা ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে। সে ঘটনাও এ কাহিনীতে অবান্তর। নতুন তারার আবির্ভাবে শুরু হয়ে ওর অন্তর্ধানের সঙ্গেই এ গল্পের শেষ।

সৌরজগতের এই বিচিত্র ঘটনা মঙ্গলগ্রহের জ্যোতির্বিদরা বিপুল ঔৎসুক্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। (মঙ্গল-গ্রহে জ্যোতির্বিদ আছেন বৈকি, যদিও তাঁদের চেহারা এই পৃথিবীর মানুষদের মত মোটেই নয়) তাঁরা অবশ্য ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন তাঁদের নিজস্ব দিক থেকে। একজন লিখলেন, 'আমাদের সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে যে বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলটা সূর্যের দিকে ছুটে গেল, তার আয়তন আর উত্তাপ এত প্রচণ্ড যে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেটা পৃথিবী-গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগতে কোন রকমে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও 'গ্রহটার ক্ষতি হয়েছে নিতান্ত যৎসামান্য। ভূখণ্ডগুলোর যে সব সীমানা আমাদের পরিচিত তার কোনটারই অদল বদল হয়নি, জলভাগও যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। একটু পরিবর্তন যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই যে দুটো মেরু অঞ্চলের যে সাদাটে রঙটা, (জমাট তুষারের জন্যে তাদের এই ধারণা) সেটা যেন একটু কমে গিয়েছে।' মাত্র কয়েক লক্ষ মাইল দূরে থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে মানব-জগতের প্রচণ্ডতম সর্বনাশও এমনি অকিঞ্চিৎকর হয়েই ধরা পড়ে।

—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

পাইক্র্যাফ্‌টের গোপন রহস্য

ও যেখানে বসে আছে, সেখান থেকে আমার দূরত্ব বারো গজের বেশী হবে না। ঘাড় ফেরালেই ওকে দেখতে পাই, এবং ওর দিকে তাকালে প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিবিনিময় হয়। ওর দৃষ্টিতে তখন ফুটে ওঠে—

হ্যাঁ, অনেকটা মিনতির ভাবই ফুটে ওঠে। এবং তার সঙ্গে সন্দেহও মেশানো থাকে কতকটা।

চুলোয় যাক ওর সন্দেহ! ইচ্ছা করলে অনেক আগেই ওর সমস্ত রহস্য প্রকাশ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি, এবং সেদিক দিয়ে ওর নিশ্চিন্তই থাকা উচিত—মানে ওর মত মেদবহুল ব্যক্তির পক্ষে যদি কখনো নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব হয়! আর তা ছাড়াও, ওর রহস্য প্রকাশ করলেই বা বিশ্বাস করছে কে?

আহা, পাইক্র্যাফ্‌ট, বেচারা! মাংসের প্রকাণ্ড পিণ্ড একটি। লণ্ডনের সমস্ত ক্লাব খুঁজলেও ওরকম স্থূল ব্যক্তি আর একটি পাওয়া যাবে না।

ক্লাবের একটা ছোট টেবলে আগুনের ধারে বসে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। কী খাচ্ছে ও? সতর্ক, চোরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখি, আমার দিকে লক্ষ্য রেখে একখণ্ড গরম মাখন-মাখানো কেক-এ দাঁত বসাচ্ছে। আরে গেল, আমার দিকে তাকানো কেন বাপু?

হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তুমি যখন কিছুতেই তোমার নীচতা ত্যাগ করবে না, আমাকে উপযুক্ত সম্মান দেবে না,—এখানে, তোমার চোখের সামনে বসেই তোমার সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করব। তোমাকে আমি অনেক সাহায্য করেছি, আড়ালে রেখে রক্ষা পর্যন্ত করেছি; আর তার প্রতিদান-স্বরূপ তুমি আমার ক্লাব-জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছ—কেবল সেই এক কথা, করুণ দৃষ্টিতে বারবার একঘেয়ে এক অনুনয়,—প্রকাশ কোরো না, আমার রহস্য প্রকাশ কোরো না!

আর তা ছাড়াও, ঐ রাক্ষসের মত খাওয়াও আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

এই সব কারণেই আমি পাইক্র্যাফ্‌টের গোপন তথ্য প্রকাশ করতে বসেছি,—সম্পূর্ণ তথ্য, এবং সম্পূর্ণ তথ্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পাইক্র্যাফ্‌টের সঙ্গে এই ধূমপান-কক্ষেই আমার আলাপ হয়। আমি তখন সবে নতুন মেম্বার হয়েছি, বয়স অল্প; আড়ষ্ট ভাব কাটিয়ে উঠতে পারিনি তখনো। পাইক্র্যাফ্‌ট লক্ষ্য করেছিল তা। একা বসে আছি, ভাবছি মেম্বারদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতে পারলে বেশ হত। এমন সময় হঠাৎ এল সে; প্রকাণ্ড থুতনি, হুয়া ভুঁড়ি বাগিয়ে একরকম গড়াতে গড়াতে এসেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসল। তারপর জোরে জোরে কিছুক্ষণ নিশ্বাস ফেলে দেশলাইয়ের সঙ্গে খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে একটা চুরুট ধরাল। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে কি যেন বলল, দেশলাইটা ভাল জ্বলছে না, নাকি। তারপর সে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করল। যতগুলো বেয়ারা পাশ দিয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেককে থামিয়ে তার নিজস্ব তীক্ষ্ণ পাতলা গলায় দেশলাইয়ের কথা জানিয়েছে।—সে যা-ই হোক, কতকটা এভাবেই আমাদের আলাপ হয়।

একথা সেকথার পর সে খেলাধুলো সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করল। তারপর আমার শরীরের গঠন আর গায়ের রঙের কথা তুলল,—আপনার শরীর একহারা,—একহারা কেন, হয়ত রোগা-ও বলা চলে। গায়ের রঙ আমার হয়ত বিশেষ ফর্সা নয়—আমার প্রপিতামহী যে হিন্দু ছিলেন, এজন্য আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই—কিন্তু তাই বলে যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আমাকে দেখেই তা বুঝতে পারবে, এ আমি পছন্দ করি না। গোড়া থেকেই তাই আমার মন পাইক্র্যাফ্‌টের ওপরে বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

আমার সম্বন্ধে এত কথা বলার উদ্দেশ্যই কিন্তু ছিল তার নিজের প্রসঙ্গের অবতারণা করা।

বলল, আপনি বোধহয় আমার থেকে খুব বেশী পরিশ্রম করেন না; আর আপনার খাওয়াও বোধহয় আমারই মত? (অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তিমাত্রের মতই তারও ধারণা ছিল, সে কিছুই খেত না) তারপর বাঁকা হাসি হেসে বলল, অথচ দেখুন, আমাদের মধ্যে কত পার্থক্য!

তখন সে শুরু করল নিজের মেদবহুল শরীরের কথা। একই কথা বলতে লাগল বারবার—রোগা হবার জন্য সে কী কী করেছে এবং আরো কত কি করবে, লোকে তাকে কী করতে বলেছে বা তার মত অবস্থায় লোকে রোগা হবার জন্য কী করেছে। বলল, এমনিতে হয়ত মনে হবে, শুধু খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করে অথবা ওষুধের ব্যবহারেই শরীরের পুষ্টি অথবা মেদ দমন করা সম্ভব। এমনি সব যত বাজে কথা তার। অত্যন্ত বিরক্ত লাগত।

এক আধবার হয়, তবু এরকম ব্যবহার ক্লাবে বরদাস্ত করা চলে। কিন্তু কিছুদিন পরে মনে হল, অনেক সহ্য করেছি, আর সম্ভব নয়। ও যেন পেয়ে বসেছে আমাকে! যখনি ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে। খেতে বসেছি, অমনি পাশে এসে গোগ্রাসে খেতে শুরু করেছে। সব সময়ে যেন লেগেই রয়েছে পেছনে! তবে এইটুকুই আশ্বাসের কথা যে, সে শুধু আমার একার পেছনেই লাগে না। কিন্তু প্রথম থেকেই তার ব্যবহারে মনে হত, কেমন করে যেন সে জানতে পেরেছে, এমন একটা বিশেষ কিছু আমার মধ্যে থাকা সম্ভব অন্য কারো মধ্যে যা নেই।

বলত, ওজন কমাবার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি আছি,—
—সব কিছু। বলত, আর ফুলো ফুলো গাল দুটো তুলে আমার দিকে উঁকি মেরে তাকাত।

পাইক্র্যাফ্ট, বেচারা! আবার সে ঘণ্টি বাজাচ্ছে, নিশ্চয় এখনি আবার মাখন-মাখানো কেক্এর অর্ডার দেবে!

একদিন সে কাজের কথা পাড়ল। বলল, আমাদের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে মনে করলে ভুল হবে। শুনেছি প্রাচ্যে— এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে আমার দিকে এমন অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল যে মনে হল যেন কোন জলজন্তু তার চৌবাচ্চা থেকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ আমি ক্ষেপে উঠলাম,—কে আপনাকে আমার প্রপিতামহীর ব্যবস্থালিপির কথা বলেছে বলুন তো?

ঘুসি পাকিয়ে সে বলল, কেন, কী হয়েছে?

এই এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকবার আমাদের দেখা হয়েছে, আর প্রতিবারেই আপনি আমার এই গোপন তথ্য সম্বন্ধে স্থূল ইঙ্গিত করেছেন।

তা, ধরা যখন পড়েই গেছি আর স্বীকার না করে লাভ কি? হ্যাঁ, আমি শুনেছি—

প্যাটিসনের কাছ থেকে?

হ্যাঁ, তবে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এক রকম তাই বটে।

আমার মনে হল, ও মিথ্যা বলছে।

জানেন, প্যাটিসন যা করেছিল তা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই?

ঠোঁট দুটো বন্ধ করে সে ঘাড় নাড়ল,—মেনে নিল আমার কথা।

আমার প্রপিতামহীর ব্যবস্থালিপি নিয়ে নাড়াচাড়া করা বিশেষ নিরাপদ নয়। বাবা তো আমাকে প্রায় প্রতিজ্ঞা করিয়েই নিয়েছিলেন,—

—কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন নি তো?

না, কিন্তু তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। নিজেও তিনি মাত্র একবার তা ব্যবহার করেছিলেন।

ও! কিন্তু,—আপনি কী বলেন? ধরুন—ধরুন, যদি একবারের জন্য—

—ব্যবস্থালিপিগুলো অত্যন্ত অদ্ভুত। এমন কি, তাদের গন্ধ পর্যন্ত··· না, সে হয় না।

কিন্তু এতদূর অগ্রসর হয়ে আমার কথায় ছেড়ে দেবে, সে বান্দা

পাইক্র্যাফ্‌ট নয়। তা ছাড়া এ আশঙ্কাও আমার ছিল যে, একবার যদি ও ধৈর্য হারায় আর নিস্তার নেই, হঠাৎ হয়ত আমাকে আক্রমণ করেই বসবে। এ আমার এক দুর্বলতা, স্বীকার করতে লজ্জা নেই। কিন্তু তার ওপরে আমি এত বিরক্ত হয়েছিলাম যে, ইচ্ছা হল বলি,—যাও, তোমার নিজের দায়িত্বে যা খুসি করো গিয়ে। প্যাটিসনের যে প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে তুলেছি সে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, এবং এ ক্ষেত্রে অবান্তর। তবে, তাকে যে ব্যবস্থালিপি দিয়েছিলাম, জানতাম তা সম্পূর্ণ নিরাপদ। অন্যগুলোর সম্বন্ধে আমার কোন সঠিক ধারণা ছিল না, বরং মোটামুটি এই ধারণাই ছিল যে তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু পাইক্র্যাফ্‌টের ওপর ওদের ফলাফল যদি বিষাক্ত হয়েই দাঁড়ায়—

স্বীকার করতে লজ্জা নেই,—আমার মনে হল, এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে পাইক্র্যাফ্‌টের পক্ষে যা কখনো অনিষ্টকর হতে পারে!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অদ্ভুত-গন্ধওয়ালা চন্দনের বাক্সটা সিন্দুক থেকে বের করে খসখসে চামড়াগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলাম। আমার প্রপিতামহীর হয়ে যিনি ব্যবস্থালিপিগুলো লিখে রেখেছিলেন, বিবিধ রকমের চামড়ার ওপরে বোধহয় তাঁর দুর্বলতা ছিল। তাঁর হাতের লেখাও ছিল অত্যন্ত জড়ানো। অনেক কিছুরই পাঠোদ্ধার করতে পারলাম না, এবং যেটুকুর পারলাম তাও অতি কষ্টে; যদিও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের দৌলতে হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমাদের বংশে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। তবে, একটা ব্যবস্থা-লিপির পাঠোদ্ধার আমি ঠিকই করেছিলাম। সিন্দুকের ধারে মেঝের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরে সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

পরের দিন পাইক্র্যাফ্‌টকে বললাম, এই যে এটা দেখছেন,—

সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যগ্রভাবে হাত বাড়ালো, কিন্তু আমি চট্‌ করে হাত সরিয়ে নিলাম। বললাম, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, এটা হল ওজন কমাবার জন্য। (পাইক্র্যাফ্‌ট—ও!) অবশ্য আমি একেবারে নিশ্চিত হতে পারছি না, তবে আমার মনে হচ্ছে তাই। কিন্তু আমার উপদেশ যদি শুনতে চান তো বলব, এ না নেওয়াই আপনার ভাল—ভেবে দেখুন, আপনার জন্যই আমি আমার রক্ত পর্যন্ত কলুষিত করতে বসেছি—কারণ, যতদূর জানি, আমার প্রপিতামহীর দিকের পূর্বপুরুষরা একটু অদ্ভুত ধরণেরই ছিলেন,—বুঝলেন তো?

তাহলেও আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই, পাইক্র্যাফ্‌ট বলল।

আবার আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়লাম। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার কল্পনা কিছুতেই দানা বেঁধে উঠতে পারল না। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মিঃ পাইক্র্যাফ্‌ট, রোগা হয়ে গেলে আপনাকে কেমন দেখতে হবে, একবার ভেবে দেখেছেন কি?

যুক্তিতে বুঝবে, সে পাত্র পাইক্র্যাফ্‌ট নয়। ওকে প্রতিজ্ঞা করালাম, এর ফলে যা-ই হোক, নিজের শরীর নিয়ে আর কখনো ও আমাকে একটা কথাও বলবে না। তারপর ব্যবস্থালিপিটা ওর হাতে দিয়ে দিলাম। অত্যন্ত বেয়াড়া জিনিষ কিন্তু,—সাবধান করে দিলাম ওকে।

সেজন্য আপনাকে ঘাবড়াতে হবে না, বলে সে ব্যবস্থালিপিটা গ্রহণ করল।

চোখ বড় বড় করে সে ব্যবস্থালিপিটার দিকে তাকাল—বললে, কিন্তু—কিন্তু—

এতক্ষণে ও আবিষ্কার করেছে, ব্যবস্থালিপিটা ইংরেজী ভাষায় লেখা নয়। বললাম, আমি সাধ্যমত একটা তর্জমা করে দিচ্ছি।

ভাল তর্জমাই করে দিলাম। তারপর সপ্তাহ দুয়েক আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তা হয়নি; যতবার সে আমার কাছে আসতে

চেয়েছে চোখ রাঙিয়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করেছি, আর সেও আমাদের চুক্তি ভঙ্গ করেনি। এইভাবে কেটে গেল দু' সপ্তাহ, কিন্তু দেখা গেল, পাইক্র্যাফ্‌ট একটুও রোগা হয়নি। তখন সে বলল, বলতে বাধ্য হচ্ছি মশাই, এতে কিছুই হচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল আছে কোথাও, না হলে কোনো উপকার পাচ্ছি না কেন? আপনি কিন্তু আপনার প্রপিতামহীর প্রতি ঠিক সুবিচার করছেন না।

ব্যবস্থাপত্রটা কোথায়?

সন্তর্পণে পকেট থেকে বের করে ব্যবস্থাপত্রটা আমার হাতে দিল।

তালিকাটার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ডিমটা খারাপ ছিল তো?

না তো! কেন, তাই কি হওয়া উচিত ছিল নাকি?

আমার প্রপিতামহীর ব্যবস্থাপত্রের ব্যাপারে এ তো বলাই বাহুল্য! যখনি কোন বিশেষ নির্দেশ না থাকবে বুঝতে হবে, সবথেকে খারাপ জিনিষ ব্যবহার করা উচিত। এ বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত কড়াকড়ি ছিল। এর কয়েকটা ব্যাপারে অবশ্য কখনো কখনো অন্য ব্যবস্থাও দেওয়া যেতে পারে। আপনার কাছে র‍্যাট্‌ল্‌-স্নেকের টাটকা বিষ আছে?

জ্যাম্‌র‍্যাকের দোকান থেকে একটা র‍্যাটল্‌-স্নেক কিনেছিলাম, দাম পড়েছিল—

যতই পড়ুক, সে ব্যাপার আপনার। এই শেষের নির্দেশটা—

আমি একজনকে চিনি, যে—

হুঁ! আচ্ছা, আমি অন্য ব্যবস্থাগুলোর কথাও লিখে দিচ্ছি। ও ভাষা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান তাতে মনে হয়, এর বানানটা অত্যন্ত গোলমেলে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, 'কুকুর' বলতে এখানে বোঝাবে, 'পারিয়া-কুকুর।'

তারপর প্রায় একমাস কেটে গেছে। পাইক্র্যাফ্‌ট রোজ ক্লাবে

আসে। একটুও রোগা হয়নি, এবং ফলে তার উদ্বেগও রয়ে গেছে সমানই। আমাদের সর্ত সে ভঙ্গ করেনি, যদিও মাঝে মাঝে হতাশভাবে মাথা নেড়ে সর্তের প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করেছে। একদিন বলল, আপনার প্রপিতামহী—

বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম, সাবধান, তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথাও নয়।

ও চুপ করল।

আমি ভেবেছিলাম, পাইক্র্যাফ্‌ট হয়ত আমার ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করবে না; কারণ, তিনজন নতুন মেম্বারের সঙ্গে যেভাবে সে সেদিন নিজের বপুর বিশালতা সম্বন্ধে কথা বলছিল তাতে মনে হল, ও নতুন ব্যবস্থাপত্রের সন্ধানে রয়েছে। এহেন সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর টেলিগ্রাম এল।

টেলিগ্রাম নিয়ে ছোকরাটা সোজা আমার কাছে এসে চীৎকার করে উঠল, মিঃ ফর্মালীন! টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে তখনি খুলে ফেললাম।

ঈশ্বরের দোহাই, চলে আসুন—পাইক্র্যাফ্‌ট।

হুঁ! বেশ বুঝলাম, প্রপিতামহীর সুনাম অব্যাহতই রয়েছে। সত্যি বলতে কি, অত্যন্ত আনন্দ হল, আনন্দের আতিশয্যে ভোজন-পর্বটা বেশ ভাল করেই সম্পন্ন করলাম।

হলঘরের পোর্টারের কাছে তার ঠিকানা পেলাম। ব্লুমস্‌বেরিতে একটা বাড়ির ওপরের তলার ফ্ল্যাটে সে থাকত। কফি-টফি সেরে চুরুটের অপেক্ষা না রেখেই সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

সামনের দরজার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, পাইক্র্যাফ্‌টের বোধহয় অসুখ করেছে; দুদিন মোটে বেরোয় নি। 'তিনি আমাকে ডেকেছেন', একথা জানাতে তারা আমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিল।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজালাম। মনে মনে বললাম,

ব্যবস্থাপত্রটা ও না নিলেই পারত। শুয়োরের মত যার খাওয়া, তার শরীরটাও শুয়োরের মতই হওয়া উচিত।

এক জাঁদরেল গোছের স্ত্রীলোক এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—তার মাথার টুপি ঠিক জায়গায় নেই, মুখে উদ্বেগের ছায়া।

আমি নাম জানাতে দ্বিধাভরে দরজা খুলে দিল। বললে, তিনি বলেছিলেন, আপনি এলে যেন ভিতরে নিয়ে আসা হয়। কোথায় আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তা নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর চুপিচুপি বলল, তিনি স্যার দরজা বন্ধ করে আছেন।

বন্ধ করে!

হ্যাঁ স্যার, কাল সকাল থেকে দরজা বন্ধ করে আছেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছেন না আর থেকে থেকে গালাগালি করছেন। উঃ কী ভয়ানক!

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকালাম। ঐ ঘরে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যাপারটা কি?

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, পথ্যের জন্য বড় জ্বালাতন করছেন, স্যার। বলেন, এমন পথ্য চাই যাতে পেট ভরে। যা পেয়েছি জোগাড় করে দিয়েছি।···সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু বোধহয় উনি পেয়েছেন।

ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ স্বর ভেসে এল, কে, ফর্মালীন?

পাইক্র্যাফ্‌ট নাকি? বলে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ওকে চলে যেতে বলুন।

বললাম।

দরজার ভিতর থেকে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল; কে যেন অন্ধকারে দরজার হাতলটা হাতড়াচ্ছে। পাইক্র্যাফ্‌টের পরিচিত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দও কানে এল।

বললাম, ঠিক আছে। চলে গেছে সে।

আরো অনেকক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু তবুও দরজা খুলল না।

হঠাৎ চাবি ঘোরানোর শব্দ শোনা গেল। পাইক্র্যাফ্ট বলল, ভেতরে আসুন।

হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম দরজাটা। স্বভাবতই আশা করেছিলাম, পাইক্র্যাফ্টকে সামনে দেখতে পাব।

কিন্তু কোথায় সে!

জীবনে কখনো আমি এতটা হতভম্ব হইনি। যেখানে ঢুকলাম সেটা হল তার বসবার ঘর। জিনিষপত্র অগোছাল, ইতস্তত ছড়ানো; বই পত্রের মধ্যে রয়েছে খাবারের প্লেট, ডিস; চেয়ারগুলো উল্টে পড়ে রয়েছে। কিন্তু পাইক্র্যাফ্ট—

ঘাবড়াবার কিছুই নেই মশাই, ঠিক আছে। দরজাটা বন্ধ করে দিন,—পাইক্র্যাফ্টের গলা শোনা গেল। এতক্ষণে আমি তাকে আবিষ্কার করলাম।

দরজার ওপরে কোণের দিকে কার্ণিসের কাছে সে রয়েছে—কে যেন ছাদের সঙ্গে এঁটে রেখেছে তাকে। উদ্বেগ ও ক্রোধ একসঙ্গে তার মুখে ফুটে উঠেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করতে করতে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিন; কারণ একবার যদি সে এ অবস্থায় দেখতে পায় আমাকে—

দরজা বন্ধ করে দূরে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। বললাম, জানেন, হঠাৎ যদি হাত ফস্কে পড়ে যান তো ঘাড়টি একেবারে ভেঙে যাবে।

হায়, সে সৌভাগ্যও কি আমার হবে! করুণ, হতাশার স্বরে পাইক্র্যাফ্ট বলল।

আপনার মত বয়সে, আপনার ওজন নিয়ে, কেউ যে এরকম শিশুসুলভ কসরৎ দেখাতে যেতে পারে—

থাক থাক, ঢের হয়েছে! তার মুখে বেদনার ছাপ ফুটে উঠল, —আপনার পাজী প্রপিতামহী—

মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি! তাকে সাবধান করে দিলাম।

দাঁড়ান, বলছি আপনাকে সব। অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে পাইক্র্যাফ্‌ট বলে উঠল।

কী অবলম্বন করে ওখানে আছেন বলুন তো?

হঠাৎ দেখলাম—কই, ও তো কিছুই অবলম্বন করে নেই! ও তো শুধু ভেসেই রয়েছে ওখানে—ও যদি গ্যাসে-ভর্তি বেলুন হত তাহলে যেমন করে ভেসে থাকত তেমনি! ছাদ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেয়াল বেয়ে নেমে আসতে চেষ্টা করল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, সেই ব্যবস্থালিপি—আপনার প্রপিতামহী—

খবর্দার! চীৎকার করে উঠলাম।

খোদাই করা কি একটা ছবির ফ্রেম কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক-ভাবে ধরেছিল, হঠাৎ সেটা খুলে যেতেই সে আবার সজোরে ছিটকে ছাদে চলে গেল, আর ছবিটা সোফার ওপরে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম, ওর শরীরের সর্বত্র সাদা সাদা দাগগুলো কিসের। অতি সন্তর্পণে, কিসের একটা তাক অবলম্বন করে আর একবার সে নেমে আসবার চেষ্টা করল।

অমন প্রকাণ্ড বপু নিয়ে নীচের দিকে মাথা করে ছাদ বেয়ে মেঝেয় নেমে আসবার চেষ্টা—সে এক অতি অপূর্ব দৃশ্য। ওই ব্যবস্থালিপি, —সে বলল, অত্যন্ত বেশী কার্যকরী হয়েছে।

কি রকম?

ওজন চলে গেছে—প্রায় সব ওজন আমার চলে গেছে।

এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারটা।

হায় ভগবান!—কিন্তু বলতে কি মিঃ পাইক্র্যাফ্‌ট, আপনি চেয়ে-ছিলেন, রোগা হতে; কিন্তু কেবলই ওজন কমাবার কথাই বলে এসেছেন!

যাই হোক, আমি অত্যন্ত খুসি হলাম, তখনকার মত পছন্দই করে ফেললাম ওকে। আসুন আপনাকে সাহায্য করি, বলে তাকে হাত ধরে নামিয়ে আনলাম। মেঝের নাগাল পাবার জন্য সে পা ছুঁড়তে লাগল। ঝড়ের দিনে ঝাণ্ডা ধরে রাখার দৃশ্য মনে পড়ে গেল।

একটা টেবল দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওই টেবলটা নিরেট মেহগেনী কাঠের, খুব ভারী। একবার যদি আমাকে ওর তলায় ঢুকিয়ে দিতে পারেন—

তাই দিলাম। বন্দী বেলুনের মত দুলতে লাগল সে। দূরে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

একটা চুরুট ধরিয়ে বললাম, বলুন খুলে, ব্যাপারটা কী।

খেলাম তো ওষুধটা।

কেমন লাগল ?

উঃ কী জঘন্য !

আমারও সেই ধারণাই ছিল। আমার প্রপিতামহীর প্রায় সব ব্যবস্থাপত্রেরই প্রতিটি অনুপান, তাদের মিশ্রণ, এমন কি তার ফলাফল পর্যন্ত,—আর যাই হোক অন্তত খুব জঘন্য যে হবেই, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না। আমার দিক দিয়ে—

—প্রথমে আমি ছোট্ট এক চুমুক খেলাম।

ও।

ঘণ্টাখানেক পরে মনে হল, যেন অনেকটা ভাল বোধ করছি, বেশ হালকা লাগছে। তখন আমি স্থির করলাম, সবটাই খেয়ে ফেলব।

আহাহা, বেচারা !

আমি নাক বন্ধ করে ছিলাম। একটু একটু করে হালকা হতে লাগলাম, আর কেমন যেন অসহায় বোধ হতে লাগল।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল পাইক্রাফ্ট—তাহলে এখন আমি কী করব ছাই ?

একটা জিনিষ বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি যা আপনার এখন কিছুতেই করা উচিত হবে না। একবার যদি ঘরের বাইরে ফাঁকায় বেরোন, তো আপনি কেবল ওপরেই উঠতে থাকবেন। বলে ওপরের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিলাম। তখন আবার আপনাকে পেড়ে আনবার জন্ত সাণ্টোজ-ডুমণ্ডকে * পাঠাতে হবে।

কিন্তু এ ভাব কেটে যাবে তো ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, সে ভরসায় থাকতে পারেন না।

দ্বিতীয়বার ক্ষেপে উঠল সে, আশেপাশের চেয়ারগুলোর ওপরে সজোরে পা ছুঁড়তে লাগল। ওর মত প্রকাণ্ড মোটা লোকের কাছে যতটা খারাপ ব্যবহার আশঙ্কা করা যায়, তার কিছুই ও বাদ দিল না। আমার সম্বন্ধে, আমার প্রপিতামহীর সম্বন্ধে, যা তা বলতে লাগল।

বললাম,—আচ্ছা, একবারও আমি আপনাকে ও ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করতে বলেছি ?

উদার হৃদয়ে ওর সমস্ত অপমানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে, ওর চেয়ারের হাতলে বসে, শান্ত হয়ে স্থির ভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, এ ঝঞ্ঝাট ও নিজেই মাথা পেতে নিয়েছে, এবং ফলে যা হয়েছে একদিক দিয়ে ঠিকই হয়েছে তা। নিশ্চয়ই ও খুব বেশী খেয়ে ফেলেছে। ও কিন্তু তা স্বীকার করতে চায় না। এই নিয়ে আবার কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে তর্ক চলল।

ক্রমে সে এত ভীষণ চীৎকার শুরু করে দিল যে বাধ্য হয়ে আমাকে ও আলোচনা থেকে বিরত হতে হল। তারপর বললাম, আর তা ছাড়াও, আপনি একটা মহা অন্যায় করেছেন। আপনার বলা উচিত ছিল, 'রোগা' হবেন,—তাহলে সত্যি বলা হত। কিন্তু অসম্মানের ভয়ে আপনি বলেছেন, 'ওজন' কমাবেন। আপনি—

---

* ব্রেজিলের সুবিখ্যাত বৈমানিক।

বাধা দিয়ে সে জানালো সে সব বুঝেছে; জিজ্ঞাসা করল, এখন তার কী করা উচিত।

বললাম, আপনার এখন নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত। এতক্ষণে আমরা সত্যিকারের কাজের কথায় এলাম। বললাম, হাতে ভর দিয়ে ছাদে হাঁটা শেখা এখন বোধহয় আর আপনার পক্ষে তেমন কঠিন হবে না—

কিন্তু ঘুমোব কি করে?

সে এমন কিছু মুস্কিলের ব্যাপার নয়। তারের সতরঞ্চী জাতীয় একটা কিছু তৈরী করিয়ে তার নীচে বিছানার মত কিছু ফিতে দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দেবেন। তারপর একটা কম্বল বা চাদর টাদর দিয়ে ধারগুলো ওর সঙ্গে বোতাম দিয়ে এঁটে দেওয়া, এ আর এমন কি অসম্ভব ব্যাপার? তবে হ্যাঁ, স্ত্রীলোকটিকে সমস্ত ব্যাপার খুলে জানাতে হবে।

একটু আপত্তির পর সে আমার কথায় রাজি হল। (স্ত্রীলোকটিকে এই সব অদ্ভুত উল্টোপাল্টা করার ব্যাপারগুলো জানাতে সে বেশ সহজ ভাবেই তা নিল—আমরাও আশ্বস্ত হলাম)।

বললাম, ইচ্ছে করলে লাইব্রেরী ঘরের সিঁড়িটাও আপনি ঘরে রেখে দিতে পারেন, আর আপনার খাবারও বইয়ের তাকের ওপরে দেওয়া যেতে পারে। ইচ্ছেমত নীচে নেমে আসবারও একটা সহজ উপায় আমি আবিষ্কার করলাম—

বৃটিশ এন্‌সাইক্লোপিডিয়াটা (দশম সংস্করণ) ওপরের তাকে রেখে দিলেই হল, গোটা দুই খণ্ড তুলে নিলেই নেমে আসতে পারবেন। আমরা ঠিক করলাম, দেয়াল বরাবর লোহার রেলিং মতন থাকবে, যাতে একটু নীচুতে কোথাও নামতে হলে কোন অসুবিধে না হয়।

ক্রমে আমি পাইক্র্যাফ্‌টের ব্যাপারে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। স্ত্রীলোকটিকে ডেকে সমস্ত খুলে বলা, বিছানা উল্টো করে

পাতা, এ সমস্তই আমাকে করতে হল। এসব নিয়ে দিন-দুই তার ফ্ল্যাটেই থাকতে হল আমাকে। স্ক্রু-ড্রাইভারের কাজে আমার হাত চলে ভাল; তার জন্য বেশ কয়েকটা ছোটখাট কাজ করে দিলাম— এই যেমন ঘন্টিটা যাতে নাগালে পায় সেজন্য সেটার সঙ্গে একটা তার জুড়ে দেওয়া, ইলেকট্রিক বাতিগুলোর মুখ উল্টে ওপরের দিকে করে দেওয়া, ইত্যাদি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেমন অদ্ভুত, তেমনি কৌতুক-কর। মস্তবড় পোকার মত পাইক্র্যাফ্‌ট ছাদে গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছে, আর দরজার ওপরের চৌকাঠ ধরে এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লাবে আসা একেবারে বন্ধ,—এ ভাবতেও ভারি আনন্দ হয়।.......

আমার সর্বনাশা উদ্ভাবনী শক্তিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে পেয়ে বসল। ওর ঘরে আগুনের ধারে বসে ওর হুইস্কি ধ্বংস করছি, ছাদে ওর প্রিয় কার্নিশের কোনে একটা টার্কিশ কম্বল বিছিয়ে ও বসেছে। হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল।

আরে আরে, পাইক্র্যাফ্‌ট! এ সবের তো কোন প্রয়োজন' নেই!

সীসার অন্তর্বাস! ভাল করে চিন্তা না করেই বলে ফেললাম,— ক্ষতি যা হবার হয়ে গেল। কথাটা শুনে পাইক্র্যাফ্‌ট প্রায় কেঁদে ফেলল, বললে, আবার কি তাহলে সব ঠিক হয়ে—

পূর্বাপর ভাল করে চিন্তা না করেই সমস্ত রহস্য ওর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিলাম—সীসার পাত কিনুন, তারপর সেটাকে চেপ্টা করে গোল গোল করে কেটে নিন, তারপর সেগুলো আপনার অন্তর্বাসের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে সেলাই করে নিন। জুতো যা পরবেন, তারও তলায় সীসার পাত লাগান, হাতে নিন নিরেট সীসার থলি। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। বন্দী জীবন ছেড়ে আবার বাইরে বেরোতে পারবেন। এমন কি, ভ্রমণে যেতে পারেন—

আরো ভাল একটা যুক্তি মাথায় এল। বললাম, জাহাজডুবির ভয়ও আর আপনার রইল না। কিছু জামাকাপড়, আর নিতান্ত

প্রয়োজনীয় মালপত্র কিছু নিয়ে বাকী সব ফেলে দিন, সোজা আকাশে ভেসে যাবেন—

উচ্ছ্বাসের মাথায় হঠাৎ তার হাত ফস্কে হাতুড়িটা পড়ে গেল। আর একটু হলেই আমার মাথায় পড়েছিল আরকি!

বলেন কি মশাই, আবার আমি ক্লাবে যেতে পারব!

সঙ্গে সঙ্গে আমার উৎসাহ নিবে এল। অস্ফুটভাবে বললাম হ্যাঁ,—তা, পারবেন বৈকি।

ও ক্লাবে আসতে পারল। নিয়মিতই আসছে আবার। আমার পেছনে বসে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে ; মাখন-মাখানো রুটি, চা,—এবার নিয়ে তিনবার হল। ওর যে ওজন বলতে প্রায় কিছুই নেই, ও যে খানিকটা বিরক্তিকর উদর-সর্বস্ব মাংসের পিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নয়, পোষাকে ঢাকা খানিকটা মেঘ শুধু, মানুষের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর,—সেই স্ত্রীলোকটি আর আমি ছাড়া ত্রিভুবনে আর কেউ তা জানেনা। বসে বসে লক্ষ্য করছে, কখন আমার লেখা শেষ হবে। সুবিধে পেলেই আমার পথরোধ করবে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপরে।...

ও কেমন বোধ করছে কেমন বোধ করছে না, মাঝে মাঝে ওর কেমন মনে আশা হয় এ ভাব যেন একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে,—বার বার এসব কথা আমাকে শোনাবে, আর থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করবে,—ব্যাপারটা গোপনে রেখেছেন তো? কেউ যদি জানতে পারে তো বড় লজ্জার কথা হবে সত্যি!

...বেশ বোকা বোকা দেখায় কিন্তু—ছাদের তলায় ওভাবে গুঁড়ি মেরে ভেসে বেড়ানো—

আমার আর দরজার মাঝখানে ঘাঁটি আগলে ও বসে রয়েছে। ওকে এড়িয়ে কী করে যাব তাই ভাবছি!

—নমিতা চক্রবর্তী

অপহৃত বীজাণু

বীজাণুতত্ত্ববিদ্ মাইক্রোস্কোপের তলায় একটা কাঁচের স্লাইড চড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই হচ্ছে বিখ্যাত কলেরার বীজাণু।

ফ্যাকাশে লোকটি মাইক্রোস্কোপের ফোকর দিয়ে তাকাল। সে এই ধরণের ব্যাপারে আদৌ অভ্যস্ত নয় বোঝা যায়। শীর্ণ শুভ্র হাত দিয়ে সে অপর চোখটা ঢাকল।

বলল, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

বীজাণুতত্ত্ববিদ্ বললেন, স্ক্রুটা একটু ঘোরাও। তোমার দেখবার মত ফোকাস বোধহয় মাইক্রোস্কোপ পাচ্ছে না। এক এক জন লোকের দৃষ্টিশক্তি অনুযায়ী ওর তফাৎ হয়। একচুল এদিক বা ওদিক ঘোরালেই ঠিক হয়ে যাবে।

ওঃ! এখন আমি দেখতে পাচ্ছি! তবে খুব বেশী এমন কিছু দেখবার নেই। পাটল রঙের কতকগুলো ছোট ছোট ফুটকি আর ডোরা। অথচ এইসব ক্ষুদে ক্ষুদে জিনিসগুলোই ক্রমাগত বহুগুণ করে বেড়ে বেড়ে একটা গোটা সহরকে ছারখার করে ফেলে! তাজ্জব ব্যাপার!

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে মাইক্রোস্কোপ থেকে স্লাইডটা ছাড়িয়ে জানলার সামনে হাতে করে ধরে শুধু চোখে দেখতে লাগল। বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে সে বলল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না! তারপর একটু ইতস্তত: করে বলল, আচ্ছা, এগুলো কি এখনো জ্যান্ত? এখনো কি এরা বিপজ্জনক?

বীজাণুতত্ত্ববিদ বললেন, এদের মেরে ফেলে শোধন করা হয়েছে। আমার ইচ্ছে করে সারা দুনিয়ায় এদের যত জাতভাই রয়েছে সবাইকে এইভাবে মেরে ফেলি।

পাণ্ডুর মানুষটি একটু হেসে বলল, আমার মনে হয়, আপনারা এই

জাতীয় বীজাণুকে জীবন্ত আর সক্রিয় অবস্থায় রাখতে পারেন না, তাই না?

বীজাণুতত্ত্ববিদ্ বললেন, ঠিক তার উল্টো। আমরা যে শুধু তা রাখি তা নয়, আমরা তা রাখতে বাধ্য। এই বলে তিনি উঠে গিয়ে একটা সীল-করা টিউব নিয়ে এসে বললেন, যেমন দেখ, এর মধ্যে জ্যান্ত কলেরা-বীজাণু রয়েছে। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, এককথায় একে বলা যায়,—বোতলে-ভর্তি কলেরা!

লোকটির মুখে মুহূর্তের জন্য একটি পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠে আবার তক্ষুনি মিলিয়ে গেল। সে যেন দুচোখ দিয়ে ছোট্ট টিউবটাকে গিলতে লাগল। মুখে শুধু বলল, এই ধরণের মারাত্মক জিনিষ আপনারা কাছে রাখেন! তার উক্তির মধ্যে উল্লাসের যে সুরটি বীজাণুতত্ত্ববিদ্ লক্ষ্য করলেন, তা ঠিক সুস্থ বলে মনে হল না।

এই লোকটি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে এসে আজ দুপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে। সেই থেকেই বীজাণুতত্ত্ববিদ্ তার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করছেন—নিজের সঙ্গে তার প্রকৃতির বৈপরীত্য অনুভব করে। ওর পাতলা কাল চুল, গাঢ় ধূসর রঙের চোখ, ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, সন্ত্রস্ত আচরণ, অস্থির অথচ তীক্ষ্ণ আগ্রহ,—সব কিছুই তাঁর অত্যন্ত নতুন মনে হচ্ছে, তিনি নিত্য যাদের সংস্পর্শে আসেন, সেই সব সাধারণ বিজ্ঞানসেবীদের একঘেয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে এ যেন একটা মুখ-বদল। শ্রোতা তাঁর বিষয়বস্তুর মারাত্মক প্রকৃতিতে গভীরভাবে অভিভূত হচ্ছে দেখে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি তার মোক্ষম দিকটি ধরলেন।

চিন্তান্বিতভাবে টিউবটাকে হাতে ধরে তিনি বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, এর মধ্যে রয়েছে বন্দী মহামারী। কোন পানীয় জল সরবরাহের জায়গায় মাত্র এইরকম একটি ছোট্ট টিউব ভেঙে ফেল, আর এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজাণু,—যাদের শোধন করতে পরীক্ষা করতে মাইক্রো-

স্কোপের উচ্চতম শক্তি দরকার হয়, যাদের কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই,—তাদের বল,—যাও, চৌবাচ্চার পর চৌবাচ্চা ভর্তি করে ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়ে চল। অমনি সহরের মধ্যে মুক্তি পাবে মৃত্যু—যে মৃত্যু রহস্যময়, যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, যে মৃত্যু বিদ্যুতের মত দ্রুতগামী, ভয়াবহ, বেদনা আর অমর্যাদায় ভরা। সে এখানে যাবে সেখানে যাবে আর শিকার খুঁজবে। কোথাও সে স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, কোথাও মা-র কোল থেকে সন্তানকে হরণ করবে, দেশনেতাকে মুক্তি দেবে কর্তব্যের থেকে, মেহনতীকে মুক্তি দেবে দুঃখকষ্ট থেকে। জলের নালী বেয়ে চলবে সে, রাস্তা দিয়ে গুঁড়ি মেরে চলবে সে, আর যে সব বাড়ীতে জল ফুটিয়ে খাওয়া হয়না, খুঁজে খুঁজে সেইসব বাড়ী বের করে তাদের মধ্যে ঢুকে শাস্তি দেবে তাদের অধিবাসীদের। সোডা-লেমনেডের কারখানার জলাধারে হানা দেবে সে, ধোয়ার সময় শাকপাতার মধ্যে ঢুকবে, আর বরফের মধ্যে থাকবে সুপ্ত হয়ে। মাটি তাকে নেবে শুষে, তার ভেতর থেকে সে আবার আবির্ভূত হবে ঝরণা আর কূপের জলের মধ্য দিয়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে সহস্র সহস্র স্থানে। ঘোড়ার জল খাবার জায়গায় সে থাকবে ওৎ পেতে, সাধারণের ব্যবহার্য ঝর্ণাগুলিতে সে প্রস্তুত থাকবে শিশুদের দেহে প্রবেশের অপেক্ষায়। একবার তাকে জল-সরবরাহের মধ্যে চালু করে দাও, তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত আবার আমরা তাকে থামাতে আর আটকাতে না পারছি, এই মহানগরীকে সে ক্রমাগত বিপর্যস্ত করতে থাকবে।

হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। অলঙ্কারপ্রীতিই তাঁর দুর্বলতা, একথা তিনি শুনেছেন।

কিন্তু এখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ, বুঝলে, সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ফ্যাকাশে লোকটি মাথা নাড়ল, চক্‌চক্ করতে লাগল তার চোখ দুটি। গলা পরিষ্কার করে সে বলল, এইসব বদ্‌মাইস বিপ্লববাদীগুলো একেবারে বোকা ; শুধু বোকা নয়, অন্ধ। এইরকম জিনিষ হাতের

কাছে থাকতে তারা বোমা ব্যবহার করে মরে কেন? আমার মনে হয়—

দরজায় একটি মৃদু আঘাত, আঙুলের লঘু স্পর্শের শব্দ শোনা গেল। বীজাণুতত্ত্ববিদ্ দরজা খুললেন। তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ফিস্ ফিস্ করে তিনি বললেন, মাত্র এক মিনিট!

বীজাণুতত্ত্ববিদ্ আবার যখন বীক্ষণাগারে ফিরে এলেন, তখন আগন্তুক ঘড়ি দেখছিল। সে বলল, আমি ধারণাই করতে পারিনি, আপনার একঘণ্টা সময় নষ্ট করে ফেলেছি। চারটে বাজতে আর বারো মিনিট আছে। অথচ আমার এখান থেকে সাড়ে তিনটের সময় যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনার এইসব জিনিষ সত্যিই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। না, আমি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারি না। চারটের সময় আমার একটা কাজ আছে।

ধন্যবাদের পুনরাবৃত্তি করতে করতে সে ঘর থেকে বেরোল। বীজাণুতত্ত্ববিদ্ সদর অবধি তার সঙ্গে গেলেন। তারপর তিনি চিন্তিত ভাবে বীক্ষণাগারের দিকে ফিরলেন। এই আগন্তুককে কোন্ জাতের মানুষের মধ্যে ফেলা যেতে পারে তাই তিনি মনে মনে ভাবছিলেন। লোকটা নিশ্চয়ই টিউটনিক নয় বা সাধারণ ল্যাটিন গোষ্ঠীরও নয়। মনে মনে বীজাণুতত্ত্ববিদ্ বললেন, একটা অসুস্থ জীব! যাই হোক, বীজাণুর টিউবের দিকে যেরকম হাঁ করে তাকিয়েছিল, আমার তো ভয় হচ্ছিল। এমন সময় একটা বিরক্তিকর চিন্তা তাঁর মনে ঘা দিল। তিনি বেঞ্চির দিকে ফিরে গিয়ে আবার অত্যন্ত তাড়াতাড়ি লেখবার টেবিলটির দিকে গেলেন। তারপর ব্যস্তভাবে পকেটের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে দরজার দিকে ছুটে গেলেন। নিজের মনে বললেন, হয়তো হলঘরের টেবলের ওপর রেখে এসেছি।

তারস্বরে চীৎকার করে তিনি ডাকলেন, মিনি!

কি? দূর থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

দৌড়োতে দৌড়োতে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নেমে গেলেন।

দরজায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে মিনি ভয় পেয়ে জানলার দিকে ছুটে গেল। রাস্তায় একটি রোগা লোক একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠছিল। বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌ টুপিহীন অবস্থায় কার্পেটের চটি পরে দৌড়ে তাকে ধরতে গেলেন। একটা চটি পা থেকে ছুটে গেল, কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মিনি বলল, পাগল হয়ে গেছেন উনি! সর্বনেশে ওঁর এই বিজ্ঞান! জানলা খুলে সে তাঁকে ডাকতে যাবে, এমন সময় রোগা লোকটি এদিকে মুখ ফেরাল। তাকে দেখেও মিনির ধারণা হল, এরও মাথা খারাপ। লোকটা তাড়াতাড়ি বীজাণুতত্ত্ববিদকে দেখিয়ে গাড়োয়ানকে কিছু বলল। গাড়ির দরজা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল, গাড়োয়ানের চাবুকের শব্দ শোনা গেল, ঘোড়ার খুরেরও আওয়াজ হল এবং মুহূর্তের মধ্যে গাড়ীটা বড় রাস্তায় পৌঁছে মোড় ফিরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌ও তার পিছনে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

জানলা দিয়ে ঝুঁকে মিনি এক মুহূর্ত সব দেখে আবার মাথা ফিরিয়ে নিল। একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। মনে মনে ভাবল, ওঁর অবশ্য মাথায় ছিট আছে, কিন্তু তাই বলে খালি একজোড়া ছোট মোজা পরে লণ্ডনের পথে বের হওয়া! একটা ভাল বুদ্ধি তার মাথায় এল। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বনেটটি পরে নিয়ে স্বামীর জুতোজোড়া বের করলে, হলের মধ্যে গিয়ে পেগ থেকে তাঁর টুপি আর হাল্কা ওভার-কোটটা পাড়ল, তারপর নিচে নেমে এল। সৌভাগ্যক্রমে একটা গাড়ি সামনে দিয়েই যাচ্ছিল, তাকে ডেকে সে বলল,—বড় রাস্তা ধরে হ্যাভেলক ক্রেসেণ্টের দিকে চল, দেখ যদি আমরা একটি ভদ্রলোকের দেখা পাই। ভদ্রলোক ছুটে চলেছেন, তাঁর গায়ে একটা ভেলভেটের কোট আছে কিন্তু মাথায় টুপি নেই।

৬

আজ্ঞে, ভেলভেটের কোট? আর মাথায় টুপী নেই? আচ্ছা আচ্ছা আজ্ঞে! বলে গাড়োয়ান অত্যন্ত সহজভাবে ঘোড়াকে চাবুক মারল, যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার একটা,—তার জীবনের প্রত্যেকটি দিনই যেন সে এই নিশানা লক্ষ্য করেই গাড়ি চালিয়ে আসছে।

হ্যাভারস্টক হিলের ঘোড়ার গাড়ির আড্ডায় গাড়োয়ান আর ছোটলোকদের ছোট্ট যে দলটি জমায়েত হয়, কয়েক মিনিট বাদে ফিরোজা রঙের ঘোড়া-জোড়া একটা গাড়িকে ভয়ানক বেগে ছুটতে দেখে সেখানকার সবাই চমকিত হয়ে উঠল।

যখন গাড়িটা পাশ দিয়ে গেল, তারা চুপ করে রইল। চলে গেলে বুড়ো টুট্‌ল্‌স্ নামে পরিচিত হৃষ্টপুষ্ট লোকটি বললে, ও তো হ্যারি হিক্‌স্! কি হয়েছে ওর?

ঘোড়ার তদারককারী ছেলেটি বলল, কসে চাবুক চালাচ্ছে ও!

টমি বাইল্‌স্ বলল, আরে! এই আর একটা বদ্ধ পাগল আসছে!

বুড়ো টুট্‌ল্‌স্ বলল, এ তো আমাদের জর্জ। তোরা যা বলেছিস্, পাগলই বটে! আমার মনে হয় ও হ্যারি হিক্‌স্‌কে ধরতেই ছুটছে।

গাড়োয়ানদের আড্ডায় এই দলটির মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। সমস্বরে চীৎকার করে তারা বলতে লাগল, চালাও জর্জ, জেতা চাই,—ঠিক ধরে ফেল্‌বে ওকে, চালাও চাবুক!

ঘোড়াদের তদারককারী ছেলেটি বলল, আরে, একটি মেয়েছেলে যাচ্ছে! একটি মেয়ে!

বুড়ো টুট্‌ল্‌স্ বলল, সত্যিই তো, আরেকটা গাড়ি আসছে আবার। হ্যামস্টেডের সব গাড়োয়ানগুলো আজ একসঙ্গে ক্ষেপে গেল নাকি?

তদারককারী ছেলেটি বলল, এবার একটা মেয়ে!

বুড়ো টুট্‌ল্‌স্ বললে, মেয়েটা ছুটছে তার মরদের পিছুপিছু। সাধারণতঃ এর উল্টোটাই ঘটে।

মেয়েছেলেটার হাতে কি রয়েছে?

দেখাচ্ছে তো একটা টুপির মত।

কী মজা! বুড়ো জর্জের ওপর বাজি ধরলাম—তিনেতে এক তদারককারী ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, চালাও!

তুমুল হৈচৈ আর হাততালির মধ্যে দিয়ে মিনি চলল। এসব তার মোটেই ভাল লাগছিল না, কিন্তু সে অনুভব করল তাকে কর্তব্য পালন করতে হচ্ছে। হ্যাভারস্টক হিল এবং ক্যামৃডেন হাই স্ট্রীট দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল। জানলা দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে মিনি দেখল গাড়োয়ানটা মহা উৎসাহে তার ছন্নছাড়া স্বামীটিকে ক্রমাগত দূরে নিয়ে চলেছে।

সর্বপ্রথম গাড়িটির ভিতরে সেই লোকটি এক কোণে জড়সড় হয়ে বসেছিল। শক্ত করে হাতদুটো মুড়ে সে মুঠোর মধ্যে ধরেছিল সেই টিউবটি, এমন একটা বিরাট ধ্বংসকাণ্ডের অঙ্কুর যার মধ্যে বিরাজ করছিল। ত্রাসে আর উল্লাসে মেশা এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগছিল তার মনে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার আগেই ধরা পড়ার আশঙ্কা মনকে জুড়ে থাকলেও তার পিছনে অস্পষ্টভাবে আর একটা প্রকাণ্ড আতঙ্ক ছিল—অপরাধের ভয়াবহত্ব উপলব্ধি করে শিউরে উঠছিল সে। কিন্তু উল্লাসের মাত্রা ছিল ভয়ের চেয়ে অনেক বেশী। তার আগে আর কোন বিপ্লবকারীর মাথায় এই পরিকল্পনা আসেনি। রাভাকল ভেলাণ্ট প্রভৃতি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ লোকদের খ্যাতিকে সে এতদিন ঈর্ষ্যা করে এসেছে, তারা তার তুলনায় একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। কেবলমাত্র জলসরবরাহ কেন্দ্রটিকে নিঃসংশয়ে খুঁজে বার করে একটা চৌবাচ্চার মধ্যে টিউবটা ভেঙে ফেলার ওয়াস্তা! পরিচয়পত্র জাল করে রসায়নাগারে ঢুকে কি সুন্দরভাবেই না সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিয়েছে! শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর কানে তার নাম পৌছবে। যে সমস্ত লোক তাকে বিদ্রূপ করেছে, অবহেলা করেছে, তার সঙ্গ অবাঞ্ছিত বোধে বর্জন করেছে, শেষে তাদেরও তাকে মানতে হবে। মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু! তারা সর্বদাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে, যেন তার

কোন গুরুত্ব নেই! সারা জগৎ তাকে দাবিয়ে রাখবার ষড়যন্ত্র করেছিল, এবার সে তাদের শেখাবে একটা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে কী ফল হয়! ভাবতে ভাবতে সে একবার বাইরের দিকে তাকাল। এই পরিচিত রাস্তাটার নাম কি? নিশ্চয়ই গ্রেট সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু স্ট্রীট। কিন্তু দৌড়-পাল্লার কি হল? গাড়ির ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখল বীজাণুতত্ত্ববিদ্ আর মাত্র পঞ্চাশ গজের মত পিছনে রয়েছেন! এতে তার খুব খারাপ লাগল। এখনো তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে টাকার খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা আধ গিনি পেল। বাইরে দিয়ে উপরে হাত বাড়িয়ে সে এই আধ গিনিটা গাড়োয়ানের সামনে তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, আরো বেশী পাবে, যদি একেবারে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারি।

তার হাত থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে গাড়োয়ান বলল, বহুৎ আচ্ছা! বলে সে গাড়ির বেগ আরো বাড়িয়ে দিল। গাড়িটা হেলে পড়ায় কামরার ভিতর, অর্ধ-দণ্ডায়মান বিপ্লববাদী দরজার উপর হাত রেখে টাল সামলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার ফলে তার হাতের কাঁচের টিউবটা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার উপরের অংশ গুঁড়ো হয়ে গাড়ির মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল। গালাগালি দিয়ে বসে পড়ল সে। দরজার গায়ে যে ফোঁটাগুলো লেগে ছিল, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। থরথর করে কেঁপে উঠল সে।

আচ্ছা, আমিই না হয় প্রথমে যাব! যাক্‌গে, সহীদই হব নাহয়। সেও মন্দের ভালো। কিন্তু এটা যেন নোংরা মৃত্যু! এতে যত যন্ত্রণার কথা লোকে বলে ততটা যন্ত্রণা হয় কিনা কে জানে!

সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। পায়ের নিচে হাতড়ে সে ভাঙা টিউবের তলার দিকটা খুঁজে বার করল। তার মধ্যে তখনো একটুখানি ছোট্ট ফোঁটা ছিল। সে সুনিশ্চিত হবার জন্য সেটুকু পান করে নিল। নিশ্চিত হওয়াই ভাল। কোন দিক দিয়েই

এখন আর তার ব্যর্থতার সম্ভাবনা রইল না। তারপর তার মনে হল, আর তো এখন বীজাণুতত্ত্ববিদের কাছ থেকে পালানোর দরকার নেই! ওয়েলিংটন স্ট্রীটে পৌঁছে সে গাড়োয়ানকে থামতে বলল, তারপর গাড়ি থামলে বেরিয়ে পড়ল। নামবার সময় তার পা টলতে লাগল আর মাথার মধ্যে সব কিছুই গোলমেলে ঠেকতে লাগল। এই কলেরার বিষ খুব দ্রুত কাজ করে। সঙ্কেতে সে গাড়োয়ানকে চলে যেতে বলে দুহাত বুকের উপর ভাঁজ করে রেখে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে বীজাণুতত্ত্ববিদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। তার ভঙ্গীতে কেমন একটা করুণ ভাব,—আসন্ন মৃত্যুর বোধ তার মধ্যে এক অপূর্ব মহিমা ফুটিয়ে তুলেছিল। অনুসরণকারী উপস্থিত হওয়া মাত্র সে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

বিপ্লবের জয় হোক! বড় দেরি করে ফেললে, বন্ধু! আমি বীজাণু খেয়ে ফেলেছি। কলেরা ছড়িয়ে পড়েছে!

বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌ নিজের গাড়ি থেকে চশমার মধ্য দিয়ে উৎসুকভাবে লোকটার দিকে তাকালেন। বল কি! তুমি খেয়ে ফেলেছ? বিপ্লববাদী! ও এখন আমি বুঝতে পারছি! তিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আত্মসংবরণ করে চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখের এককোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তিনি নামবার জন্যে গাড়ির দরজা খুললেন, কিন্তু তাই দেখে বিপ্লববাদী নাটকীয়ভাবে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। সতর্কভাবে নিজের সংক্রামিত দেহ দিয়ে যত বেশী সম্ভব লোককে ধাক্কা দিতে দিতে সে ওয়াটার্‌লু সেতুর দিকে দৌড়োতে লাগল। তার দিকে চেয়ে বীজাণুতত্ত্ববিদ্‌ এমনি তন্ময় হয়ে রইলেন যে মিনি যখন তাঁর টুপি জুতো আর ওভারকোট নিয়ে ফুটপাথের উপর দেখা দিল, তখন তিনি একটুও অবাক হলেন না। জিনিষগুলো এনে খুব ভাল করলে,—বলে তিনি বিপ্লববাদীর বিলীয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে গেলেন।

সেই ভাবেই তিনি বললেন, তোমার ভেতরে চলে যাওয়াই ভাল। মিনির এখন স্থির বিশ্বাস হল যে উনি পাগল হয়ে গেছেন। সে তার নিজের দায়িত্বে গাড়োয়ানকে বাড়ির দিকে গাড়ি ফেরাবার হুকুম দিল। গাড়ি ঘুরতে শুরু করলে বীজাণুতত্ত্ববিদ্ বললেন, ওঃ! জুতো পরতে হবে? নিশ্চয়ই! বিপ্লববাদী এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। হঠাৎ একটা কিম্ভূত ব্যাপারের কথা ভেবে বীজাণুতত্ত্ববিদ্ হেসে উঠে বললেন, অবশ্য জিনিষটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই! দেখ, যে লোকটা আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, ও হচ্ছে একজন বিপ্লববাদী। না না, অজ্ঞান হয়ো না, তাহলে আর বাকিটা তোমায় বলতে পারব না। সে যে বিপ্লববাদী একথা না জেনে আমি তাকে অবাক করতে চেয়েছিলাম। সেই নতুন জীবাণু, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম, যা অনেক জাতের বাঁদরের দেহে নীল ছোপ সৃষ্টি করে,—সেই বীজাণুর টিউব তাকে দেখিয়ে বোকার মত বলেছিলাম, এই হচ্ছে এশিয়াটিক কলেরার বীজাণু। আর অমনি ও সেইটেকে নিয়ে দৌড়োলো লণ্ডনের জল বিষিয়ে দিতে! তা যদি পারত, সে নিশ্চয়ই এই সভ্য সহরের জিনিষগুলো নীল করে তুলত। সেই বীজাণুটা এখন ও গিলে ফেলেছে। অবশ্য, আমি বলতে পারিনা কী হবে। কিন্তু তুমি জান, ওইতেই সেই বেড়ালছানাটা নীল হয়ে গিয়েছিল, তিনটে কুকুরছানার শরীরের খানিকটা খানিকটা নীল হয়ে গিয়েছিল, আর একটা চড়াইপাখি হয়েছিল ঘোর নীল। কিন্তু এখন বিড়ম্বনা হচ্ছে, আরো কিছু বীজাণু তৈরী করবার ঝঞ্ঝাট আর খরচ এখন আমাকে পোয়াতে হবে।

এই গরমের দিনে কোট পরতে হবে? কেন? মিসেস জ্যাবারের সঙ্গে দেখা হতে পারে, সেইজন্যে? সে তো আর হিমকুণ্ড নয়, তার জন্যে গরমের সময় কোট গায়ে দিতে হবে কেন? ওঃ! আচ্ছা, আচ্ছা!

—সুখময় মুখোপাধ্যায়

নতুন গতিশক্তি

পিন্ খুঁজতে খুঁজতে গিনি পাওয়ার মত বরাত হয়েছিল আমার বন্ধু প্রফেসর গিবার্ণের। গবেষণা করতে করতে কেউ কেউ যা সন্ধান করছিল তার চেয়ে বেশী পেয়েছে, এমন খবর আমি আগেও শুনেছি; কিন্তু প্রফেসর গিবার্ণের মতন অতখানি লাভ নিশ্চয়ই কারো হয়নি। বাস্তবিক, এবার সে এমন একটি জিনিষ অন্তত পেয়েছে যা মানবজীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারবে। তার এ পাওয়াটাও আশ্চর্য ধরণের। অলস লোকগুলোকে বর্তমান, কঠোর জীবনযাত্রার উপযোগী কর্মঠ করে তুলতে হবে, এই ছিল তার ইচ্ছা; সেই উদ্দেশ্যে স্নায়ুমণ্ডলীর একটা ব্যাপক উত্তেজক পদার্থ আবিষ্কার করতে গিয়ে সে এই মহামূল্য সম্পদটির সন্ধান পায়। জিনিষটির আস্বাদ কয়েকবার আমি পেয়েছি, তাতে আমার উপর কী ফল হয়েছিল সেটাই আমি খুলে বলব। নতুন উত্তেজনার খোঁজ করতে গিয়ে কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তার প্রমাণ এই কাহিনী থেকে পাওয়া যাবে।

অনেকেই জানেন, ফোক্স্টোনে প্রফেসর গিবার্ণ আমার প্রতিবেশী। আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তার বিভিন্ন বয়সের ছবি ইতিমধ্যেই স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে—সে বোধহয় ১৮৯৯ সালের শেষ দিকে। কিন্তু তা যাচাই করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সে সময়কার বাঁধানো পত্রিকাগুলো আমি যাঁকে ধার দিয়েছিলাম তিনি আর তা ফিরিয়ে দেননি। তবে, পাঠকের হয়ত মনে আছে গিবার্ণের চেহারা,— তার উন্নত ললাট, বড় বড় কালো ভ্রূ জোড়া, যাতে তার মুখে একটা ক্রূর ভাব ফুটে উঠেছিল। আপার স্যাণ্ডগেট রোডের পশ্চিম প্রান্তে একখানি মনোরম গৃহ গিবার্ণের। এ অঞ্চলের মিশ্রিত পৃথক পৃথক বাড়িগুলো সত্যই চিত্তাকর্ষক। গিবার্ণের বাড়ির সামনে মুরিশ স্টাইলের

গাড়ীবারান্দা, ছাদ ও দেয়ালের সংযোগস্থল ফ্লেমিশ, ত্রিভূজাকৃতি। দীর্ঘায়তন মুলিয়ন জাতীয় জানলা-সংযুক্ত ঘরখানিতে বসে সে কাজ করে। এই ঘরটিতে সন্ধ্যাকালে আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে কতই না আলাপ করেছি, ধূমপান করেছি। অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি সে, তা ছাড়া, তার কাজ সম্বন্ধেও আমার সঙ্গে কথা বলতে সে ভালবাসত। আলাপ আলোচনায় যারা উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে থাকে সে তাদের অন্যতম, সেইজন্য নতুন গতিশক্তির তাৎপর্য আমি প্রায় গোড়া থেকেই জানবার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্য গিবার্ণের পরীক্ষামূলক কাজের বেশীর ভাগ ফোকস্টোনে না হয়ে গাওয়ার স্ট্রীটের হাসপাতালের পাশের সুন্দর নতুন ল্যাবরেটরীতে হত। সে-ই প্রথম এই ল্যাবরেটরীতে কাজ করেছে।

প্রত্যেকই জানেন, অন্তত বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, যে বিশেষ বিভাগে কাজ করে গিবার্ণ দেহ-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে এতখানি সুনাম অর্জন করেছে, সেটা হচ্ছে স্নায়ুমণ্ডলীর ওপরে ঔষধের প্রক্রিয়া। শুনেছি, নিদ্রাজনক বেদনা-নিবারক এবং সম্মোহনকারী ওষুধগুলি সম্বন্ধে তার মত ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন দ্বিতীয় একজন নেই। রসায়নজ্ঞ হিসাবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি। গ্যাংলিয়ন নার্ভ-সেল এবং মেরুদণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশকে কেন্দ্র করে যে গভীর জটিল রহস্যের অন্ধকার ঘিরে রয়েছে, সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে, আমার মনে হয় একটু না একটু আলোর সন্ধান সে পেয়েছে। তার অভিজ্ঞতার ফলাফল সে নিজে প্রকাশ না করলে আর কোন মানুষের পক্ষে তা উদ্ঘাটন করা হয়ত অসম্ভব হত। স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজক পদার্থের প্রশ্ন নিয়ে গত কয় বছর ধরে সে বিশেষ করে মাথা ঘামাচ্ছে এবং সেদিক দিয়ে নতুন গতিশক্তি আবিষ্কারের আগে অনেকটা সফলকামও হয়েছে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের কাছে অমূল্য সম্পদ এমন অন্তত তিনটি সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ নিরাপদ উত্তেজক পদার্থ সে উদ্ভাবন করেছে; এর জন্য তার কাছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঋণী থাকা

উচিত। অবসাদ দেখা দিলে গিবার্টের বি-সিরাপ নামক ওষুধটির ব্যবহারে যত লোকের জীবন-রক্ষা হয়েছে, সমুদ্র-উপকূলে লাইফ-বোটের সাহায্যেও তত লোকের জীবন-রক্ষা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এগুলোর কোনটাতেই আমি এখনও সন্তুষ্ট হতে পারিনি,—প্রায় এক বছর আগে সে আমাকে বলেছিল,—এগুলো হয়ত দেহের কেন্দ্রশক্তি বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের ওপর এর কোন ফল হয় না, বরং এগুলোর ব্যবহারে স্নায়ুর পরিবহন-ক্ষমতা কমে গিয়ে কেন্দ্রীয় শক্তি বেড়ে যায় মনে হয়। তা ছাড়া প্রত্যেকটি ওষুধ সমান কাজ করে না, আর যা কাজ করে তাও শুধু স্থান বিশেষে। কোনটা অন্ত্র ও হৃদ্‌যন্ত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করে কিন্তু মস্তিষ্ককে প্রায় অচেতন করে রাখে; কোনটায় আবার মস্তিষ্কে মাদকতার সঞ্চার হয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর কোন উপকার হয় না। কিন্তু আমি চাই এমন একটা জিনিষ যা সারা দেহে উত্তেজনার সৃষ্টি করবে, ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায় পর্যন্ত এনে দেবে এক নতুন চেতনা—যে-কোন সাধারণ মানুষের দ্বিগুণ, এমন কি তিনগুণ শক্তির সঞ্চার করবে। সেই রকম একটা জিনিষ আমি খুঁজছি, বুঝেছ?

কিন্তু এতে যে মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে, আমি বললাম।

তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্য না হয় তোমার দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ আহারের দরকার হবে। কিন্তু একবার মনে করে দেখ দেখি সে জিনিষটার ফল কেমন দাঁড়াবে? ধর, তোমার এমনি একটা ছোট শিশি আছে,—বলতে বলতে সে একটা সবুজ কাঁচের শিশি তুলে দেখাল,—এই মহামূল্য শিশিতে রয়েছে দ্বিগুণ গতিতে চিন্তা করার শক্তি, দ্বিগুণ গতিতে চলাফেরা করার শক্তি, নির্দিষ্ট সময়ে এমনিতে যেটুকু কাজ করতে পার তার দ্বিগুণ কাজ করার শক্তি।

কিন্তু তেমন জিনিষ কি সম্ভব?

আমার ত তাই বিশ্বাস। তা যদি না হয় তবে একটা বছর সময়

আমি বৃথাই নষ্ট করেছি। সে ধরণের জিনিষ যে সম্ভব, তার নিদর্শন হাইপোফস্ফাইট থেকে প্রস্তুত এই সব ওষুধ। এতে গতিশক্তি দেড়গুণ বাড়াতে পারলেও কাজ হয়।

তা হয়ত হবে, আমি বললাম।

মনে কর, তুমি একজন রাজনীতিবিদ্, একটা সমস্যায় পড়েছ। সময় বয়ে যাচ্ছে, অথচ তোমার জরুরি একটা কিছু করা দরকার।

তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ওষুধটি খাইয়ে দিতে পার, আমি বললাম।

এবং তাতে তোমার ডবল সময় লাভ হবে। আবার মনে কর, তুমি একখানা বই লেখা শেষ করতে চাও।

এমন কাজে আমি বোধহয় হাতই দেব না! আমি বললাম।

অথবা মনে কর, অতিপরিশ্রমে ক্লান্ত একজন ডাক্তার উঠে বসে একটা রোগীর কথা চিন্তা করতে চায়, কিংবা একজন ব্যারিস্টার, বা কোন ছাত্র পরীক্ষার পাঠ মুখস্ত করছে।

এক ফোঁটা ওষুধের দাম এক গিনি হওয়া উচিত, এবং ঐ ধরণের লোকের বেলায় আরও বেশি! আমি মন্তব্য করলাম।

তারপর ধর, দ্বন্দ্বযুদ্ধে, গিবার্ণ বলল, যেখানে ক্ষিপ্রগতিতে গুলি ছোঁড়ার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

অথবা আত্মরক্ষার বেলায়, গিবার্ণের উদাহরণে আমি যোগ করলাম।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, গিবার্ণ বলল, সব দিক দিয়ে কার্যকরী এমন একটা জিনিষ যদি আমি পাই! এর থেকে তোমার কোনই ক্ষতি হবে না, শুধু অন্যের চেয়ে তোমার জীবনের গতিবেগ দ্বিগুণ হওয়ার ফলে তুমি হয়ত একটু একটু করে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে এমন জিনিষের সুযোগ নেওয়া কি সঙ্গত হবে? একটু চিন্তা আমি করে বললাম।

সে সহকারীরা বুঝবে, গিবার্ণ উত্তর দিল।

সত্যিই কি তুমি মনে কর এ-রকম কিছুর আবিষ্কার সম্ভব? আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

জানলার পাশ দিয়ে আওয়াজ করে যাচ্ছিল একটা মোটর বাস। সেটার দিকে একবার তাকিয়ে গিবার্ণ বলল, ঠিক ঐ মোটর বাসের মতই সম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি—

একটু থেমে, আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে সবুজ শিশিটা ডেস্কের গায়ে আস্তে আস্তে ঠুকে বলতে লাগল, আমার মনে হয়, জিনিষটার অস্তিত্ব আমি টের পেয়েছি...এর মধ্যে আমি কিছুটা আবিষ্কারও করেছি। তার মুখের ম্লান হাসির ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছিল তার আবিষ্কারের গুরুত্ব। কোন পরীক্ষার কাজ প্রায় শেষ হয়ে না এলে সে বিষয়ে কোন কথা সে বড় একটা জানাত না।

তবে এমনও হতে পারে, আর হলেও আশ্চর্য হব না, সে জিনিষটা হয়ত কাজ করবে,—শুধু দ্বিগুণ নয়, তার চেয়েও বেশী।

সে তাহলে এক বিরাট ব্যাপার হবে, আমি ধীরে ধীরে মন্তব্য করলাম।

হবে বৈকি। আমার মনে হয়, সেটা বিরাটই একটা কিছু হবে।

কিন্তু সেই বিরাট জিনিষটা যে ঠিক কী, তা সেও ভাল করে জানতে পেরেছিল বলে মনে হল না।

ঐ পদার্থটি সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পরে আরো কয়েকবার আলাপ হয়েছিল মনে পড়ছে। পদার্থটির নাম সে দিয়েছিল নতুন গতিশক্তি। যতবারই এর কথা সে বলত, তার কথাবার্তায় অধিকতর প্রত্যয়ের আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু পদার্থটির ব্যবহারে দেহযন্ত্রে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এমন ক্ষীণ আশঙ্কাও যখন সে কোন কোন সময় প্রকাশ করত, তখন তার মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। আবার কখনো অর্থাগমের দিক দিয়েও সে বস্তুটির বিচার করত।

ওষুধটা দিয়ে কি ভাবে ব্যবসা চালান যায়, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে সাগ্রহে আলোচনা চলত। বলত, চমৎকার জিনিষ, একটা বিরাট জিনিষ এটা। আমি জানি, আমি জগৎকে নতুন কিছু দিতে যাচ্ছি, এবং সেজন্য তার মূল্যস্বরূপ জগতের কাছ থেকে কিছু আশা করা আমার পক্ষে অসঙ্গত হবে না। 'বিজ্ঞানের মর্যাদা' কথাটা ভাল, কিন্তু আমার মনে হয়, কিছুকালের জন্য,—ধর দশ বৎসর জিনিষটার একচেটিয়া অধিকার আমার রাখা দরকার। জীবনের সবটুকু মজা কেবল ব্যবসায়ীরাই ভোগ করবে কেন?

নূতন ওষুধটি সম্বন্ধে আমার নিজের আগ্রহও যথেষ্ট ছিল। যাকে বলে অধিবিদ্যা, তার প্রতি বরাবরই আমাব একটু বিদ্ঘুটে ঝোঁক ছিল। স্থান ও কাল সম্বন্ধে বরাবরই আমার কতকগুলো অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। তাই মনে হল, গিবার্ণ সত্যসত্যই জীবনের গতিবেগ বাড়িয়ে তোলবার মত একটা ওষুধ তৈরি করছে। কোন লোককে যদি এই ওষুধের কয়েক মাত্রা খাইয়ে দেওয়া যায় তবে তার জীবনযাত্রা হবে কর্মবহুল ও স্মরণীয়; কিন্তু এগার বৎসর বয়সে তাকে দেখাবে যুবকের মত, পঁচিশ বৎসরে সে হয়ে যাবে প্রৌঢ় এবং ত্রিশ বৎসর যেতে না যেতে তার ওপর বার্ধক্যের ছাপ এসে পড়বে। ইহুদী এবং প্রাচ্যবাসীরা যেমন এক প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে বিশ বৎসরে পদার্পণ করতে না করতেই প্রৌঢ়ত্ব লাভ করে আর পঞ্চাশ বৎসরের আগেই বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে সব সময়েই ক্ষিপ্রতর,—গিবার্ণের ওষুধ সেবনের ফলেও, আমার ধারণা, ঠিক তেমনি ধারাই হবে। ওষুধের আশ্চর্যজনক শক্তি সম্বন্ধে আমার বরাবরই খুব বিশ্বাস। ওষুধ দিয়ে লোককে পাগল করে তোলা যায় শান্ত করা যায়; তাকে অসম্ভব রকম শক্তিশালী ও সজাগ অথবা অসহায় বা কুড়ে বানিয়ে দেওয়া যায়; তার চিত্তে চাঞ্চল্য ঘটান যায়, আবার তা প্রশমিত করাও যায়। এ সমস্তই ওষুধ দিয়ে সম্ভব। সুতরাং ডাক্তারদের ব্যবহৃত ওষুধের অদ্ভুত

ভাণ্ডারে আর একটি নতুন আবিষ্কার স্থান লাভ করতে যাচ্ছে, এতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু গিবার্ন তার বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি নিয়ে এত বিভোর ছিল যে আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে জিনিষটা বিচার করার ফুরসুৎ তার হয় নি।

সেদিন বোধহয় ৭ই কি ৮ই অগাস্ট। গিবার্ন আমাকে বলল তার ওষুধটির পরিস্রবণ করা হচ্ছে, এর ফলাফলের উপর আপাততঃ তার সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে। ১০ই তারিখে আমাকে জানাল, তার পরীক্ষাকার্য সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নতুন গতিশক্তি জগতে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্যাণ্ডগেট পাহাড় বেয়ে ফোক্‌স্টোনের দিকে যাবার পথে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। যতদূর স্মরণ হচ্ছে আমি তখন চুল ছাঁটতে যাচ্ছিলাম। গিবার্ন ছুটে আমার কাছে এল। সে বোধহয় তার সাফল্যের কথা তখনি আমাকে বলবার জন্তেই আমার বাড়ির দিকে আসছিল। মনে পড়ে, তার চোখে ফুটে উঠেছিল এক অস্বাভাবিক জ্যোতি, মুখখানা উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। তার চলৎশক্তিও যে বেড়ে গিয়েছিল, তাও তখনই লক্ষ্য করলাম।

সে আমার হাতখানা ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, হয়ে গেছে, আশাতীত রকম হয়েছে! এস আমার বাড়িতে, দেখবে। কথাগুলোও সে খুব তাড়াতাড়ি বলেছিল।

সত্যি?

সত্যি! সে চীৎকার করে বলল,—বিশ্বাস করা যায় না, এমনি সত্যি!, এস না, দেখে যাও।

এবং এতে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়

তার চেয়েও বেশী, অনেক বেশী। তাতেই তো আমার ভয় হচ্ছে। এস, জিনিষটা দেখে যাও। চেখে দেখ, পরখ করে দেখ। পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তু এইটি। সে আমার হাতখানা ধরে চীৎকার করতে করতে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল। এমন জোরে সে

হাঁটছিল সে আমাকে ছুটতে হচ্ছিল। আরোহী ভর্তি একটা গাড়ি যাচ্ছিল, ভেতর থেকে সকলেই আমাদের দিকে ফিরে তাদের স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। দিনটা ছিল গরম, আকাশ স্বচ্ছ; ফোক্‌স্টোনে প্রায়ই এমন দিন দেখা যায়। প্রত্যেকটা রঙ উজ্জল, প্রত্যেকটা রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। বাতাস অবশ্য বইছিল একটু, কিন্তু আমার ঘাম শুকিয়ে ঠাণ্ডা করার মত তেমন জোর তাতে ছিল না। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, একটু আস্তে চল ভাই!

আমি ত জোরে হাঁটছিনা, হাঁটছি কি? গিবার্ণ চেঁচিয়ে বলল। সেই সঙ্গে তার গতিবেগ একটু কমিয়ে দিল, অর্থাৎ দৌড় বন্ধ করে জোরে হাঁটা ধরল।

তুমি এই ওষুধ খানিকটা খেয়েছ বোধহয়, আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

না তো, সে বলল, বড় জোর এক ফোঁটা জল, যা ওষুধের পাত্রটা ধুয়ে ফেলবার পর ছিল, সেইটে কাল রাত্রে খেয়েছিলাম। কিন্তু সে ত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

ওটা থেকে দ্বিগুণ শক্তি পাওয়া যায়? দর দর করে ঘামতে ঘামতে তার বাড়ির দোরগোড়ার কাছে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দ্বিগুণ নয়, সহস্র গুণ, শত-সহস্র গুণ! গিবার্ণ নাটকীয় ভঙ্গীতে চীৎকার করে উত্তর দিল, সেই সঙ্গে তার নতুন ইংলিশ ওক কাঠের তৈরি গেটটা সজোরে খুলে ফেলল।

বল কি! বলতে বলতে আমি দরজা পর্যন্ত তার অনুসরণ করলাম।

এর শক্তি যে কতগুণ, তা আমি জানি। দরজার চাবিটা হাতে নিয়ে সে বলল।

অথচ তুমি—

এই ওষুধ স্নায়বিক দেহবিদ্যার ওপরে অজস্র আলোকসম্পাত করেছে, দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন মতবাদের সৃষ্টি করেছে।……ভগবান

জানেন, এর শক্তি কত সহস্র গুণ। সেটা আমরা পরে যাচাই করে দেখব। আপাতত কাজ হচ্ছে জিনিষটা পরখ করে দেখা।

পরখ করে দেখবে? বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

হাঁ। গিবার্ণ তার পড়বার ঘরে ঢুকে আমার দিকে ঘুরে বলল, ঐ যে, সবুজ ছোট্ট শিশির মধ্যে। তুমি ভয় পাচ্ছ না ত?

আমি স্বভাবতই সাবধানী, শুধু মুখেই দুঃসাহস দেখাই। বাস্তবিকই আমার ভয় হচ্ছিল। কিন্তু তা স্বীকার করতে আমার বাধছিল।

মানে, আমি আমতা করে বললাম, তুমি না এটা পরখ করে দেখেছ বললে?

আমি ত পরখ করেছিই, উত্তর দিল সে, কিন্তু তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কি? আমাকে রুক্ষও নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে না, বরং আমার বোধ হচ্ছে—

আমি একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললাম, দাও আমাকে ওষুধটা। যদি ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে যায়, আর কিছু না হোক আমার চুল কাটা থেকে ত রক্ষা পাব—যে কাজটা সভ্য মানুষের কর্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বলে আমার মনে হয়! মিক্সচারটা কি ভাবে খেতে হবে?

জলের সঙ্গে,—জলের পাত্রটা কাত করতে করতে গিবার্ণ বলল।

তার ডেস্কের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে সে আমাকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করতে লাগল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন হার্লে স্ট্রীটের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। চমৎকার জিনিষ এটা, বুঝলে হে? সে বলল।

আমি হাত নেড়ে ইসারা করলাম। সে বলতে লাগল, তোমাকে প্রথমেই সাবধান করে দিচ্ছি, যে মুহূর্তে ওষুধটা গলাধঃকরণ করবে তখনই চোখ বুজে ফেলবে, তার মিনিট খানেক পরে ধীরে ধীরে চোখ

খুলবে। দেখতে তুমি তখনও পাবে, কারণ দৃষ্টির অনুভূতি স্পন্দনের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে, সংঘাতের সমষ্টি সেই অনুভূতি নয়। তবে, চোখ খোলা থাকলে সেই সময়ের জন্য কতকটা অক্ষিপটে আঘাতের মত একটা বিশ্রী ঝিমঝিমে ভাব লাগতে পারে। চোখ বন্ধ করেই থেকো।

বন্ধ করে থাকব? আচ্ছা,—আমি বললাম।

তারপরে চুপ করে থাকবে, নড়াচড়া করবে না। নড়াচড়া করলে হয়ত একটা জোর আঘাত পাবে। মনে থাকে যেন তোমার গতিবেগ কয়েক সহস্রগুণ বেড়ে যাবে, যা তুমি কোনকালে কল্পনাও করতে পার নি। তোমার হৃদ্‌পিণ্ড, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, সব কিছু ঐ গতিতে চলতে আরম্ভ করবে। তোমার অজ্ঞাতেই তোমার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবে। তোমার অনুভূতি এখনকার মতই থাকবে, শুধু পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিষ আগে যে গতিতে চলছিল তার চেয়ে অনেক হাজার গুণ মন্থর গতিতে চলছে বলে তোমার মনে হবে। সেটাই ত সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার!

বল কি! তুমি কি সত্যিই মনে কর—আমি বলতে যাচ্ছিলাম।

এখনই দেখতে পাবে, বাধা দিয়ে সে বলল। তারপর দাগকাটা একটা ছোট কাচের পাত্র হাতে তুলে নিল। তারপর ডেস্কের ওপরের পদার্থটির দিকে নজর দিয়ে বললে, গ্লাস, জল, সবই এখানে রয়েছে। প্রথমবার কিন্তু বেশী খাওয়া ঠিক হবে না।

ছোট শিশির মহামূল্য জিনিষটি সে একটু একটু করে দাগ-কাটা পাত্রে ফেলল।

আমি যা তোমাকে বলেছি ভুলো না যেন, বলতে বলতে সে ঐ পাত্র থেকে জিনিষটা একটা গ্লাসে ঢালল, ইটালীর হোটেলের বয় যেভাবে হুইস্কি মেপে দেয় সেই ভাবে। বললে, চোখ শক্ত করে বন্ধ করে দু-মিনিট একেবারে নিশ্চল হয়ে বস, তারপরে আমি কি বলি শোন।

দুটি গ্লাসে ঐ মাত্রার ওষুধে সে ইঞ্চিখানেক করে জল মেশাল।

হ্যাঁ, একটা কথা, সে বলল—তোমার গ্লাসটা নামিয়ে রেখো না কিন্তু, ওটা হাতে রেখে হাতটা তোমার হাঁটুর ওপরে রাখো।...হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। এবার—

সে তার গ্লাসটা তুলে ধরল।

নতুন গতিশক্তি, আমি উঠলাম।

নতুন গতিশক্তি, বলে উঠল সে। তারপর গ্লাসে গ্লাসে একবার ছুঁইয়ে আমরা তরল পদার্থটি পান করলাম এবং সেই মুহূর্তে আমি চোখ বন্ধ করলাম।

শরীরে গ্যাস ঢুকলে যেমন এক অচেতন অবস্থার সৃষ্টি হয়, চারিদিকে সব ফাঁকা হয়ে যায়, আমার অবস্থাও কিছুক্ষণের জন্য হল তেমনি। তারপর গিবার্নের গলার আওয়াজ পেলাম, আমাকে জেগে উঠতে বলছে। গা ঝাড়া দিয়ে আমি চোখ খুললাম, দেখলাম গিবার্ণ আগের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে, গ্লাসটা তখনও তার হাতে, তবে সেটা এখন শূন্য, এই যা তফাৎ।

কেমন লাগছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কিছু অস্বাভাবিক ঠেকছে না ত?

কিছু না। একটু যেন ফূর্তির ভাব শুধু, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

বললাম, সব যে নিস্তব্ধ, তাইত, কোন কিছুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না যে! শুধু জিনিষপত্রের ওপর টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ার মত একটা মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। ওটা কি বল তো?

শব্দ বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তাই,—এরকম একটা কি যেন বলল। তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বললে, জানলায় ওরকম ভাবে পর্দা আটকানো আগে কখনো দেখেছ কি?

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, পর্দার প্রান্তটা বাতাসে পত্ পত্ করে উড়তে উড়তে একটা কোণ উঁচু করে যেন হঠাৎ জমে গিয়েছে।

না, এ কি করে হয়? আমি বললাম।

এই দেখ, বলতে বলতে সে যে হাতে গ্লাসটা ধরেছিল সেটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠলাম, গ্লাসটা পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে ভেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, পড়ে গুঁড়ো হওয়া ত দূরের কথা গ্লাসটা একটু নড়লও না পর্যন্ত, শূন্যে স্থির হয়ে ঝুলতে লাগল। গিবার্ণ বলল, সাধারণত এই অক্ষাংশে কোন জিনিষ সেকেণ্ডে ১৬ ফুট করে পড়ে যায়। গ্লাসটাও এখন এক সেকেণ্ডে ১৬ ফুট গতিতে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ, এক সেকেণ্ডের শতাংশের মধ্যেও গ্লাসটা একটুও পড়ছে না। এই থেকেই তুমি আমার আবিষ্কৃত গতিশক্তির বেগ সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে। সে তার হাতখানি আস্তে আস্তে নেমে যাওয়া গ্লাসটির উপরে, নীচে চারিদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল। অবশেষে গ্লাসটির তলাতে ধরে টেনে নীচে নামিয়ে সেটাকে সযত্নে টেবিলের উপর রাখল। দেখলে,—আমার দিকে তাকিয়ে হেসে সে বলল।

হ্যাঁ এবারে ঠিক বুঝতে পেরেছি, বলে অতি সাবধানে আমার চেয়ার থেকে উঠলাম। বেশ সুস্থই বোধ করছিলাম, শরীরটাও খুব হালকা লাগছিল, মনে ভরসাও পাচ্ছিলাম যথেষ্ট। তবে, সবদিক দিয়েই আমার গতিবেগ যেন বেড়ে গিয়েছিল—এই যেমন, আমার হৃদ্‌পিণ্ডে প্রতি সেকেণ্ডে সহস্র স্পন্দন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তাতেও আমার একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, রাস্তায় একটা ছুটন্ত গাড়িকে ধরবার জন্যে একজন লোক আপ্রাণ সাইকেল চালিয়ে চলেছে, কিন্তু মনে হল সাইকেল-আরোহীর চাকার পেছনের ধূলরাশি যেন শূন্যে জমে রয়েছে, ছুটন্ত গাড়িটাও নড়ছে না যেন। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। গিবার্ণ, আমি চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম, কতক্ষণ এই অদ্ভুত ওষুধের প্রভাব চলতে থাকবে?

ভগবান জানেন! গতবার ওটা খেয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি ওষুধের ক্রিয়া আর নেই। বলতে কি, আমার ভয় হয়ে গিয়েছিল। ওষুধটার ক্রিয়া কয়েকমিনিট নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল, বেশ কয়েক ঘণ্টা। ওর ক্রিয়া কিছুক্ষণ পরে কমে যায় এবং হঠাৎ কমে যায় বলেই মনে হয়।

ভয় পাচ্ছিলাম না দেখে আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করছিলাম। ভয় না পাওয়ার কারণ বোধ হয়, আমরা দুজন ছিলাম বলে। আমাদের বাইরে যেতে আপত্তি আছে কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

আপত্তি কিসের?

লোকে যদি আমাদের দেখে ফেলে?

লোকে দেখতে পাবে না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কী করে দেখবে বল? ম্যাজিকের খেলায় চক্ষের পলকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যে হাত-সাফাই দেখান সম্ভব, তার চেয়েও সহস্রগুণ বেশী তাড়াতাড়ি আমরা চলতে থাকব যে! চল যাই; কোন্‌ দিক দিয়ে যাবে বল, জানলা দিয়ে, না দরজা দিয়ে?

জানলা দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

যত রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ঘটেছে অথবা আমি কল্পনা করেছি, কিংবা বইয়ে পড়েছি অন্য লোকের ঘটেছে বা অন্য লোকে কল্পনা করেছে,—সে সবের মধ্যে, এই নতুন গতিশক্তির প্রভাবে ফোক্‌স্টোনের প্রান্তরে গিবার্নের সঙ্গে আমার ছোট্ট অভিযানটি নিশ্চয়ই সবথেকে বিস্ময়জনক, সবথেকে অদ্ভুত! গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়লাম, সেখানে আমরা খুঁটি-নাটি করে লক্ষ্য করতে লাগলাম চলন্ত যানবাহনগুলির নিশ্চল ছবি। ঐ যে যাত্রীবাহী ঘোড়ার গাড়িটা দেখা যাচ্ছে তার চাকাগুলোর উপরের দিকটা, ঘোড়াগুলোর পা, সহিসের চাবুকের আগাটা, হাই তুলতে যাওয়া কণ্ডাক্টরের নীচের চোয়ালখানি,—বেশ দেখা গেল এগুলি একটু একটু করে নড়ছে;

কিন্তু ঐ বিরাটকায় গাড়ির আর সব কিছুই যেন স্থির হয়ে রয়েছে। মানুষের গলার ঘড়ঘড়ানির মত সামান্য আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এই জমাট-বাঁধা যানবাহনের মধ্যে ছিল একজন কণ্ডাক্টর আর এগার জন আরোহী। গাড়িটার কাছ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তাদের দেখে প্রথমে অত্যন্ত বিসদৃশ, পরে অদ্ভুত, বিশ্রী মনে হয়। যারা গাড়িতে বসে ছিল আমাদের মতই মানুষ তারা, কিন্তু তবুও যেন ঠিক আমাদের মত নয়; এলোমেলো পোষাক পরে তারা যেন জমে রয়েছে, হাত পা নাড়তে নাড়তে এক সময় যেন থেমে গেছে। একটা মেয়ে আর একটা পুরুষ পরস্পরের দিকে চেয়ে একটু হাসল, কিন্তু তাদের সেই মুচকি হাসি যেন চিরকালের জন্য তাদের মুখে লেগেই থাকবে মনে হল। একজন স্ত্রীলোক গাড়ির রেলিং-এর ওপর তার বাহু রেখে গিবার্ণের বাড়ির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। মনে হল, অনন্ত কাল ধরে তার চোখের পলক পড়বে না। একটা লোক তার গোঁফে চাড়া দিচ্ছিল, মনে হল যেন সে একটা মোমের তাল পাকাচ্ছে। আবার আর একজন যেন অতি কষ্টে তার ক্লান্ত শক্ত হাতের আঙুলগুলো তার ঢিলে টুপিটার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা তাদের সকলের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তাদের অদ্ভুত অবস্থা দেখে হাসাহাসি করলাম, তাদের ভেংচি কাটতেও ছাড়লাম না। তাদের দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে আমরা তখন সেখান থেকে ফিরে সাইকেল-আরোহীর সামনে দিয়ে ঘুরে ঐ খোলা মাঠের দিকে অগ্রসর হলাম।

দেখ দেখ, ওই যে! গিবার্ণ হঠাৎ চীৎকার করে বলল।

সে আঙুল দিয়ে কি একটা দেখাতে তার আঙুলের ডগার দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা মৌমাছি শূন্যে ঝুলছে; আর তার ডানাগুলো শামুকের মত অতি ধীরে ধীরে নড়ছে।

এইভাবে আমরা প্রান্তরে এসে হাজির হলাম। সেখানকার ব্যাপার আরও বিস্ময়কর। ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে ব্যাণ্ড বাজছিল, কিন্তু তার তুমুল

ঝঙ্কারের আওয়াজ আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল যেন একটা চাপা সুরের মৃদু কলতান, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের মত একটা স্থায়ী দীর্ঘশ্বাসের রেশ। মাঝে মাঝে সে রেশটুকু বড় হয়ে যেন প্রকাণ্ড একটা ঘড়ির চাপা মন্থর টিক্ টিক্ শব্দের মত শোনাচ্ছিল। মাঠের লোকগুলো পাথরের মত নিথর হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। অদ্ভুত, নির্বাক আত্মসচেতন লোকগুলো ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যেন এক সময় থেমে পড়েছে, পা ফেলতে ফেলতে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে মনে হয়, টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় দেখি, একটা সুন্দর লোমওয়ালা কুকুর লাফিয়ে উঠে শূন্যে ঝুলছে। মাটিতে পড়বার সময় তার পায়ের অত্যন্ত মন্থর গতি লক্ষ্য করলাম। এমন সময় গিবার্ণ চেঁচিয়ে উঠল, দেখ, দেখ, মজা দেখ। মুহূর্তের জন্য সুবেশধারী এক ব্যক্তির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার পরণে পাতলা ডোরা কাটা সাদা ফ্ল্যানেলের গরম পোষাক, পায়ে সাদা জুতো, মাথায় টুপি। ভদ্রলোকটি দুজন সুসজ্জিত মহিলার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তাঁদের দিকে কটাক্ষ হানবার উদ্দেশ্যে ঘাড় ফিরিয়ে আছেন। তাঁর সেই কটাক্ষপাত আমরা এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম যে তাতে কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না। সেই চাউনিতে চটুল পুলকের ছাপ নেই; কটাক্ষ হানতে গিয়ে চোখ ভাল করে বোজেই নি যেন;—চোখের পাতা ঝুলে আছে, তার নীচে দেখা যাচ্ছে চোখের মণির নীচের দিকটা। বলে উঠলাম, যতদিন এর এই অবস্থা মনে থাকবে ততদিন আমি আর চোখ টিপব না।

ভদ্রলোকের কটাক্ষের উত্তরে একজন মহিলা দন্তবিকাশ করেছিলেন, তাঁর দিকে চেয়ে গিবার্ণ বললে, শুধু চোখ টেপা কেন, আর হাসবেও না।

কেমন যেন অত্যন্ত গরম লাগছে—আমি বললাম, চল, আর একটু আস্তে আস্তে যাই।

আরে, চলে এস, গিবার্ণ বলল।

পথে বিশ্রামের চেয়ারে বসে যারা রৌদ্র উপভোগ করছিল আমরা তাদের মাঝখান দিয়ে যেতে শুরু করলাম। চেয়ারে অনেকেই চুপচাপ যেন স্বাভাবিক ভাবেই বসে আছে মনে হল, কেবল অদূরে বাদ্যকরদের দোমড়ানো লাল জামা মোটেই দেখতে ভাল লাগছিল না। লাল মুখওয়ালা এক ভদ্রলোক এই বাতাসে তাঁর সংবাদপত্র মোড়বার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে স্থির হয়ে থেমে রয়েছেন। এইসব অলস লোকগুলোর ওপর দিয়ে যে জোরে হাওয়া বইছিল, তার অনেক প্রমাণ পেলাম, কিন্তু আমাদের অনুভূতিতে সে হাওয়ার কোন অস্তিত্ব ছিল না। সেখান থেকে সরে এসে একটু দূরে থেকে আমরা জনতাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম। এক অদ্ভুত, আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের সামনে ভেসে উঠল, সবগুলো লোক যেন নিথর হয়ে একটা ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে আছে—বাস্তব পুতুল যেন। এও কি সম্ভব? কিন্তু মনে মনে এই ভেবে আমার একটা বিজাতীয় আনন্দ এই হল যে, অন্যের ওপর বাহাদুরি করার সুযোগ পেয়েছি। এই আশ্চর্য সুযোগের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন দেখি! ঐ ওষুধটি আমার শিরা-উপশিরার ওপরে কাজ শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি যা কথাবার্তা বলেছি, যা কিছু চিন্তা করেছি, যে-সব কাজ করেছি—মাঠের লোকগুলোর সম্বন্ধেই হোক আর বাইরের জগৎ সম্বন্ধেই হোক্—সমস্তই চোখের এক পলকের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নতুন গতিশক্তি,—আমি বলতে আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু গিবার্ণ আমাকে বাধা দিলে—

ওঃ জঘন্য বুড়িটা! সে বলল।

কোন্ বুড়ি?

আমার পাশের বাড়িতেই থাকে, গিবার্ণ বলল, ওর একটা ছোট কুকুর আছে, দিনরাত চেঁচায়। নাঃ, এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যায় না!

মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে গিবার্ণ বড় ছেলেমানুষি করে। তাকে

বুঝিয়ে বলবার আগেই ছুটে এগিয়ে গেল, বেচারার কুকুরটাকে এত জোরে ছিনিয়ে নিল যে তার অস্তিত্বই কেউ টের পেল না। তারপর কুকুরটাকে নিয়ে মাঠের সীমানায় পাহাড়টার দিকে সবেগে দৌড়তে আরম্ভ করল। সে এক অলৌকিক দৃশ্য। ছোট্ট কুকুরটা এতটুকু চীৎকার করল না, একটুও গা নাড়া দিল না, তার জীবনীশক্তির সামান্ত চিহ্নও দেখা গেল না, ঘুমোবার মত নিঝুমভাবে প্রায় অসাড় হয়ে রইল। গিবার্ণ এমনভাবে তার ঘাড় ধরে ছিল, সে যেন একটা কাঠের কুকুর নিয়ে ছুটছে। গিবার্ণ, আমি চীৎকার করে বললাম, ওটাকে ছেড়ে দাও। তারপর আমি অন্য কথা পেড়ে বললাম, তুমি যদি ওভাবে দৌড়তে থাক তাহলে তোমার জামাকাপড়ে আগুন লেগে যাবে। এরই মধ্যে তোমার সুতির প্যাণ্ট গরমে বাদামী হয়ে গেছে।

পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে সে একটু ইতস্তত করতে লাগল। আমি তার কাছে এসে বললাম, গিবার্ণ, ওটাকে ছেড়ে দাও। এই তাপ অসহ্য! আমাদের অমনি দৌড়োবার ফলেই এ অবস্থা হয়েছে—সেকেণ্ডে দু-তিন মাইল! বাতাসের প্রবল ঘর্ষণ!

কি বললে? সে কুকুরটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বাতাসের ঘর্ষণ, আমি চীৎকার করে বললাম,—আমরা ভয়ঙ্কর বেগে যাচ্ছি, উল্কার মত বেগে! উঃ, ভীষণ গরম! গিবার্ণ গিবার্ণ, আমার সারা গায়ে যেন জ্বালা ধরেছে, ঘেমে উঠছি।...লোকেরা সব একটু একটু করে নড়াচড়া করছে, দেখতে পাচ্ছ? আমার বিশ্বাস, ওষুধটার ক্রিয়া শেষ হয়ে আসছে, না?—ঐ কুকুরটাকে ছেড়ে দাও।

কি বলছ? কুকুরটার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, ওষুধের প্রভাব ফুরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের শরীর প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠেছে, এবং সেজন্যই, ওষুধটার ক্রিয়া শেষ হয়ে আসছে! ঘামে ভিজে যাচ্ছি আমি।

সে প্রথমে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর ব্যাণ্ডের

দিকে। ব্যাঙের ঝঙ্কার আগের চেয়ে দ্রুত বেজে উঠেছে, স্পষ্টই বোঝা গেল। তখন গিবার্ণ তার হাতটা অনেকখানি প্রসারিত করে সজোরে কুকুরটাকে ছুঁড়ে দিল। কুকুরটা ডিগবাজী খেতে খেতে অচেতন অবস্থায় শূন্যপথে কিছুদূর চলবার পরে একদল আড্ডাধারী লোকের শ্রেণীবদ্ধ ছাতার ওপরে এসে শূন্যে ঝুলে রইল। গিবার্ণ আমার কনুইটা ধরে বলে উঠল, সত্যি, তুমি যা বলেছ তাই! আমারও সারা গায়ে জ্বালা বোধ হচ্ছে। হ্যাঁ, ঐ যে ঐ লোকটা তার পকেট থেকে রুমাল বার করছে, বেশ বুঝতে পাচ্ছি। চল, আমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়ি।

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমরা সরে পড়তে পারলাম না। সেটা হয়ত আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, কারণ, আমরা ছুটতে পারতাম বটে, কিন্তু ছুটলে, আমার বিশ্বাস, আমাদের পোষাকে আগুন ধরে যেত, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই! আমরা কেউ এতক্ষণ এটা ভেবে দেখিনি···কিন্তু আমরা ছুটতে আরম্ভ করার আগেই ওষুধের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে এমন হয়ে গেল! যবনিকাপতনের মতই নতুন গতিশক্তির প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। গিবার্ণের নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত স্বর শুনতে পেলাম—বসে পড়! মাঠের ধারে ঘাসের ওপর ধপাস্ করে আমি বসে পড়লাম, তখনো প্রচণ্ড তাপে আমার শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে। যেখানে আমি বসে পড়েছিলাম, কতগুলো দূর্বাঘাস তখনও সেখানে পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে ছিল। আমার বসার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ঘুমন্ত সব কিছু যেন জেগে উঠেছিল। ব্যাণ্ডের বিকৃত স্পন্দন ছাপিয়ে যেন সহসা এক মুখর যন্ত্রসঙ্গীত বেজে উঠল, ভ্রাম্যমান পুরুষ নারী মাটিতে পা ফেলে নিজ নিজ পথে হাঁটতে শুরু করল, কাগজপত্র আর নিশানগুলো পত পত করে বাতাসে উড়তে লাগল, মুচকি হাসির পরে কথাবার্তা আরম্ভ হল, কটাক্ষ হানার কাজ সেরে ভদ্রলোকটি সানন্দে পথে চলতে লাগলেন, আর যারা বসেছিল তারা নড়াচড়া করতে লাগল, কথাবার্তা শুরু করল।

সমস্ত পৃথিবী আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের মতই দ্রুত চলতে আরম্ভ করেছে—বরং আমরাই আর অবশিষ্ট জগতের থেকে অধিকতর দ্রুত চলছি না বললেই ঠিক হবে। স্টেশনের কাছে এসে যেমন রেলগাড়ির গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে যায়, আমাদের অবস্থাও হল সেই রকম। প্রত্যেকটি জিনিষ যেন দুই এক সেকেণ্ডের জন্য ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে হল। অতি অল্পক্ষণের জন্য আমার একটু শুক্কার ভাব দেখা দিল, ব্যস্‌, ঐ পর্যন্ত। যে কুকুরটাকে গিবার্ণ ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল, মুহূর্তের জন্য আকাশে ঝুলে থেকে এখন সেটা ক্ষিপ্রগতিতে একজন মহিলার ছাতার মাঝখানটা ফুঁড়ে ধপাস্‌ করে পড়ে গেল।

ফলে আমরা বেঁচে গেলাম। চেয়ারে বসা এক স্থূলকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের দেখতে পেয়েই চমকে উঠলেন, পরে গভীর সন্দেহের চোখে বার বার আমাদের দিকে নজর দিতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর নার্সকে আমাদের সম্বন্ধে যেন কি বললেন, বোধ হল। কিন্তু এই ভদ্রলোকটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোক আমাদের আকস্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করেছিল কিনা সন্দেহ। আমরা নিশ্চয়ই তাদের মাঝখানে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলাম। সেই সঙ্গে আমাদের আগুনে-পোড়ার অনুভূতিটাও কেটে গেল, তবে আমার পায়ের নিচের ঘাস তখনও বেশ গরম লাগছিল। যেখানে ব্যাণ্ড বাজছিল তার পূর্বদিকে সুন্দর নাদুস নুদুস যে ছোট কুকুরটা আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল সেটা যে হঠাৎ পশ্চিমদিকে একজন মহিলার ছাতার ওপরে গিয়ে ধপাস্‌ করে পড়েছে, বাতাসের ভেতর দিয়ে তার প্রচণ্ড গতিবেগের জন্য তার শরীরটাও একটু পুড়ে যাবার মত হয়েছে,—এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, এমন কি তা বাজকরদেরও দৃষ্টি এড়ায় নি,—যার ফলে তাদের জীবনে এই প্রথম বাজনার সুর বেতাল হয়ে গেল। ঐ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে চারদিকে ভীষণ চেঁচামেচি, হৈ চৈ শুরু হল।

লোকগুলো ঐ দৃশ্য দেখে চেয়ার ফেলে উঠে দাঁড়াল, ছুটতে গিয়ে একজন আর একজনের ঘাড়ে পড়ল, ময়দানের পুলিশটাও ছুট দিল। গোলমাল যে কি ভাবে থামল বলতে পারব না, কারণ সেখান থেকে সরে পড়ার জন্যই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বেশী। চেয়ারের বুড়ো ভদ্রলোকটি পাছে আমাদের সম্বন্ধে আরও খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করেন সেই ভয়ে তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে সরে পড়াই সঙ্গত মনে করলাম। আমাদের শরীর যখন অনেকটা ঠাণ্ডা হল, ম্যাজম্যাজে ও বমির ভাব কেটে গেল, মনের বিহ্বলতাও দূর হয়ে গেল,—তখন আমরা আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়লাম, সহরের নীচের রাস্তাটা ধরে গিবার্ণের বাড়ির দিকে ফি:র চললাম। কিন্তু সেই হট্টগোলের মধ্যেও আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, যে মহিলাটির ছাতার উপরে কুকুরটা পড়ায় ছাতাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল তার পাশের ভদ্রলোকটি ইন্‌স্পেক্টর-নামাঙ্কিত টুপিধারী কর্মচারীদের একজনকে অসঙ্গত ভাষায় ধমক দিয়ে বলছে—তুমি যদি কুকুরটা না ছুঁড়ে থাক, তবে ছুঁড়েছে কে, জিজ্ঞাসা করি ?

এই সমস্ত ব্যাপার হয়ত আমি খুঁটিনাটি করে পর্যবেক্ষণ করতে চাইতাম, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি কারণ সকলের চলৎশক্তি যেন হঠাৎ ফিরে এসেছে, পরিচিত শব্দগুলো আবার কানে আসছে। তারপর আমাদের নিজেদের জন্য আমাদের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার দরুণও বটে। আমাদের জামাকাপড় তখনও ভয়ানক গরম, এমন কি গিবার্ণের সাদা পায়জামার সামনের দিকটা যেন আগুনের তাতে বিদ্‌ঘুটে বাদামী রং ধরেছে। আগের অবস্থা ফিরে আসা সম্বন্ধে বাস্তবিক পক্ষে আমি এমন কিছু পরীক্ষা করিনি বিজ্ঞানক্ষেত্রে যার কোন মূল্য আছে। মৌমাছিটা অবশ্য উধাও হয়েছিল। সাইকেল-আরোহীর খোঁজ করলাম, কিন্তু আমরা যখন আপার স্যাণ্ডগেট রোডে এসে পড়লাম তার আগেই সে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেছে, অথবা যানবাহনগুলির

পেছনে ঢাকা পড়েছে। জীবন্ত যাত্রীসমেত সেই গাড়িটা এতক্ষণে ক্ষিপ্রগতিতে ঘড়্ ঘড়্ করতে করতে অদূরবর্তী গির্জাটার সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে।

তবে আমাদের নজরে এল, গিবার্ণের বাড়ির যে জানলা গলে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম তার চৌকাঠটা আগুনের তাতে সামান্য একটু পোড়ার মত হয়ে গিয়েছে, আর পথের কাঁকরের ওপরে আমাদের পায়ের দাগ অস্বাভাবিক রকমের গভীর।

এই আমার নতুন গতিশক্তির প্রথম অভিজ্ঞতা। ধরতে গেলে, আমাদের ছোটাছুটি, কথাবার্তা, সবরকম কীর্তি,—এক-আধ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। ব্যাণ্ডের বাজনায় ছুটি ঝংকার তুলতে যে সময় লেগেছিল, তারই মধ্যে হয়ত আমরা আধঘণ্টার জীবন উপভোগ করেছিলাম। তার ফল হয়েছিল এই, আমাদের কাছে সারা পৃথিবী যেন থেমে গিয়েছিল, আমরা যাতে ভাল করে লক্ষ্য করতে পারি। সব দিক দিয়ে ভাবলে, বিশেষ করে হঠাৎ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়বার মত দুঃসাহসের কথা মনে করলে বলতে হয়, আমাদের যা অভিজ্ঞতা ঘটেছিল তার চেয়েও অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ঘটতে পারত। এর থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল, ওষুধটা ঠিকমত কাজে লাগাবার উপযোগী করবার আগে গিবার্ণের আরও অনেক কিছু শেখবার আছে। তবে, জিনিষটার কার্যকরিতা যে প্রমাণিত হয়েছিল, তাতে একটুও ভুল নেই।

আমাদের ঐ অভিযানের পর থেকে গিবার্ণ ওষুধটার ব্যবহার ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, তার নির্দেশ অনুযায়ী আমি কয়েকবার ঠিকমত মাত্রায় সেটা খেয়ে দেখেছি, তাতে একটুও খারাপ ফল হয়নি। তবে আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে, ওষুধের ক্রিয়া থাকতে থাকতে এখন পর্যন্ত আর বাইরে যাবার সাহস করি নি। ওষুধ মাঝে মাঝে

ব্যবহারের উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, এর সাহায্যেই এই গল্পটি একবার বসে একটুও না থেমে লেখা হয়েছে, তবে এর মধ্যে দুচারটে চকোলেট যে না চিবিয়েছি তা নয়। গল্প লেখা আরম্ভ করি দুটো পঁচিশ মিনিটে, আর আমার ঘড়িতে এখন আড়াইটে বেজে এক মিনিটের কাছাকাছি। কর্মবহুল দিনের মধ্যে দীর্ঘকাল অবাধে একটানা এতটা কাজ করার সুযোগ পাওয়া বড় কম কথা নয়। গিবার্ণ এখন তার আবিষ্কৃত ওষুধের পরিমাণমূলক গবেষণা করছে, বিভিন্ন গঠনের শরীরের ওপরে জিনিষটার কিরকম পৃথক ফল পাওয়া যায় তা বিশেষ করে পরীক্ষা করে দেখছে। এর পর সে গতিক্ষয়ী একটা ওষুধ বার করার আশা রাখে, যা মিলিয়ে বর্তমান ওষুধটার অত্যধিক শক্তির লাঘব করা যেতে পারে। গতিশক্তির ওপর গতিক্ষয়ীর ফল অবশ্য হবে বিপরীত; শুধু গতিক্ষয়ী ব্যবহারে কোন রোগী সাধারণ সময়ের অনেকগুলো ঘণ্টাকে কয়েক সেকেণ্ডে পরিণত করতে পারবে, যার ফলে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ অথবা বিরক্তিকর পরিবেশের মধ্যেও সে বজায় রাখতে পারবে এক উদাসীন নিষ্ক্রিয়তা, তুষারস্তূপের মত শীতলতা। দুটো জিনিষ একত্র করে সভাজগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করা যাবে নিশ্চয়ই। কার্লাইল যে সময়ের বাঁধনের কথা বলেছেন, তার থেকে এইভাবে পাব আমাদের মুক্তির পথ। যখন আমাদের সবচেয়ে বেশী অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার দরকার, সেই মুহূর্তে সর্বান্তঃকরণে মনোনিবেশ করবার ক্ষমতা আমাদের এনে দেবে এই গতিশক্তি; আর গতিক্ষয়ীর সাহায্যে আমরা অসীম দুর্দশা ও ক্লান্তিও কাটিয়ে উঠতে পারব নিশ্চেষ্ট প্রশান্তভাবে। গতিক্ষয়ী সম্বন্ধে আমি হয়ত একটু বেশী আশা করছি, কেননা জিনিষটা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি; তবে গতিশক্তি সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। সুবিধামত ব্যবহার করা যায়, আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় এবং পরিপাক করা যায়, এমনি

আকারে জিনিষটা আর কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ত বাজারে দেখা দেবে। ছোট ছোট সবুজ শিশিতে এটা সব কেমিস্ট ও ডাক্তারের দোকানে পাওয়া যাবে,—দামটা একটু বেশী বটে, তবে ওষুধটার অসাধারণ গুণের কথা বিচার করলে দামটা নিশ্চয়ই খুব বেশী নয়। এর নাম দেওয়া হবে, গিবার্ণের স্নায়বিক গতিশক্তি। তিন রকম শক্তিতে সে ওষুধটা দিতে পারবে আশা করে, দু-শো ভাগে এক ভাগ, ন-শো ভাগে এক ভাগ, আর দু-হাজার ভাগে এক ভাগ। তিনটি শক্তির পৃথক রঙের লেবেল থাকবে, যথাক্রমে, হল্দে, কালচে আর সাদা।

এ ওষুধটির ব্যবহারে যে অসাধারণ অনেক কিছু সম্ভব হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এমন কি, এর সাহায্যে সময়ের শক্ত বাঁধনের সূক্ষ্মতম অবকাশেও, ফৌজদারী মামলার মীমাংসা করা যেতে পারে। অবশ্য সব শক্তিশালী ওষুধের মত এরও যে অপব্যবহার হতে পারে, একথা বলা বাহুল্য। তবে আমাদের সমস্যার এই দিকটা বিশদভাবে আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এটা সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসা-আইনের বিষয় এবং আমাদের এলাকার একেবারে বাইরে। আমরা গতিশক্তি তৈরী করে বিক্রী করব, তার ফল কী হবে সে পরের কথা।

শ্রীমিনতি দেবী

অলৌকিক

ক্ষমতাটা ওর জন্মগত ছিল কিনা সন্দেহ। আমার তো ধারণা, নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই ও এ ক্ষমতা লাভ করে। সত্যি বলতে কি, ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ও ছিল সন্দেহবাদী, মানুষের যে অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে, এ ও বিশ্বাস করত না। এই সুযোগে ওর চেহারার একটা বর্ণনা দেওয়া যাক। লোকটি বেঁটেখাট, চোখের রঙ গাঢ় বাদামী, মাথায় খুব খাড়া খাড়া লাল রঙের চুল, পাকানো গোঁফ, আর গায়ে হলদে রঙের হাল্‌কা ছিটে। লোকটির নাম জর্জ ম্যাকহোয়ার্থার ফদারিঙ্‌গে,—নামটার মধ্যেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যেজন্যে ওর কাছ থেকে অলৌকিক কোন ক্ষমতা আশা করা যেতে পারে। লোকটি ছিল গমশট কোম্পানির কেরানী। ওর এক অত্যন্ত বিশ্রী অভ্যাস হল তর্কের সময় বিশেষ জোরের সঙ্গে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা। অলৌকিক ঘটনার সম্ভাব্যতার বিপক্ষে ও যখন তীব্র মন্তব্য করছিল ঠিক এহেন সময়েই ও প্রথম নিজের মধ্যে এই অসাধারণ ক্ষমতার আভাস পায়। তর্কটি হচ্ছিল 'লং ড্রাগন' হোটেলে বসে, আর ওর প্রতিপক্ষ ছিল টডি বীমিশ। টডি কেবল একঘেয়ে ভাবে থেকে থেকে বলে উঠছিল,—মানে, তুমি তাই বলতে চাও। এই কৌশলটি এত কার্যকরী হয়ে ওঠে যে শেষপর্যন্ত ফদারিঙ্‌গে তার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছয়।

এরা দুজন ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিল এক ধুলো-মাখা সাইকেল-আরোহী, হোটেলওয়ালা কক্স, আর হোটেলের রীতিমত সম্ভ্রান্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতির কর্মচারী মিস মেব্রিজ। ফদারিঙ্‌গের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে মিস মেব্রিজ গেলাস ধুচ্ছিল, আর বাকি দুজন তার শোচনীয় অবস্থা দেখে কৌতুক উপভোগ করছিল। বীমিশের এই কৌশলে

ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ফদারিঙ্গে শেষপর্যন্ত ঠিক করল, এক অলঙ্কারবহুল বক্তৃতায় সে বীমিশকে পরাস্ত করবে। বলল,—আচ্ছা বীমিশ, শোন। প্রথমেই বিচার করে দেখা যাক, 'অলৌকিক' কাকে বলে। অলৌকিক ঘটনা হল, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা,—এমন কিছু ঘটানো, এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া যা সাধারণভাবে কখনো ঘটে না।

ও, তুমি তাই বলতে চাও,—এই বলে বীমিশ ওকে কোনঠাসা করল।

ফদারিঙ্গে তখন সাইকেল-আরোহীর মত জিজ্ঞাসা করল। এতক্ষণ সে বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু শুনে যাচ্ছিল, এবার একটু ইতস্তত: করে, একটু হেসে, চোরা দৃষ্টিতে বীমিশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে ফদারিঙ্গের কথায় সায় দিল। হোটেলওয়ালা কিন্তু কোনো মন্তব্য প্রকাশ করল না। তখন ফদারিঙ্গে বীমিশের দিকে তাকাতে বীমিশ তার কথা মোটামুটিভাবে মেনে নিয়ে একটু বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

ফলে ফদারিঙ্গে অনেকটা উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল,—যেমন ধর, ঐ বাতিটা। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ঐ বাতিটার মুখ নিচু করে ধরলে ওটা অমনভাবে জ্বলবে না, কী বল বীমিশ? যদি জ্বলে তবে সে এক অলৌকিক ব্যাপার হবে।

ও, তুমি তাই বলতে চাও—বীমিশ বলল।

আর তুমি? নিশ্চয় তুমি একথা বলতে চাও না যে—এঁ্যা?

না,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও বীমিশ স্বীকার করল,—না, তা জ্বলবে না।

আচ্ছা বেশ। এমন সময় যদি একজন এসে বলে,—এই ধর, এই আমি যদি এসে আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তির একত্র প্রয়োগ করে বাতিটাকে বলি,—উল্টে যাও, কিন্তু ভেঙে যেয়ো না,—আর বাতিটাও অমনি উল্টে গিয়ে এমনি স্থিরভাবেই জ্বলতে থাকে,—আরে আরে, এ কি!

ব্যাপারটা সত্যি এমন বিস্ময়কর যে অমন অবাক হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

যা সম্পূর্ণ অসম্ভব, পরম অবিশ্বাস্য, তাই ওদের চোখের সামনে ঘটে গেল। বাতিটা উল্টে গিয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল, আর তার শিখাটা নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে স্থিরভাবে জ্বলে চলল। বাতিটার ওপর যে কোনরকম কারসাজি ছিল এমন সন্দেহও প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কারণ বাতিটা হল নিউ ড্রাগন হোটেলের খুব সাধারণ একটা বাতি।

তর্জনী প্রসারিত করে, ভ্রূ কুঁচকে, আসন্ন বিপর্যয়ের প্রতীক্ষায় ফদারিঙ্‌গে দাঁড়িয়ে রইল। সাইকেল-আরোহী বাতিটার কাছে বসে ছিল, একলাফে সেখান থেকে সরে এল। মিস মেব্রিজ মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। প্রায় তিন সেকেণ্ড বাতিটা ঠিক ঐ ভাবে স্থির হয়ে রইল। একটা অস্ফুট আর্ত শব্দ করে উঠল ফদারিঙ্‌গে, মনে হল, যেন অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা তার হচ্ছে। বলল, আর আমি রাখতে পারছি না। এই বলে পিছু হঠে আসতেই বাতিটা ঐ অবস্থায় হঠাৎ একবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠেই বার-এর ওপর পড়ে সেখান থেকে ছিটকে সজোরে মেঝেয় পড়ে নিবে গেল। ভাগ্যে বাতিটার তৈলাধারটি ধাতু দিয়ে গড়া ছিল, নতুবা ভেঙে গিয়ে সমস্ত ঘরটাতেই আগুন ধরে যেত। কক্সই কথা বলল প্রথমে,—অবান্তর উচ্ছ্বাস বাদ দিলে তার বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, ফদারিঙ্‌গে একটি গর্দভ। এমন একটা মন্তব্যে পর্যন্ত আপত্তি করবার মত অবস্থা তখন ফদারিঙ্‌গের ছিল না,—যে ব্যাপারটা ঘটে গেল তাতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছে। এর পর ওদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হল তাতে ফদারিঙ্‌গের এই ব্যাপারের ওপর কিছুমাত্র আলোকপাত হল না,—শুধু যে কক্স-এর সমর্থনেই সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠল তাই নয়, ওদের কথাবার্তায় অত্যন্ত রূঢ়তা প্রকাশ পেল—ওদের ধারণা; ফদারিঙ্‌গে ওদের ওপর এক নোংরা চালাকি খেলেছে, অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি করেছে। ফদারিঙ্‌গের নিজের মনেও একটা এলোমেলো

ঝড় বয়ে চলেছে। ওদের সমস্ত অপবাদ সে যেন মেনে নিতেই প্রস্তুত। যে প্রতিবাদ সে তুলেছিল সেই ক্ষীণ প্রতিবাদ মোটেই কার্যকরী হয়নি।

অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে বাড়ি ফিরল,—মুখ টকটকে লাল, কোটের কলার কুঁকড়ে গেছে, চোখ জ্বালা করছে, কান লাল হয়ে উঠেছে। বাড়ি যেতে দশটা বাতি তার পথে পড়ে, ভয় ভয় চোখে সে সেগুলোকে লক্ষ্য করল। চার্চ রো-তে বাড়ি, বাড়ি ফিরে সে গিয়ে ঢুকল ছোট্ট শোবার ঘরটিতে। একলা বসে এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত চিন্তা করবার মত অবস্থা তার হল। প্রশ্ন করল নিজেকে,—কী করে কী হল?

কোট খুলে, জুতো ছেড়ে ফদারিঙ্‌গে বিছানার উপর বসল। পকেটে হাত রেখে একবার নয় দু-বার নয়,—এই নিয়ে সতেরো বার সে তার নিজের সমর্থনে যুক্তি তুলল,—আমি তো চাই নি যে বাতিটা ওভাবে উল্টে যাক! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই আবার তার মনে হল, ঐ হুকুম যখন সে করেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে সে এই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল, যেন সে যা বলছে সত্যিই তাই ঘটে। তারপর বাতিটাকে সত্যিসত্যিই ঐ অবস্থায় ঝুলতে দেখে তার যেন মনে হয়েছিল, বাতি-টাকে ওভাবে রাখা আর না রাখা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন,—যদিও কী করে যে ও বাতিটাকে ওভাবে রাখবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা তার ছিল না। জটিল মনস্তত্ত্বের বিশেষ ধার ফদারিঙ্‌গে ধারত না, তা যদি না হত, তাহলে হয়ত অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপারটা তখনকার মত সে মেনে নিতে পারত। কিন্তু তবুও তার সহজ সরল মনে এই ধারণাই এখন কতকটা অস্পষ্টভাবে হলেও অনেকটা সহজগ্রাহ্য হয়ে দেখা দিল। আর এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই এবং বিশেষ যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সে পরীক্ষায় রত হল।

মোমবাতিটার দিকে লক্ষ্য স্থির করে সে মনঃসংযোগ করল। কিন্তু কেবলই তার মনে হতে লাগল সে খুব বোকার মত কাজ করছে। ওপরে ওঠো—বাতিটাকে হুকুম করল সে, কিন্তু সে মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য,—

তারপরেই তার সে মনোভাব কেটে গেল। মোমবাতিটা ওপরে উঠে এক সেকেণ্ডের জন্য স্থির হয়ে রইল, তারপর অবাক ফদারিঙ্গের চোখের সামনে সশব্দে তার প্রসাধন-টেবলের ওপরে পড়েই নিবে গেল,—পলতের ক্ষীণ আভা ছাড়া সমস্ত ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল।

স্তব্ধ ফদারিঙ্গে সেই অন্ধকারে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিজের মনে বলল,—ব্যাপারটা তো ঘটল ঠিকই! কিন্তু কী করে এ সম্ভব হল! দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সে দেশলায়ের জন্য পকেট হাতড়াতে লাগল, কিন্তু পকেটে দেশলাই পেল না। উঠে আন্দাজ করে টেবলটা হাতড়াল। মনে হল, একটা দেশলাই থাকলে বেশ হত। তখন তার হঠাৎ মনে হল, অলৌকিক ঘটনা তো দেশলায়ের বেলাতেও ঘটতে পারে! অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সে বলল, এই হাতে একটা দেশলাই আসুক। অমনি কি একটা হাল্কা বস্তু লম্বালম্বি ভাবে তার হাতে এসে পড়ল। আঙুলগুলো গুটোতেই সে বুঝল, এ একটা দেশলাই। দেশলাইটা জ্বালাবার কয়েকটা ব্যর্থ চেষ্টার পর ও আবিষ্কার করল, এ একটা সেফ্‌টি দেশলাই। দেশলাইটা ফেলে দিল সে। পরক্ষণেই তার মনে হল, বাতিটাকে জ্বলতে বলতেই তো হয়! সেই ইচ্ছে প্রকাশ করতে না করতেই বাতিটা টেবলক্লথের ওপরে জ্বলে উঠল। তাড়াতাড়ি তুলে নিতেই নিবে গেল বাতিটা। এই ক্ষমতার সম্ভাবনা ক্রমেই ওর কাছে প্রসারিত হয়ে উঠছে। বাতিটাকে আন্দাজ করে বাতিদানে বসিয়ে দিয়ে বলল,—এই, জ্বলে ওঠ। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা জ্বলে উঠল আর সেই আলোয় ফদারিঙ্গে দেখল টেবলের-ক্লথের ওপর একটা কালো ছিদ্র মত হয়েছে, তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে তা থেকে। এই ধোঁয়া থেকে মোমবাতির শিখায় আর মোমবাতির শিখা থেকে এই ধোঁয়ায় কয়েকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার পর আয়নায় প্রতিফলিত তার নিজের দৃষ্টির ওপর তার চোখ পড়ল। এইভাবে কিছুক্ষণ তার নিজের সঙ্গে নীরব কথোপকথন চলল।

প্রতিবিম্বকে সম্বোধন করে ফদারিঙ্গে বলল, এইবার অলৌকিক ঘটনা শুরু করলে কেমন হয়?

ফদারিঙ্গের এর পরবর্তী চিন্তাধারা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটু অগোছাল ধরণের। এ যাবৎ সে দেখেছে, যেমনটি সে ইচ্ছে করেছে ঠিক তেমনিই ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে। প্রথম দিককার কয়েকটা পরীক্ষার ফলাফল দেখে সে ঠিক করেছে, বিশেষ সাবধান না হয়ে আর সে পরীক্ষা-কাজে রত হবে না। প্রথমে সে এক শীট কাগজ উঁচু করে ধরল, তারপর এক গ্লাস জল নিয়ে তার রঙ প্রথমে সোনালী, পরে সবুজ করল। তারপর সে একটা শামুক তৈরি করে সেটাকে অলৌকিক উপায়ে দূর করে দিল, একটা টুথব্রাশও অলৌকিক উপায়ে সংগ্রহ করল।

এই অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ধারণা তার ছিল, গভীর রাতের দিকে সে ধারণা আর অস্পষ্ট রইল না, সে স্থির বুঝল যে এ তার এক অনন্যসাধারণ বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। আবিষ্কারের প্রথম দিকটায় যে আশঙ্কা আর দ্বিধা তার মনে আশ্রয় করেছিল তার জায়গায় এখন সে এই ক্ষমতার জন্যে গর্ব অনুভব করছে। এর সুবিধের একটা আভাসও তার মনে অস্পষ্টভাবে ভেসে উঠল। চার্চের ঘড়িতে একটা বেজে উঠতেই সে তাড়াতাড়ি পোষাক ছাড়তে লাগল,—এবার শুয়ে পড়তে হবে। একথা তার একবারও মনে হল না যে এই অলৌকিক উপায়ে সে খুব সহজেই গমশট কোম্পানির অফিসের দৈনন্দিন কাজ থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। শার্টটা মাথার ওপর দিয়ে খুলতে খুলতে এক চমৎকার মতলব তার মাথায় খেলে গেল। বলল,—আমি বিছানায় যেতে চাই। বলতে না বলতেই ও বিছানায় গিয়ে হাজির। তারপর বলল,—জামা-কাপড়গুলো খুলে যাক। সঙ্গে সঙ্গে তাই হল। ঠাণ্ডা লাগছে দেখে ও তখন বলল, আমার রাতের শার্টটা,—না না, একটা সুন্দর, বেশ নরম পশমের শার্ট আমার গায়ে আসুক। ব্যাপারটায় তার খুব মজা লাগল, হর্ষসূচক একটা শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর বললে,—এবার বেশ আরাম করে ঘুমোন যাক।

যথাসময়ে ঘুম ভাঙল। সারাটা সকাল চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাটাল সে।

গতকালের ঘটনাগুলো এক সুসম্বদ্ধ স্বপ্নমাত্র নয় তো? শেষ পর্যন্ত সে খুব সাবধানে তার শক্তির পরীক্ষা শুরু করল,—এই যেমন, প্রাতরাশে তিনটে ডিম খেল—দুটো তার গৃহকর্ত্রী দিয়েছিল, কেমন যেন ভিজে ভিজে আর ডিম দুটো, বাকীটা একটা হাঁসের ডিম, তারই ইচ্ছায় ডিমটা পাড়া হল, এমনকি পরিবেশিত পর্যন্ত হল। প্রবল উত্তেজনা সন্তর্পণে গোপন রেখে সে তাড়াতাড়ি গমশট কোম্পানির অফিসে গেল। রাত্রে যখন গৃহকর্ত্রী তিনটে ডিমের খোসার কথা উল্লেখ করল তখন খেয়াল হল তার। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে সারাদিন সে কোনো কাজে মন বসাতে পারেনি, যদিও অবশ্য তাতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি, কারণ শেষ দশ মিনিটের মধ্যেই সে অলৌকিকভাবে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করে।

বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের এই বিস্ময়ভাব ক্রমে দূর হয়ে গেল, আনন্দে অধীর হল সে। 'লং ড্রাগন' থেকে বিতাড়িত হবার ব্যাপারটা অবশ্য তখনো তার অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হচ্ছিল, তার ওপর আবার ঘটনাটা পল্লবিত হয়ে বন্ধু মহলে প্রচারিত হওয়ায় একটু সম্ভ্রমের হানিও হয়েছিল তার। ফদারিঙ্গে বুঝল, ভঙ্গুর বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার বটে, কিন্তু তাহলেও অন্য সব ব্যাপারেই এই ক্ষমতার অসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত সম্বন্ধে ক্রমেই সে সচেতন হয়ে উঠল। ঠিক করল তার সম্পত্তি সে অলৌকিক উপায়ে অনেকটা বাড়িয়ে ফেলবে,—এবং এমনভাবে বাড়াবে যাতে কেউ তাতে সন্দেহ প্রকাশ করতে না পারে। জামার হাতার জন্যে এক জোড়া চমৎকার হীরের বোতাম সে জোগাড় করল, কিন্তু ঠিক এমন সময়ে অফিসের একজন কর্তা-ব্যক্তিকে তার দিকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি সেটটোকে নষ্ট করে ফেলল। ওর ভয় হল কর্তা হয়ত ভাববে, হীরের বোতাম জোগাড় করবার ক্ষমতা তার কোথা থেকে হল। বেশ বুঝল, অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ খুব সতর্কভাবে করতে হবে। এ অসুবিধে জয় করা অবশ্য খুব কঠিন ব্যাপার কিছু নয়,—সাইকেল চড়া আয়ত্ত

করতে যেটুকু অসুবিধে ভোগ করতে হয় এও বড় জোর সেই রকম কিছু। এই ধারণা, আর 'লং ড্রাগন' যে তাকে বিশেষ স্বাগত সম্ভাষণ জানাবে না এই দুই কারণেই হয়ত সে নৈশ ভোজনের পর গ্যাস কোম্পানীর পেছনের গলিতে নিরিবিলি বসে অলৌকিক শক্তির মহড়ায় তৎপর হল।

ফদারিঙ্গেন এই সমস্ত পরীক্ষার মূলে হয়ত মৌলিকত্বের অভাব ছিল। কারণ অলৌকিক শক্তির কথা বাদ দিলে বিশেষ অসাধারণত্ব কিছুই তার মধ্যে ছিল না। মোজেস এর লাঠির অলৌকিক কাহিনী তার মনে পড়ল, কিন্তু বড় বড় সাপ নিয়ে খেলার পক্ষে এই অন্ধকার রাত্রি বিশেষ সুবিধে-জনক বোধ হল না। তখন তার Tannhauser-এর গল্প মনে পড়ল, -কোথায় যেন গল্পটা পড়েছিল সে। ব্যাপারটা তার বিশেষ উপযোগী এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে হল। ফুটপাথের নিচের ঘাসের ওপর হাতের লাঠিটা ঠুকে হুকুম করল,—এই শুকনো কাঠটাতে ফুল ফটে উঠুক। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের সুগন্ধে বাতাস আমোদিত হল। দেশলাই জ্বেলে দেখল, তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এ তৃপ্তি তার বেশিক্ষণ রইল না. কারণ এমন সময় এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ তার কানে এল। পাছে তার এই ক্ষমতার কথা অসময়ে জানাজানি হয় এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ফুল-ফোটা লাঠিটাকে হুকুম করল, - চলে যাও। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল,—আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাও, কিন্তু তাড়াতাড়িতে আর তা বলা হয়ে উঠল না। সবেগে পেছু হঠতে লাগল লাঠিটা, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেল এগিয়ে-আসা লোকটার ক্রুদ্ধ চীৎকার আর গালাগাল, কে হে উজবুক এভাবে লাঠি ছুঁড়ছ? চোট লাগে জান না?

সত্যি আমি দুঃখিত,—ফদারিঙ্গে বলে উঠল, কিন্তু কথাটা বলেই সে বুঝল, এ জবাবদিহি তার বিশেষ যুৎসই হয়নি। ঘাবড়ে গেল, গোফে হাত বুলোতে লাগল। দেখল, ইমারিং-এর পুলিশ উইঞ্চ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

এর মানেটা কী শুনি? —উইঞ্চ বলে উঠল,—আরে এই যে! আপনি তো সেই 'লং-ড্রাগন'-এর বাতি ভেঙেছিলেন, না?

ফদারিঙগে বলল,—মানে আবার কি, মানে কিছুই নেই।

তবে?

আরে সামান্য ব্যাপার, ছেড়ে দাও।

বটে, সামান্য ব্যাপার? জানেন না বুঝি যে লাঠি ছুঁড়লে লাগতে পারে? বলুন, কেন এ কাজ করেছেন।

মুহূর্তকাল সে ঠিক করতে পারল না কী বলবে। কিন্তু ওকে নীরব দেখে উইঞ্চ বিরক্ত হল, বললে, দেখুন, আপনি পুলিশের গায়ে হাত তুলেছেন। অপরাধের গুরুত্বটা বুঝেছেন এবার?

নিজের ওপরে বিরক্ত হয়ে উঠল ফদারিঙগে, ঘাবড়ে গিয়ে বলল, উইঞ্চ, সত্যি আমি দুঃখিত। ব্যাপারটা হল

কী?

সত্যি কথা বলা ছাড়া অন্য উপায় ফদারিঙগে দেখল না, বললে, আমি একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলাম। এমনভাবে কথাটা বলবার চেষ্টা করল যেন খুব সাধারণ ব্যাপার একটা, কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে উঠল না।

কী ঘটাচ্ছিলেন? দেখুন, ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। ওঃ, অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলাম! এমন অদ্ভুত কথাও কেউ কখনো শুনেছে? আর আপনিই না মশাই অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করেন না! ও আমি ঠিক বুঝেছি,- ম্যাজিক, ম্যাজিক ছাড়া আর কিছু নয়। দেখুন, আপনাকে বলে রাখছি

কিন্তু উইঞ্চএর বক্তব্য আর তার শোনা হল না। খেয়াল হল, তার রহস্য সে একেবারে ফাঁস করে দিয়েছে। অসহ্য বিরক্তিতে তার সর্বশরীর জ্বলে উঠল, চট করে পুলিসটার দিকে ফিরে কর্কশভাবে বলে উঠল,—দেখ,

অনেক সহ্য করেছি তোমায়। কি বললে, ম্যাজিক? বেশ, ম্যাজিকই তোমাকে দেখাব। নরকে যাওগে,—যাও, এখুনি যাও।

ফদারিঙ্‌গে একা!

সেরাত্রে ফদারিঙ্‌গে আর নতুন কোনো অলৌকিক কাণ্ড করেনি, তার ফুল-ফোটা লাঠিটার কী দশা হল তাও তার জানতে কৌতূহল হয় নি। শহরে ফিরে, ভীত, অত্যন্ত শান্ত মনে শোবার ঘরে গেল। নিজের মনেই বলল,- ওঃ, অদ্ভুত, অদ্ভুত এই ক্ষমতা! সত্যিই আমি চাইনি অতটা বাড়াবাড়ি কিছু হোক, একবারও চাই নি।·······নরক কেমন জায়গা কে জানে!

বিছানায় বসে বুট খুলতে খুলতে একটা মতলব তার মাথায় খেলে গেল, পুলিশটাকে সে নরক থেকে চালান দিল স্যানফ্রানসিস্‌কোয়। এর পর আর কোনো অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে না গিয়ে ফদারিঙ্‌গে শুয়ে পড়ল চুপচাপ। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে ক্রুদ্ধ উইঞ্চের স্বপ্ন দেখল।

দুটো মজার খবর পরদিন তার কানে এল। লালাঝেরো রোডে মিঃ গমশটের বাড়ির গায়ে কে নাকি একটা অতি সুন্দর গোলাপ গাছ লাগিয়েছে। আর অপর খবরটা হল, উইঞ্চের সন্ধানে রলিন্‌স মিল পর্যন্ত সমস্ত নদীতে জাল ফেলার কথা হয়েছে। সমস্ত দিনটা সে চিন্তায় ডুবে থেকে আনমনা কাটাল, অলৌকিক কাণ্ডও বিশেষ কিছু করল না, —যা করল সে কেবল উইঞ্চকে কিছু খাবার-দাবার পাঠিয়ে দেওয়া, মানসিক অস্থিরতা সত্ত্বেও অফিসের কাজ যথাসময়ে সুচারুভাবে সম্পন্ন করা।* তার এই অন্যমনস্ক ভাব আর শান্ত-শিষ্ট ব্যবহার অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এ নিয়ে অনেকের অনেক ঠাট্টাই তাকে সইতে হয়েছে।

রবিবার বিকেলে গীর্জায় গেল সে। দৈবে বিশ্বাসী মিঃ মে-ডিগ যথা রীতি তাঁর প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য, সেদিনে তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল,—কোন্ কোন্ কাজ ঠিক আইনসঙ্গত নয়। ফদারিঙ্‌গে নিয়মিত গীর্জায় যেত না, কিন্তু এই প্রচারকার্যে তার মন্তব্য প্রকাশের

স্বভাব অত্যন্ত আহত হল। তার অলৌকিক ক্ষমতার ওপরে এই প্রচার কার্য এক সম্পূর্ণ নতুন আলোকসম্পাত করল,—সে হঠাৎ ঠিক করে ফেলল, এবিষয়ে মিঃ মে-ডিগের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখবে। আশ্চর্য, এ বুদ্ধি এতক্ষণ তার মাথায় আসেনি কেন।

মিঃ মে-ডিগ লোকটি রোগা ধরণের, লম্বা লম্বা হাতের কব্জি, খুব লম্বা গলা। একটুতেই ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ধর্মকর্মের ব্যাপারে ফদারিঙ্গেের অবহেলার কথা কারো অজানা ছিল না এবং এ নিয়ে শহরে সাধারণভাবে আলোচনা চলত। এ হেন যুবকের কাছ থেকে নিভৃত-আলোচনার অনুরোধ পেয়ে মে-ডিগ কৃতার্থ হলেন। দুকয়েকটা প্রয়োজনীয় কাজের পর তিনি ফদারিঙ্গেকে গীর্জার পাঠাগারে নিয়ে গিয়ে বেশ আরাম করে বসালেন আর নিজে আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে তার বক্তব্য জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর দুপায়ের ছায়া দূরের দেয়ালে পড়ে রোড্সের বিখ্যাত মূর্তির মত দেখাল।

ফদারিঙ্গে একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল প্রথমটা, তাই একটু ইতস্ততঃ করবার পর কথা শুরু করল··· আমার মনে হয় মিঃ মে-ডিগ, ব্যাপারটা হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না,- এই রকম কিছুক্ষণ ভূমিকা করবার পর সে একটা প্রশ্ন করে দেখল। জিজ্ঞাসা করল, অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে কী তাঁর ধারণা।

খুব ভারিক্কি চালে, বিচারকের রায় দেবার ভঙ্গিতে মে-ডিগ শুরু করলেন,- দেখ কিন্তু ফদারিঙ্গে তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, আপনি হয়ত বিশ্বাসই করবেন না মিঃ মে-ডিগ যে একজন খুব সাধারণ মানুষ—এই যেমন ধরুন আমারই মত একজন লোক হঠাৎ এমন এক ক্ষমতার অধিকারী হল যার বলে সে ইচ্ছেমত যা খুসি তাই করতে পারে।

হ্যা, তা হতে পারে বৈকি, এ ধরণের একটা কিছু হতেও পারে সম্ভব।

ফদারিঙ্গে বলল, এখানকার কোনো বস্তুতে যদি আমাকে হাত দিতে অনুমতি দেন তো আমার পক্ষে এর প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

এই যেমন ধরুন, টেবেলের ওপরের ঐ গড়গড়াটা। বলুন, ওটার ওপর আমার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেব? বেশীক্ষণ নয়, মাত্র আধ মিনিটই যথেষ্ট।

ভ্রূ কুঁচকে, গড়গড়াটার দিকে তাকিয়ে ফদারিঙ্গে বলল, এক টব ভায়োলেট ফুল হয়ে যাও।

গড়গড়াটা হুকুম তামিল করল।

এই দেখে অত্যন্ত চমকে উঠলেন মিঃ মে-ডিগ, কোনো কথা না বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শুধু। তারপর সাহসে ভর করে টেবলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুলের ঘ্রাণ নিলেন। ফুলগুলো খুব টাটকা, ভারি চমৎকার। তারপর ফদারিঙ্গের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ তুমি কী করে করলে?

গোঁফ নিয়ে খেলা করতে করতে ফদারিঙ্গে বলল, দেখলেন তো, বললাম, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ। এ কী, অলৌকিক, না ম্যাজিক, না অন্য কিছু? এ আমার কী হয়েছে বলুন তো?

এ এক অতি অসাধারণ ব্যাপার, বললেন মিঃ মে-ডিগ।

অথচ মাত্র এক সপ্তাহ আগেও আমার এ সম্বন্ধে কোনো ধারণা পর্যন্ত ছিল না। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই আমি এ ক্ষমতা লাভ করেছি। যা বুঝছি, আমার ইচ্ছাশক্তির ওপর একটা কিছু ঘটেছে।

শুধু কি ঐ একটা অলৌকিক ব্যাপারই তুমি করতে পার না আরো কিছু?

একটা! বলেন কি, যা খুসি তাই আমি করতে পারি। এই বলে কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। একটা ম্যাজিক সে দেখেছিল, সেটার কথা মনে পড়তে বলল, এই যেমন দেখুন না,—এই, মাছের জার হয়ে যা,—না না, জলভর্তি একটা কাঁচের জার হয়ে যা, সেই জলে সোনালী মাছ সাঁতরে বেড়াক। হ্যাঁ, বেশ। দেখছেন তো মিঃ মে-ডিগ?

আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ব্যাপার! হয় তুমি এক অত্যন্ত অসাধারণ—

এটাকে আমি যে-কোনো জিনিষে বদলে ফেলতে পারি, সেরেফ যে-কোনো জিনিষে। এই যেমন, · · এই, পায়রা হ।

মুহূর্ত পরেই দেখা গেল একটা নীল পায়রা ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। যতবার পায়রাটা মে-ডিগের কাছে আসছে ততবার তিনি সভয়ে মাথা নিচু করছেন। ফদারিঙ্গে বলল, এই, ওখানে থেমে যাক্। কথাটা উচ্চারিত হতে না হতেই পায়রাটা নিশ্চল হয়ে শূন্যে ঝুলে রইল। তারপর বলল, পায়রাটাকে আবার আমি ফুলের টব করে ফেলতে পারি। বলে পায়রাটাকে টেবলের ওপরে রেখে তার কথামত কাজ করল। তারপর বলল, আপনার বোধ হয় ধূমপানের প্রয়োজন হচ্ছে। বলে সে আবার সেটাকে গড়গড়ায় ফিরিয়ে আনল।

শেষের দিকের এই দ্রুত পরিবর্তনগুলো নীরবে লক্ষ্য করতে করতে মে-ডিগ প্রতিবারই বিস্ময়সূচক শব্দ করছিলেন। এবার একটু বিরস মুখে তিনি ফদরিঙ্গের দিকে তাকালেন, তারপর গড়গড়াটা হাতে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে আবার নামিয়ে রাখলেন। তাঁর মনের ভাব মাত্র একটা কথায় পরিস্ফুট হল,— 'হুম্' !

এবার হয়ত আমার বক্তব্য আপনাকে বোঝানো সহজ হবে। এই বলে ফদারিঙ্গে 'লং ড্রাগন' হোটেলের বাতির ব্যাপার থেকে শুরু করে তার সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আর তার ফলে যে অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সমস্ত বিস্তারিতভাবে তাঁকে শোনাল। বিবৃতি প্রসঙ্গে উইক্স-এর নাম এতবার সে উচ্চারণ করেছে যে ব্যাপারটা জটিল হয়েই দাঁড়িয়েছে মে-ডিগের পক্ষে।

এই সব অলৌকিক ব্যাপারে মে-ডিগ বিস্ময় প্রকাশ করায় যে ক্ষণিক গর্বে তার মন ভরে উঠেছিল, কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কখন তা দূর হয়ে গেল, ফদারিঙ্গে আবার সেই দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ মানুষে পরিণত হল। গড়গড়াটা হাতে নিয়ে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে মে-ডিগ তার কাহিনী শুনে চললেন, ক্রমেই তাঁর মুখের ভাবে পরিবর্তন দেখা দিল।

ফদারিঙ্গে যখন তৃতীয় ডিমের ব্যাপারটা উল্লেখ করল, তাকে বাধা দিয়ে মে-ডিগ বললেন, হাঁা, এ অবশ্য সম্ভব, শুধু সম্ভব কেন, বিশ্বাসযোগ্যও বটে। ব্যাপারটা যতই অদ্ভুত হোক না কেন, তবুও অনেকগুলো সমস্যার সমাধান এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। অলৌকিক কিছু ঘটানোর এক বিশেষ ক্ষমতা, প্রতিভার মত কিংবা······অন্তর্দৃষ্টির মত এক বিশেষ গুণ এ, যার পরিচয় ক্বচিৎ কখনো পাওয়া যায়, তাও খুব অসাধারণ কারো কারো মধ্যে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে······মহম্মদের কিংবা কোনো যোগীর, অথবা মাদাম ব্লাভাৎস্কির অলৌকিক ঘটনাগুলোও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়েছে। হ্যাঁ, এ এক বিশেষ ক্ষমতা, তা ছাড়া আর কিছু নয়। মহামনীষী···· তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বললেন, মহামান্য আরগাইলের ডিউকের যুক্তির চমৎকার সমর্থন এতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের চেয়ে অনেক গভীর এক নিয়মের সম্মুখীন আমরা হচ্ছি।····হ্যাঁ, তারপর? বল বল, শুনি।

ফদারিঙ্গে তখন উইঙ্কের কাহিনী তাঁকে শোনাল। মে-ডিগের আতঙ্ক-ভাব এতক্ষণে দূর হয়েছে, এখন শুধু তিনি কাহিনী শুনতে শুনতে কখনো হাত পা নেড়ে, কখনো বা মুখে শব্দ করে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। ফদারিঙ্গে বলল, এই ব্যাপারটা নিয়েই আমার মুস্কিল হয়েছে সবচেয়ে বেশি, আর এই ব্যাপার নিয়েই আমার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসা। অবশ্য এখন সে আছে স্যানফ্রান্সিসকোয়, - তা সে যেখানেই হোক। বুঝছেন তো মিঃ মে-ডিগ, ব্যাপারটা একটু অস্বস্তিকর আমাদের দুজনের পক্ষেই। আমার তো মনে হয় না এ সবের কিছুমাত্র সে ধারণা করতে পেরেছে। সে যে খুব ঘাবড়ে গেছে, ভয় পেয়েছে এতে সন্দেহ নেই, এবং সে যে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আসছে, তাতেও আমি নিঃসন্দেহ। বারেবারেই সে এখানে আসবার জন্য বেরোয়, আর একথা মনে হতেই কয়েক ঘণ্টা অন্তর আমি ওকে আবার সেখানে পাঠিয়ে দিই। এসব অদ্ভুত ব্যাপারের নিশ্চয় কিছুই সে বুঝতে পারছে না, খুব ঘাবড়াচ্ছে, বিরক্ত হচ্ছে।

তাছাড়া দেখুন, প্রতিবার এখানে আসবার জন্য টিকিট বাবদই ওকে কত খরচ করতে হচ্ছে! ওর জন্য অবশ্য যথাসাধ্য যা করবার আমি করেছি। পরে আমার মনে হয়েছে, ওখান থেকে স্যানফ্রানসিস্কোয় পাঠাবার আগেই ওর সমস্ত পোষাক হয়ত জ্বলে গেছে,—নরক সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা তাই যদি সত্যি হয়! সে ক্ষেত্রে হয়ত ওকে স্যানফ্রানসিস্কোয় আটকে রাখা হয়েছে। অবশ্য একথা মনে হতেই আমি ওকে একটা নতুন সুট দিয়েছি। তাহলে দেখছেন তো, এরই মধ্যে আমি কেমন একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি।

মে-ডিগ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বুঝতে পেরেছি তুমি একটু মুস্কিলেই পড়েছ। হ্যা, মুস্কিলে পড়বারই কথা। কেমন করে যে এ ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে আসবে ··· কথাটা এলোমেলো হয়ে অসমাপ্তই রয়ে গেল। কিছুক্ষণ থেমে বললেন, যাই হোক, উইঙ্কের কথা ছেড়ে এবার আমরা আসল কথায় ফিরে যাচ্ছি। ব্যাপারটা যে ম্যাজিক বা ঐ ধরণের কিছু, তা আমার মনে হয় না এবং এ যে কোনমতেই একটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না এ কথাও ঠিক··· যদি অবশ্য তুমি কিছু গোপন করে না থাক। অলৌকিক, নিছক অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া এ আর কিছু নয়। অলৌকিক ক্ষমতার চরম নিদর্শন একে বলতে হবে।

চিন্তাগ্রস্তভাবে পায়চারি করতে লাগলেন মে-ডিগ। ফদারিঙ্গে টেবলে হাত রেখে আর হাতে মাথা রেখে উদ্বিগ্নভাবে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, উইঙ্কের ব্যাপারটা নিয়ে কী যে করি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না।

এমন অলৌকিক শক্তির যে অধিকারী, উইঙ্কের ব্যাপার নিয়ে তার মাথা-ব্যথার কারণ নেই। বলতে কি, তুমি তো মহা বিখ্যাত ব্যক্তি হে,—অনেক বিস্ময়কর কীর্তির সম্ভাবনা তোমার মধ্যে রয়েছে! এই যেমন ধর, সাক্ষ্যের ব্যাপারে। অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও তোমার দ্বারা যা যা সম্ভব—

ফদারিঙ্‌গে বলল, দুয়েকটা কথা আমি ভেবে রেখেছি, কিন্তু দুয়েকটা ব্যাপারে আবার গোলমালও দেখা দিয়েছে একটু। মাছটা প্রথমবার লক্ষ্য করেছিলেন তো? মাছের জার বা মাছটা দুটোই যেমনটি হওয়া উচিত ছিল ঠিক তেমনটি হয়নি। এ বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে।

ন্যায়সম্মত, সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত এ ক্ষমতা—বলে মে-ডিগ ফদারিঙ্‌গের দিকে তাকালেন। বললেন, এ শক্তির কোনো সীমা নেই বললেই হয়। আচ্ছা, তোমার শক্তির পরীক্ষা করা যাক, দেখাই যাক, সত্যি এ শক্তি তোমার কতদূর পর্যন্ত আছে।

ব্যাপারটা যতই অবিশ্বাস্য বোধ হোক না কেন, ১০ই নভেম্বর ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে সেই ছোট ঘরটায় বসে ফদারিঙ্‌গে মে-ডিগের প্ররোচনায় ক্রমাগত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে চলল। ঐ তারিখটার ওপরেই বিশেষ করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এই কাহিনীর কয়েকটা ঘটনায় নিশ্চয় তিনি আপত্তি প্রকাশ করবেন, ইতিমধ্যেই হয়ত তা করেছেন; বলবেন, এ কাহিনীর কয়েকটা ঘটনা ঠিক যাকে বলে সম্ভবপর তা নয় এবং সত্যিই যদি এমন কিছু ঘটে থাকত তো খবর কাগজে তা প্রকাশিত হত। এবং এর পরে যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হচ্ছে, সেগুলো বিশ্বাস করা আরো কঠিন তার পক্ষে, কারণ তা যদি মানতে হয় তো এও ধরে নিতে হবে যে এক বছরের কিছু বেশী আগে, অত্যন্ত ভয়াবহ ও সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে পাঠকের মৃত্যু হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, অলৌকিক ঘটনার অলৌকিকত্বই থাকে না যদি না তা সত্যি হয়, আর বলতে কি, এক অত্যন্ত ভয়াবহ ও সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে সত্যিই সেই সময়ে পাঠকের মৃত্যু হয়েছিল। কাহিনীর শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে সুধী পাঠকমাত্রেই তখন এ কাহিনী বিশ্বাস করবেন। যাই হোক, গল্পের শেষ এখনো অনেক দূরে, এই সবে আমরা মধ্যপথ অতিক্রম করেছি। প্রথম প্রথম ফদারিঙ্‌গে ভয়ে ভয়ে ছোটখাট অলৌকিক ব্যাপারেই শান্ত থাকত, কিন্তু এই সব

সামান্য ব্যাপারেই তার সঙ্গী মে-ডিগ ভয় পেয়ে উঠতেন। উইস্কের ব্যাপারটাই ফদারিঙ্‌গে সবপ্রথম ঢুকিয়ে ফেলতে চাইছিল, কিন্তু মে-ডিগ কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না। গোড়ায় গোড়ায় গোটা বারো ঐ ধরণের অলৌকিক ঘটনা ঘটাবার পর ওদের নিজেদের ওপর আস্থা হল, কল্পনা প্রসারতা লাভ করল, উচ্চাশাও সীমা ছাড়াল। প্রথম যে বড় কাজে ওরা হাত দেয় তার সূত্রপাত হয়েছিল খিদের তাড়নায় আর মে-ডিগের গৃহকর্ত্রী মিসেস মিনচিনের অবহেলার ফলে। যে খাবার মিসেস মিনচিন ওদের দিয়েছিল, ওদের মত দুজন অলৌকিক ঘটন-বীরের কিছুমাত্র ক্ষুধার উদ্রেক তাতে হয়নি। যাই হোক, ওরা বসে পড়ল। মিসেস মিনচিনের এ অপরাধের জন্য মে-ডিগের ক্রোধের চেয়ে দুঃখই হল বেশি। কিন্তু ফদারিঙ্‌গের মনে হল, এই তো সুযোগ! বললে, আচ্ছা মিঃ মে ডিগ, আপনি কি কিছু মনে করবেন যদি—

বুঝেছি ফদারিঙ্‌গে, বুঝেছি। না কিছু মনে করব না।

ফদারিঙ্‌গে হাত তুলে বলল, কী খাওয়া যায়? বেশ ব্যাপকভাবেই কথাটা বলল সে। তারপর মে-ডিগের ইচ্ছে মত তাঁর আহারের আমূল পরিবর্তন করে নিজের পছন্দ মত খাবার জোগাড় করল। অনেকক্ষণ ধরেই ওদের এই খাওয়া চলল, খেতে খেতে সমান-স্তরের বন্ধুর মত কত আলোচনাই ওদের চলল। যে যে অলৌকিক ঘটনার চিন্তা ওর মাথায় এসেছে সে সবের কথা চিন্তা করে ফদারিঙ্‌গে উল্লসিত হয়ে উঠল, বললে, হ্যাঁ, বলছিলাম কি মিঃ মে-ডিগ, আপনার ঘরোয়া ব্যাপারে হয়ত আমি কোন রকম সাহায্যে আসতে পারি।

বুঝলাম না ঠিক, বার্গাণ্ডি গ্লাসে ঢালতে ঢালতে মে-ডিগ বললেন।

আর এক গ্রাস খাবার মুখে তুলে ফদারিঙ্‌গে বলল, ভাবছিলাম, (খাবার চিবোনোর শব্দ) এই অলৌকিক বলে (খাবার চিবোনোর শব্দ) মিসেস মিনচিনকে অনেকটা ভাল মানুষ করা যায় কিনা!

গ্লাস নামিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ফদারিঙ্‌গের দিকে তাকিয়ে মে-ডিগ

বললেন, মানে, কথা হল কি, ওর—ওর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা ও মোটেই পছন্দ করে না। আর তা' ছাড়াও রাত হয়েছে, অনেকক্ষণ এগারোটা বেজে গেছে। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার কি মনে হয় -

আপত্তিগুলো মনে মনে বিচার করে দেখে ফদারিঙ্গে বলল, ঘুমন্ত মানুষের ওপর অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগে তো কোনো অসুবিধে দেখছি না।

কিছুক্ষণ আপত্তির পর রাজি হলেন মে-ডিগ। ফদারিঙ্গে তখন অলৌকিক শক্তির শরণ নিল। বাকী খাওয়াটা আর ওদের তেমন জমে উঠল না। এর ফলে তাঁর গৃহকর্ত্রীর ওপর কী পরিবর্তন পরদিন সকালে দেখা দিতে পারে সেবিষয়ে মে ডিগ তাঁর ধারণা ব্যক্ত করলেন। তিনি এতটা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন যে এই আনন্দের মুহূর্তেও তা ফদারিঙ্গের কাছে কষ্টকল্পনা বলে মনে হল, মনে হল যেন এতটা আশা করা ঠিক হবে না। এমন সময় ওপরতলা থেকে কয়েকটা মিলিত শব্দ শোনা গেল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল, আর মে-ডিগ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফদারিঙ্গে শুনল তিনি গৃহকর্ত্রীকে ডাকছেন, তারপর তাঁর পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মিনিটখানেক পরেই হাল্কা পায়ে, উদ্ভাসিত মুখে মে-ডিগ ফিরে এলেন। বললেন, অদ্ভুত, অতি করুণ সে দৃশ্য!

পায়চারি করতে করতে বললেন, এক অত্যন্ত করুণ অনুশোচনার দৃশ্য তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছেন। সত্যি, আশ্চর্য পরিবর্তন ওর হয়েছে। ও উঠে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত। নিজের বাক্সের ভেতর লুকিয়ে রাখা এক ব্র্যাণ্ডির বোতল········অপরাধ স্বীকার করবে বলে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে। এক বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত আমরা এ থেকে পাচ্ছি ফদারিঙ্গে। কারণ ওর ওপরে পর্যন্ত যখন এমন অভাবনীয় পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে···

এর সম্ভাবনার হয়ত সত্যিই কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, মিঃ মে-ডিগ। কিন্তু উইঞ্চ—

সত্যি, একেবারে কোনো সীমাপরিসীমা নেই। এই বলে হাতের ইসারায় উইঙ্কের ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে মে-ডিগ একধার থেকে অনেক অপূর্ব সম্ভাবনার কথা বলে চললেন এবং আরো অনেক নতুন সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় ভিড় করে এল।

এ সম্ভাবনার কথা আমাদের কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু নয়, সুতরাং এসম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে অনেক কল্যাণকর কাজেই ওদের সে সম্ভাবনা রূপ নিয়েছিল। উইঙ্ক সম্বন্ধেও এটুকুই যথেষ্ট যে তার সমস্যা সমস্যাই রয়ে গেল। এই অলৌকিক শক্তি কতদূর এবং কী ভাবে কাজে পরিণত হয়েছিল, সে কথাও এখানে অবান্তর। চারিদিকেই বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। গভীর রাতে, স্তব্ধ চাঁদের আলোয় মে-ডিগ আর ফদারিঙ্গে কণকণে ঠাণ্ডায় বাজার পেরিয়ে উত্তেজনায় অধীর হয়ে এগিয়ে চলেছে,—মে-ডিগ খুব হাত পা নাড়ছেন, অঙ্গভঙ্গি করছেন। প্রথম আবিষ্কারের সলজ্জ ভাব এতক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে ফদারিঙ্গে, ছোট ছোট কথায় উৎসাহিতভাবে কথা কইতে কইতে সে চলেছে। মন্ত্রীসভার প্রত্যেকটি মাতালকে তারা মদ ছাড়িয়েছে, সেখানে যত মদ আর বিয়ার ছিল সে সমস্তকে জলে পরিণত করেছে। (এক্ষেত্রে ফদারিঙ্গের আপত্তি মে ডিগের কাছে টেঁকেনি) শুধু তাই নয়, ওখানকার রেল-পথেরও ওরা অনেক উন্নতি করেছে, ক্লিভারের জলা নিষ্কাষণ করেছে, ওয়ান-ট্রি হিলের মাটি ভাল করেছে, ভিকারের চর্মরোগ সারিয়েছে। হাঁফাতে হাঁফাতে মে-ডিগ বললেন, এ জায়গাটা দেখে সবাই কেমন আশ্চর্য হবে, কত ধন্যবাদ দেবে! ঠিক এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। ফদারিঙ্গে বলে উঠল, তিনটে বাজল! এবার তাহলে ফিরতে হচ্ছে। আটটার সময় কাজে যেতে হবে। আর তা ছাড়াও, মিসেস উইলিয়মস্…

—এই তো সবে শুরু,—অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারীর যেমন বিনয়-নম্র ভাবে কথা বলা উচিত তেমনি করে মে-ডিগ বললেন,—এই তো সবে

আমাদের কাজ শুরু ! ভেবে দেখ তো, কত কল্যাণকর কাজ আমরা করেছি ! কাল সবাই ঘুমিয়ে উঠে

কিন্তু—

হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরলেন মে-ডিগ,—এক বন্ধু, উজ্জ্বল দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে। বললেন, ফদারিঙ্গে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বলে মধ্যাকাশে চাঁদের দিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ দেখ। ধেত্তেরি !

এ্যাঁ !

ধেত্তেরি, তা নয় ত কী ? দাও থামিয়ে !

চাঁদের দিকে তাকাল ফদারিঙ্গে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে উঠছে না কি ?

হলেই বা !····· না না, ওটা থামবে কেন, তুমি পৃথিবীর অক্ষপ্রদক্ষিণ বন্ধ করে দাও, ব্যস। অমনি সময়ও আর চলবে না, বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা তো আর অনিষ্টকর কিছু করছিনা !

হুঁ ! আচ্ছা ! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল, বেশ, চেষ্টা করেই দেখি !

গায়ের জ্যাকেটে বোতাম লাগিয়ে, একাগ্র মনে ধরিত্রীকে সম্বোধন করে ফদারিঙ্গে বলল,······অক্ষপ্রদক্ষিণ বন্ধ কর।

সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত নিরবলম্ব অবস্থায় মাথা নীচু করে মিনিটে বহু মাইল বেগে ফদারিঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হল ! প্রতি সেকেণ্ডে অসংখ্য পাক খেতে খেতে সেই অবস্থাতেও ও চিন্তাশক্তি হারাল না, (অদ্ভুত এই চিন্তাশক্তি, পরম মন্থর গতিতে হোক অথবা বিদ্যুৎ-গতিতেই হোক, উভয় ক্ষেত্রেই তার সমান বিকাশ) এক সেকেণ্ডের মধ্যে সে মতি স্থির করে নিল, ইচ্ছা প্রকাশ করল,······আমি যেন নিরাপদে নেমে যেতে পারি, ······আর যাই হোক, অন্ততঃ আমি যেন নিরাপদে ফিরতে পারি।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সে এ ইচ্ছা প্রকাশ করছিল, কারণ বায়ুপথে মহাবেগে ধেয়ে যাবার ফলে ইতিমধ্যেই তার পোষাক প্রায় জ্বলে উঠেছিল।

একটা মাটির ঢিবির ওপরে সে সবেগে পতিত হল, কিন্তু কোন আঘাত পায়নি। ধাতব স্থাপত্যের এক বিরাট ধ্বংসাবশেষ (বাজারের কাছের প্রকাণ্ড ঘড়িটার সঙ্গে অদ্ভুত তার সাদৃশ্য) ঠিক তার পাশে এসে পড়তেই তার টুকরো অংশগুলো ইঁট পাথর আর চূর্ণবালির আকারে সবেগে উৎক্ষিপ্ত হল। তারই একটা বড় টুকরো একটা গরুর ওপরে পড়তেই গরুটা একেবারে ডিমের মত গুঁড়ো হয়ে গেল। তারপর এমন একটা প্রচণ্ড শব্দ হল যার তুলনায় যত শব্দ সে সারা জীবনে শুনেছে সব তার নেহাৎ সামান্য বলেই বোধ হল। এর পর কয়েকটা ছোটখাট শব্দ সে শুনতে পেল,—কি সব ভেঙে যাওয়ার মত শব্দ। মাটিতে, আকাশে, ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জন শোনা যেতে লাগল, মাথা তুলে তাকিয়ে দেখাও তার পক্ষে সম্ভব হল না। এমন দম আটকে আসছিল, এত আশ্চর্য সে হয়েছিল যে সে এখন কোথায়, এসব কী তার চারিদিকে ঘটে চলেছে,—সেটুকু দেখার চেষ্টা করাও কিছুক্ষণের জন্য তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। নড়াচড়ার শক্তি যখন ফিরে পেল, মাথায় হাত দিয়ে তবে সে নিজের সম্বন্ধে নিশ্চয় হল।

ওঃ, কী সাঙ্ঘাতিক!—হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে সে বলল—ঝড়ের দাপটে কথাই বলতে পারছে না সে,—ওঃ বড় জোর বেচে গেছি এ যাত্রা! কোথায় কী ভুল হল? ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত! অথচ এক মিনিট আগেও কেমন শান্ত রাত্রি ছিল! মে-ডিগের কথা শুনেই এ অবস্থা! ওঃ, কী সাঙ্ঘাতিক ঝড়! এমন বোকার মত কাজ করলে তো মহা বিপদে পড়ব কোন দিন!······

মে-ডিগ কোথায়?

সমস্ত এ কেমনধারা এলোমেলো হয়ে পড়েছে!

জ্যাকেটটা সামলে রেখে সে যতদূর সম্ভব চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। সমস্ত কিছুই কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বলল, যাক তবু ভাল আকাশটা ঠিক আগের মতই রয়েছে। হ্যাঁ, আকাশটাই শুধু একটুও বদলায় নি।

কিন্তু সেখানেও আবার প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস। না, ঐ চাঁদ উঠেছে, যেমনটি উঠত তেমনিই! কিন্তু একেবারে মধ্যাহ্নের মত উজ্জ্বল। কিন্তু আর সব—গ্রামটাই বা গেল কোথায়? কোথায় কী, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছিনা? আর এই ঝড়ই বা এল কোথা থেকে? ঝড় তো আমি চাই নি?

পায়ে ভর করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা। তখন সে চার হাত পায়ে ভর করে শক্ত হয়ে রইল। যেদিক থেকে ঝড় বইছে না সেদিকে ফিরে চাঁদের আলো মাখা পৃথিবীর দিকে তাকাল। তার জ্যাকেটের নিচের দিকটা ঝড়ের দাপটে মাথার উপরে ঠেলে উঠেছে। কোথায় একটা মস্ত ভুল হয়েছে নিশ্চয়,—ফাদারিঙ্‌গে বলে উঠল,—কিন্তু কী সে ভুল, ভগবান জানেন!

ঝড়ের তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে যে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি চারিদিক ছেয়ে ছিল, প্রখর শ্বেতাভ জ্যোতিতেও তার আবরণ ভেদ করে বহুদূর পর্যন্ত কেবল-মাত্র দেখা যায় মৃত্তিকার স্তূপ, প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের চিহ্ন,—নেই কোন গাছপালা ঘরবাড়ি, বাস্তব পৃথিবীর কোন কিছুর অস্তিত্ব সেখানে নেই, চারিদিক আচ্ছন্ন করে রয়েছে শুধু বিশৃঙ্খলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সেই বিশৃঙ্খলাও অবশেষে ক্রমবর্ধমান ঝঞ্ঝার বজ্রবিদ্যুৎ-জ্বালায় উৎক্ষিপ্ত এক ঘূর্ণস্তম্ভের তমসার অন্তরালে লুপ্ত হয়ে গেল। সেই প্রখর আলোয় যে বস্তুটি কাছে রয়েছে দেখতে পেল, কোনকালে হয়ত তাকে একটা এলম্ গাছ বলে চেনা যেত। বহুতর পদার্থের রাশীকৃত ধ্বংসস্তূপ তার ডালে ডালে, তার কাণ্ডে শিউরে উঠছে—সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে মাথা তুলে যে অতিকায় লৌহময় বস্তুটি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে, সেটাকে দেখলে পরিচিত পোল বলে চিনতে ভুল হয় না।

ব্যাপারটা হল এই—ফদারিঙ্‌গে যখন পৃথিবীর অক্ষপ্রদক্ষিণ বন্ধ করে, পৃথিবীর ওপরকার ছোটখাট অস্থাবর পদার্থের জন্য কোন ব্যবস্থা সে আগে থেকে করেনি। পৃথিবীর অক্ষপ্রদক্ষিণের গতি এত তীব্র যে বিষুবরেখা

অঞ্চলে তার বেগ ঘণ্টায় হাজার মাইলেরও অধিক আর এ অক্ষাংশে তার বেগ কিঞ্চিদধিক এর অর্ধেক। ফাদারিঙ্‌গের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সমস্ত গ্রাম,—মে-ডিগ, ফদারিঙ্‌গে নিজে,—যে যেখানে ছিল, সে বস্তু যেখানে ছিল সমস্ত কিছু······সেকেণ্ডে ন' মাইল বেগে—অর্থাৎ কামানের গোলার চেয়েও তীব্র বেগে—উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এবং এর ফলে, যেখানে যত মানুষ যত প্রাণী, যত ঘর বাড়ি, গাছপালা,—আমাদের পরিচিত বিরাট জগতের সমস্ত কিছু······উৎক্ষিপ্ত, ধ্বংস, চূর্ণ হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, এ সম্ভাবনার কথা ফদারিঙ্‌গের মাথায় আগে আসেনি। ও শুধু দেখল, ওর অলৌকিক শক্তি ভুলপথে চালিত হয়েছে। ফলে অলৌকিক শক্তির ওপরে ওর আন্তরিক বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। ওর চারিদিকে কেবল অন্ধকার, কারণ চাঁদের যে আলো মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল তাও এখন মেঘে ঢাকা, বাতাসে কেবল থেকে থেকে ভেসে আসছে ঝড়ের কাতরোক্তি। ঝড়ের আর জলের প্রচণ্ড আলোড়নে আকাশ বাতাস মুখরিত। চোখে হাত ঢাকা দিয়ে সেই দুর্যোগের মধ্যে ফদারিঙ্‌গে ঝড়ের দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল,—অসীম জলরাশি চলমান প্রকাণ্ড এক দেওয়ালের মত সবেগে তার দিকে ধেয়ে আসছে!

চারিদিকের বিপর্যয় ভেদ করে ফদারিঙ্‌গের তীক্ষ্ণ চীৎকার ক্ষীণ হয়ে শোনা গেল—মে-ডিগ!

থামো!—এগিয়ে আসা জলরাশিকে ফদারিঙ্‌গে চীৎকার করে বলে উঠল, থামো,······থেমে যাও দয়া করে!

এক মুহূর্ত!—বিদ্যুৎ আর বজ্রকে উদ্দেশ্য করে ফদারিঙ্‌গে বলে উঠল,—এক মুহূর্ত থামো, চিন্তা করতে দাও আমাকে······কী যে করি! হা ঈশ্বর, এখন যদি মে-ডিগ এখানে থাকত!

ফদারিঙ্‌গে বলে উঠল, আচ্ছা—এবারকার মত দয়া করে সামলে নিতে দাও!

বাতাসে হেলান দিয়ে, চার হাতে পায়ে ভর করে

ফদারিঙ্গে। আবার আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

বলল,—আমি এখন যা যা হুকুম করব,—তারপর যতক্ষণ না আমি বলছি, 'ব্যস',······ততক্ষণ যেন কিছু না ঘটে। হা ভগবান, একথা যদি আমার আগে মনে হত!

প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর তাণ্ডবনাদ অতিক্রম করে যাতে ওর ক্ষীণকণ্ঠ নিজের শ্রুতিগোচর হয় সেই চেষ্টায় কেবলই ও গলার স্বর চড়াতে লাগল, কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা। বলল,—এবার শোনো। মনে রাখবে যা আমি এক্ষুণি বললাম। প্রথমেই বলে রাখছি, আমি যা যা হুকুম করছি সেই মত কাজ হয়ে যাবার পর আর যেন আমার এই অলৌকিক শক্তি না থাকে, আমার ইচ্ছাশক্তি যে-কোন সাধারণ মানুষের ইচ্ছাশক্তির সমান হয়, আর এই সমস্ত সাজ্ঘাতিক ব্যাপারের অবসান হয়,—এ আর আমার সহ্য হচ্ছে না। এই হল প্রথম কথা। আর দু' নম্বর, আমি যেন আবার অলৌকিক কাণ্ড শুরু হবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই,—বাকি সমস্ত কিছুও যেন সেই 'লং ড্র্যাগনের' বাতি উল্টে যাবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বুঝেছ তো? অলৌকিক ব্যাপার-ট্যাপার আর নয়,—সমস্তই ঠিক আগে যেমনটি ছিল,—'লং ড্রাগনে' আমি আধ-পাইণ্ট নিয়ে বসেছি—ঠিক তার আগের অবস্থায় ফিরে যাক। হ্যাঁ, এই।

এই বলে, হাতের আঙুলগুলো দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে চোখ বুজিয়ে ও বলল,—ব্যস!

চারিদিক স্তব্ধ। ফদারিঙ্গে অনুভব করল, ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—ও তুমি তাই বলতে চাও,—কথাগুলো ওর কানে এল।

ফদারিঙ্গে চোখ মেলল। 'লং ড্রাগনে' বসে ও টডি বীমিশের সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে তর্ক করছে। পলকের জন্য ওর মনে হল, কি একটা বিরাট ব্যাপার ও যেন ভুলে গেছে, কিন্তু তক্ষুণি সে ভাব তার কেটে

গেল। ব্যাপারটা হল কি, ওর অলৌকিক ক্ষমতা লোপ পাওয়া ছাড়া আর সমস্তই ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি আছে,—ফলে ওর মন, ওর স্মরণশক্তি······আমার কাহিনী শুরু হবার সময় যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং ফলে এই কাহিনীতে বর্ণিত সমস্ত বৃত্তান্তের কিছুই সে জানে না। সুতরাং আগের মতই অলৌকিক ঘটনাতে তার কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই।

সত্যি বলতে গেলে বলতে হয়, ফদারিঙ্‌গে বলল,······অলৌকিক ঘটনা কোনমতেই সম্ভব হতে পারে না, সে তুমি যা বল না কেন। এ আমি একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণ করতে পারি।

ও তুমি তাই বলতে চাও,······টডি বীমেশ বলল,······বেশ, পার তো প্রমাণ কর।

ফদারিঙ্‌গে বলল, আচ্ছা বীমিশ, শোন। প্রথমেই বিচার করে দেখা যাক, 'অলৌকিক' কাকে বলে। অলৌকিক ঘটনা হল, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম সৃষ্টি করা······

—অলক সেন

ম্যাজিকের দোকান

ম্যাজিকের দোকানটাকে দেখেছি দূর থেকে কয়েকবার। দুএকবার গিয়েওছি ওটার সামনে দিয়ে। দোকানটার কাঁচ-ঢাকা জানলায় যত রাজ্যের সব অদ্ভুত আর আশ্চর্য জিনিষ সাজানো রয়েছে—ম্যাজিকের বল, ম্যাজিকের মুর্গি, হরবোলা পুতুল, ম্যাজিকের তাস (দেখতে যদিও নিতান্তই সাধারণ তাসের মত) আর সেই ম্যাজিক-চুপড়ির খেলা দেখাবার সরঞ্জাম, গম্বুজের মত দেখতে সেই আশ্চর্য ঢাকাগুলো, যার তলা থেকে সব অদ্ভুত জিনিষ বেরিয়ে আসে আবার ফুস্‌-মন্তরে উধাও হয়ে যায়! এমনি আরো যত সব উদ্ভট, আজগুবি জিনিষে ভর্তি দোকানটা।

দোকানটাতে ঢোকবার সদিচ্ছা ছিল না অবশ্য আমার কোনো কালেই—যদিও একদিন শেষকালে তা-ই ঘটল। আমার আঙুলটি ধরে জিপ নিঃশব্দে সোজা টেনে নিয়ে গেল ঐ দোকানটার জানলার কাছে, ভাববার অবসরই দিল না। এমন ভাব দেখাল, যেন দোকানটাতে না গেলেই নয়।

মাঝারি গোছের এই দোকানটা রিজেন্ট ষ্ট্রীটের ওপরেই—ঠিক যে এই-খানটাতেই ছিল, সত্যি বলতে কি, এ আমি লক্ষ্যই করিনি। ঐ ডিম ফোটাবার কলের দোকান, যেখানে প্রায়ই দেখি মুর্গির বাচ্চাগুলো ডিম থেকে বেরিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে, আর ঐ ছবির দোকানটা—এদুটোর মাঝামাঝি জায়গাতেই কোথাও ঐ মাঝারি সাইজের ম্যাজিকের দোকানটা। অথচ আমার ধারণা ছিল,......ঐ দিকে সেই সার্কাসের কাছে বুঝি হবে দোকানটা, কিংবা অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের মোড়টাতে, নয় ত একেবারে সেই হবর্ণে; আর দোকানটা বড় রাস্তার ওপরে ঠিক হয়ত নয়, এবং এমন একটা জায়গায়, যে সব সময়ে যেন খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর।

যাক্‌, দোকানটা যে ঠিক এইখানটাতেই, এখন আর তাতে সন্দেহ নেই। জিপ তার আঙুলের ডগাটা জানলার কাঁচের ওপর চেপে ধরে

দেখাচ্ছিল দোকানের জিনিষ-পত্র। চাপ পড়তেই কি রকম একটা আওয়াজ হল।

আমার যদি অনেক, অনেক টাকা থাকত—একটা উপে-যাওয়া ডিমকে দেখিয়ে জিপ বলল,—তা হলে আমার জন্যে এইটে কিনতাম; আর—আর ঐটে, বলে জিপ যা দেখিয়ে দিল সেটা হল একটা কাঁদুনে ছেলে, অবিকল জ্যান্ত মানুষের মত দেখতে,—আর কিনতাম এইটে—জিপ বলে চলল। এবার যেটা দেখাল সে হচ্ছে একটি আশ্চর্য রহস্যময় বস্তু—গায়ে লটকানো এক টুকরো ধবধবে কাগজে গোটা গোটা করে লেখা—'কিনে ফেল, তোমাদের বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দাও।'

জিপ বলল, যা-কিছু ঢেকে রাখোনা ঐ গম্বুজের মত ঢাকনাটার তলায়, দেখতে না দেখতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। এ আমি পড়েছি একটা বইয়ে। আর—দেখেছ, বাবা! ঐ যে সেই মিলিয়ে-যাওয়া পয়সা? ঐ ত!—ওরা অবশ্যি এটাকে এখন ঘুরিয়ে রেখেছে, পাছে ওর ভিতরকার সব কৌশল সবার চোখে আগে থাকতেই ধরা পড়ে যায়।

বেচারা জিপ! ও ঠিক ওর মায়ের স্বভাবটি পেয়েছে। দোকানের ভেতরে ঢোকবার নাম গন্ধটি সে করল না। সে সম্বন্ধে তার যে কোনও আগ্রহ আছে—তারও বিন্দু-বিসর্গ সে প্রকাশ করল না। আঙুলটি ধরে দোকানের দরজার দিকে ধীরে ধীরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল সে—এক-রকম তার অজান্তেই যেন।

স্পষ্টই বোঝা গেল ওর মতলবটা কী!

ঐটে!—ম্যাজিকের বোতলটা দেখিয়ে জিপ বলল।

ঐটে তোমার চাই? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আমার গলায় আগ্রহের সুর শুনে ওর চোখ মুখ খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ও মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

জেসিকে তা হলে ওটা দেখাতে পারতাম—জিপ বলল। অর্থাৎ যত ভাবনা ওর অন্যদের জন্যেই যেন। আমি বললাম, তোমার জন্মদিন আসতে

আর তো একশোটা দিনও বাকী নেই, জিপ? সঙ্গে সঙ্গে দোকানের দরজার হাতলে হাত দিলাম। জিপের মুখে জবাব নেই, আমার আঙুলটা চেপে ধরল কেবল, আরও জোরে।

দু'জনে গিয়ে ত দোকানে ঢুকলাম। দোকান—মানে, ম্যাজিকের দোকান এটা, যে-সে দোকান নয়! কেবল মামুলি খেলনা কেনার ব্যাপার হতো যদি, তা হলে জিপ এতক্ষণে আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিত। এখানে এসে সেসব কিছুই করল না সে, রইল প্রায় চুপচাপ, কথাবার্তা বলবার ভারটা যেন আমার ওপরেই ছেড়ে দিল।

ছোট্ট সরু মতন দোকানটা, ভেতরে আলো তেমন বেশী নেই। দোকানে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিতেই একটা করুণ টানা আওয়াজ করে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তকাল আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; কেউ কোথাও নেই। একবার চারদিকে তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম।

নীচু কাউণ্টারটাকে আড়াল করে রেখেছে একটা কাঁচের বড় বাক্স। বাক্সটার ওপরে একটা বাঘ, কাগজের মণ্ডের তৈরী। গম্ভীর-গম্ভীর কি রকম চেহারা যেন বাঘটার; চোখের দৃষ্টিও নিরীহ গোছের। বাঘের মাথাটা দুলছিল—একবার এদিকে একবার ওদিকে।

কাঁচের তৈরি কয়েকটা বড় বড় বল, চীনামাটির একটা হাতে ম্যাজিকের তাস ধরা রয়েছে; একটা বড় পাত্র, আর একটা বিতিকিচ্ছি স্প্রিং বের করা ম্যাজিক-টুপি—এইসব চোখে পড়ল। মেঝেতে রয়েছে কয়েকটা ম্যাজিক-আয়না,—তার একটাতে তাকালে তোমাকে দেখাবে অতি বিশ্রী-রকম রোগা আর ঢ্যাঙা, আর একটাতে আবার মুণ্ডুটা দেখাবে বিকট রকম চ্যাপ্টা, আর পা দুটো কোথায় গেছে চলে। আর একটা যেটা আছে তাতে আবার দেখাবে বেঁটে-মোটা, হোঁদলকুৎকুৎ সঙের মত।

আমরা এইসব দেখছি আর হাসছি, এমন সময় দোকানদার—মনে হল সে দোকানদারই হবে—এসে ঢুকল সেখানে—(মানে ঢুকল

বা যা-ই করল)—দেখা গেল, লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টারের পেছনে। অদ্ভুত রকমের চেহারা তার—গায়ের রং বেশ পোড়াপোড়া, মুখখানা শুকনো, ফ্যাকাশে। একটা কান আরেকটা কানের চাইতে লম্বা, আর জুতোর ডগার মত ছুঁচলো, বেঁকানো চিবুক। কাঁচের বাক্সটার ওপরে তার ম্যাজিক-হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো ছড়িয়ে ধরে সে যখন জিজ্ঞাসা করল,—আপনাদের কি দেব বলুন, আমরা চমকে উঠে তার সম্বন্ধে সচেতন হলাম। আমি বললাম, আমার এই ছেলেটির জন্যে গোটাকয়েক সহজ ধরণের মজার খেলা কিনতে চাই।

হাত সাফাই, যন্ত্রপাতি, না ঘরোয়া ধরণের?—সে জিজ্ঞাসা করল।

মজাদার কিছু পাব না? আমি বললাম। দোকানদার বলল, হুঁ! মাথাটা একটু চুলকে দেখাল, যেন সে কত ভাবছে। তারপর অতি পরিষ্কারভাবে তার মাথা থেকে একটা কাঁচের বল বার করে আনল। বলল, অনেকটা এই ধরণের হলে চলবে, কেমন? বলে কাঁচের বলটা হাত মেলে ধরে রইল। এমনটা যে হবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। নানা রকম মজলিসে আসরে ম্যাজিকের এই খেলাটা এর আগে কতবার যে দেখেছি তার হিসেব নেই;—সব ম্যাজিকওয়ালাই এটা দেখিয়ে থাকে। কিন্তু এখানে যে এই খেলা দেখব, এমন আশা করিনি। হেসে বললাম, বেশ, বেশ!

—তাই নয় কি? দোকানদার বলল।

ম্যাজিকওয়ালার হাত থেকে কাঁচের বলটা নেবার জন্যে জিপ তার হাতটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেই হাত বাড়াল, অমনি ম্যাজিকওয়ালার হাতে—কিছু নেই!

দোকানদার বলল, ওটা তো তোমার পকেটে রয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বলটা জিপের পকেটে চলে গিয়েছে।

ওটার দাম কত হবে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কাঁচের বলের জন্যে আমরা দাম নিই না,·········বিনীতভাবে

দোকানদার বলল, আমরা ওগুলো বিনা পয়সায় পাই—বলতে বলতে তার কনুই থেকে একটা কাঁচের বল বের করল, তারপর আর একটা তার ঘাড়ের কাছ থেকে বের করে কাউণ্টারের উপরে আগের বলটার পাশে রাখল।

তার নিজের কাঁচের বলটার দিকে জিপ গম্ভীরভাবে চেয়ে দেখল, তারপর কাউণ্টারের উপরে রাখা বল দুটোর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করল। তারপর তার গোল গোল চোখ দুটি মেলে দোকানদারের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল।

দোকানদার একটু হাসল, বলল, ওগুলোও তুমি নিতে পার। আর, যদি কিছু না মনে কর তবে আরো একটা নিতে পার—এই আমার মুখ থেকে। এই নাও।

জিপ মুহূর্তকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ইচ্ছেটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর খুব গম্ভীর মুখে চারটি কাঁচের বলই সরিয়ে ফেলল চুপচাপ। আবার সে নির্ভাবনার সঙ্গে আমার আঙুলটা মুঠো করে ধরে, এরপরে কি ঘটে তার জন্য তৈরী হয়ে রইল।

দোকানদার বলল, ছোটখাট খেলনাগুলো আমরা সব এই ভাবেই জোগাড় করি।

যেন একটা ঠাট্টা বুঝতে পেরেছি, এমনি ভাবে হাসলাম। বললাম, বড় বড় পাইকারী দোকানে যাওয়ার চাইতে খরচের দিক দিয়ে এটা লাভের বটে!

হ্যাঁ, এক রকম কতকটা তাই বৈকি—দোকানী বলল—যদিও লাভ আমরা শেষ পর্যন্ত করেই থাকি। কিন্তু লোকে যতটা ভাবে, সে রকম কিছু বেশী সেটা নয়। রোজ রোজ আমরা যে সব বড় বড় ম্যাজিকের খেলা দেখাই, আমাদের রোজকার খাই-খরচ আর অন্য যা কিছু আমাদের দরকার হয় সে সব আমরা পাই এই টুপিটা থেকে……

আর যদি দোষ না ধরেন তো বলি, 'খাঁটি ম্যাজিকের পাইকারী দোকান' —এই ক'টি কথা আপনার নজরে পড়েছে কিনা জানি না—দেখুন, লেখা রয়েছে আমাদের দোকানের গায়ে,······বলেই ওর গাল থেকে দোকানের নাম ছাপানো একটা কার্ড টেনে বের করে আমার হাতে দিল।

খাঁটি স্যার! কার্ডে ছাপানো কথাটার উপর আঙুল রেখে দোকানী বললো, এর মধ্যে একটুও ফাঁকি পাবেন না কোথাও। ঠাট্টাটাকে সপ্রমাণ করবার জন্যই যেন সে তৎপর হয়ে উঠেছে মনে হল।

জিপের দিকে তাকিয়ে সে অতি মোলায়েম স্বরে বলল, জেনো, তুমিই হচ্ছ সত্যিকারের ভাল ছেলে।

ভেবে অবাক হলাম, খবরটা সে জানল কি করে। কারণ ছেলেপুলেদের কাছে বাড়ীতে পর্যন্ত সে কথা গোপন রাখা হয়, যাতে তারা বিগড়ে না যায়। কথাটা শুনে কিন্তু জিপ তেমনি অবিচলিত শান্তভাবে দোকানদারের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

ঐ দরজা দিয়ে কেবল সত্যিকারের ভাল ছেলেরাই ঢুকতে পারে—সঙ্গে সঙ্গেই, যেন তার কথাটা সপ্রমাণ করবার জন্যেই দরজার দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ এল, আর শোনা গেল কচি গলার অস্পষ্ট কলধ্বনি—না না—ওখানে আমি যাব, ওর ভেতরে—বাবা, ওর ভেতরে আমি যাবই—না-ন্না-আ আ! সেই সঙ্গে শোনা গেল পিতার সান্ত্বনা আর অনুরোধ মেশান অনিচ্ছুক কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন, ও দরজাটা চাবিবন্ধ, এড্ওয়ার্ড।

কিন্তু সত্যি তো আর দরজাটা চাবিবন্ধ নয়, বললাম আমি।

আজ্ঞে হাঁ চাবিবন্ধই—দোকানী বলল, ঐ রকম ছেলেদের জন্যে সর্বদাই বন্ধ থাকে। তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলাম একটি ছোট্ট ফর্সা মুখ—অতিরিক্ত মিষ্টি আর মুখরোচক খাবার খেয়ে খেয়ে ফ্যাকাশে। আথ্থুটে

একরোখা স্বভাবের ছাপ ক্ষুদে মানুষটির চোখে মুখে স্পষ্ট। সেই জাদু-করা দরজার কাঁচের গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট ছেলেটি।

সাহায্য করবার স্বাভাবিক প্রেরণার বশেই আমি উঠে যাচ্ছিলাম দরজাটা খুলে দিতে। কিন্তু দোকানদার বলল, আজ্ঞে, কিচ্ছু দরকার নেই তার।

সেই মুহূর্তে শোনা গেল সেই দুষ্টু ছেলেটি চেঁচাচ্ছে আর তাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। একটু যেন আশ্বাস পেয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম—ও ব্যাপারটা হল কী করে?

যেন কিছুই নয়, এমনি ভাব দেখিয়ে আর তাচ্ছিল্য ভাব এনে বলল, ম্যাজিক।

কি আশ্চর্য! দেখলাম, তার আঙুলের ডগা থেকে রঙ বেরঙের আগুনের শিখা ছুটে বেরুচ্ছে, আর মিলিয়ে যাচ্ছে দোকানের ছায়াঘেরা কোণগুলিতে।

জিপের দিকে চেয়ে দোকানী নিজে থেকেই বলল, এই দোকানে ঢোকবার আগে তুমি বলছিলে,......'এইটি কেনো আর তোমার বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দাও'– আমাদের ঐ খেলনার বাক্সটি তোমার পছন্দ?

জিপ বেশ খানিকটা চেষ্টা করে বলল—হ্যাঁ।

ওটা তো তোমার পকেটেই রয়েছে!

এই অদ্ভুত লোকটি- সাধারণ মানুষের চাইতে তার শরীরটা যথার্থই বেশী লম্বা—কাউণ্টারের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঐ বস্তুটি আর পাঁচজন ম্যাজিকওয়ালাদের মতই বার করে আনল—একেবারে জিপের পকেট থেকে। .... কাগজ! বলার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা কাগজ বার করে আনল সেই স্প্রিং-ওঠা টুপিটার ভেতর থেকে।......সুতো! যেমনি বলা অমনি ওর মুখ থেকে সুতো বেরিয়ে আসছে অফুরন্ত, অনর্গল; যেন ওর মুখে একটা সুতোর গুলিই রয়েছে! বাণ্ডিলটা বাঁধা হয়ে গেলে সে দাঁতে সুতোটা কেটে ফেলল আর মনে হল যেন গিলে

ফেলল বাকী সুতোটা। তারপর সে ঐ হরবোলা পুতুলদের একটার নাকের ডগায় মোমবাতি জ্বালল আর তার হাতের একটা আঙুল (আঙুলটা ততক্ষণে লাল টকটকে গালা হয়ে দাঁড়িয়েছে) ধরল সেই মোমবাতির শিখায়। গালার মতই সেটা গেল গলে, আর তাই দিয়ে দোকানদার পার্সেলটা সীল করে দিল।

......তারপর হল সেই অদৃশ্য ডিম—বলতে না বলতে সে আমার কোটের ভেতর থেকে ডিম একটা বের করে আনল আর সেটাকেও পুঁটলিতে বেঁধে দিল, এবং সেই সঙ্গে ঐ 'কাঁদুনে খোকা—সত্যি-কারের', তাও একটা দিল বেঁধে। এক একটা পুঁটলি বেঁধে লোকটা আমার হাতে দিতে লাগল আর আমি সেগুলো তুলে দিলাম জিপের হাতে। জিপ তার দু'হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রাখল সে সব। জিপ মুখে বিশেষ কিছু না বললেও তার চোখের দৃষ্টি আর আঁকড়ে ধরার ধরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল তার মনের ভাবটা। মনের কথাগুলো তার মুখের ভাবে, তার সর্বশরীরে ফুটে বেরোচ্ছিল যেন। দোকানদার বলল, দেখছ কি, এগুলো সব হচ্ছে সত্যিকারের ম্যাজিক!

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম—আমার টুপির ভেতরে কি একটা যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে—বেশ নরম, নড়বড়ে! তাড়াতাড়ি টুপি থেকে এক ঝটকায় ওটাকে ফেলে দিতে গিয়ে দেখি—জলজ্যান্ত একটা পায়রা! ঝট্‌পট করে সেটা ঐ দোকানদারের কাউণ্টারে গিয়ে বসল, তারপর যেন একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে গিয়ে ঢুকল......বাক্সটা ছিল ঐ কাগজের মণ্ডের বাঘটার আড়ালে।

আহা-হা-হা, সান্ত্বনার সুরে বলে উঠল দোকানদার, বেচারা পাখী—এখানে বাসা বাঁধতে চেষ্টা করছে! এই বলে লোকটা আমার টুপিটা নিয়ে একটু ঝেড়েঝুড়ে দিতে লাগল। এ দিকে ঝাড়াপোঁছা চলছে, আর ওদিকে অনর্গল বক্ বক্ করে চলেছে লোকটা—কেন যে আজকাল ভদ্রলোকেরা তাঁদের টুপির ভেতর-বার দু'দিক পরিষ্কার করতে ভুলে

যান! কথাগুলো বলছিল খুব বিনয়ের সঙ্গেই, যদিও ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে একটুখানি খোঁচাও তার মধ্যে ছিল। পরিষ্কার করতে গিয়ে টুপিটাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে এক একবার, আর তার ভেতর থেকে একে একে বেরিয়ে আসছে দুতিনটে ডিম, প্রকাণ্ড মার্বেলের একটা ঘড়ি, প্রায় আধডজন কাঁচের গুলি (ওগুলো যেন থাকা চাই-ই), আর তারপর দোমড়ানো-কোঁকড়ানো কাগজ—বেরিয়ে আসছে ত আসছেই!

যত রাজ্যের জিনিষ এসে জমেছে, দেখুন মশাই!·· না, কেবল আপনার বেলাতেই নয়,······যত খদ্দের আসেন প্রায় সবাইকারই···। কত কি যে ভদ্রলোকেরা বয়ে বেড়ান······তাজ্জব কাণ্ড মশাই, তাজ্জব কাণ্ড! সেই কোঁচকানো দোমড়ানো কাগজ ক্রমশঃ স্তূপাকার হয়ে জমতে লাগল কাউন্টারের ওপরে,—কাগজের পাহাড় হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। লোকটা সেই পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়তে পড়তে অবশেষে একেবারেই ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু তার বকবকানির বিরাম নেই,— আড়াল থেকে তখনো তার গলা শোনা যাচ্ছে— আর বলেন কেন মশাই! দেখতে দিব্যি ভালো মানুষটি, কিন্তু কার পেটে কি যে আছে, বোঝবার জো নেই। আমাদের যেন কেবল চূণকাম করা, ধোপদুরস্ত, ফিট্‌ফাট্ চেহারাই সার···

হঠাৎ সব চুপ,—চলন্ত গ্রামোফোনের ওপরে খুব টিপ করে এক খণ্ড ঢিল মারলে যেমন হয়, সেই-রকম এক মুহূর্তে গেল সব থেমে। খস খস করে আর কাগজও জড় হচ্ছে না, সব একেবারে ঠাণ্ডা···

খানিকক্ষণ কাটল চুপচাপ।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষটায় আমি হাঁকলাম—

আমার টুপিটার কাজ শেষ হল কি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু কোন জবাব পেলাম না।

আমি তাকালাম জিপের দিকে, জিপ তাকাল আমার দিকে; সেই

অদ্ভুত আয়নাগুলোতে আমাদের ছায়া পড়তে আমাদের দেখাতে লাগল শান্ত, গম্ভীর, বোকা-বোকা, কিম্ভূতকিমাকার······

আমাদের এখন যেতে হচ্ছে, আমি বললাম। সবশুদ্ধ কত দিতে হবে আমাকে বলুন তো?

আবার হাঁকতে হল, এবার আরো জোরে—ও মশাই, শুনছেন! আমার বিলটা দিন, আর আমার টুপিটা।

এবার কাগজের স্তূপটা বেশ একটু খস্‌খসিয়ে উঠতে কেমন সন্দেহ হল।

বললাম, কাউণ্টারের পেছনটা দেখি চল তো, জিপ্! লোকটা বোধহয় আমাদের সঙ্গে তামাসা করছে।

সেই মাথা-দোলানো বাঘটার পাশ দিয়ে জিপকে নিয়ে এগোলাম। বল তো, কি দেখলাম সেখানে? দেখলাম—কেউ কোথাও নেই, আমার টুপিটা কেবল পড়ে রয়েছে মাটিতে, আর একটা লম্বা কানওয়ালা সাদা খরগোস যেন ধ্যানে বসে রয়েছে। সব বাজিকরদেরই ঐ রকমের খরগোস থাকে। খরগোসটার চোখে মুখে এমন একটা হাবাগোবা ভাব ফুটে বেরোচ্ছে, যা একমাত্র বাজিকরের খরগোসের পক্ষেই সম্ভব।

টুপিটা কুড়িয়ে নিলাম মাটি থেকে। খরগোসটাও থপ্ থপ্ করে লাফাতে লাফাতে চলে গেল এক দিকে।

বাবা! জিপ ডাকলো আমাকে চুপি চুপি, যেন কত দোষ করেছে।

কী হয়েছে, জিপ?

বাবা! এই দোকানটা আমার বেশ ভাল লাগছে বাবা।

আমারও তাই লাগত, মনে মনে বললাম,—যদি না ঐ কাউণ্টারটা এই রকম একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বেমালুম গায়েব করে ফেলত!

কিন্তু জিপকে সে সব কিছুর আভাসমাত্রও দিলাম না। খরগোসটাকে

আবার বেরিয়ে এসে থপ্‌ থপ্‌ করে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে জিপ হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকল, পু-সি !

জিপকে একটা ম্যাজিক দেখাও না, পুসি—আমিও বললাম। জিপ চেয়ে দেখছিল খরগোসটাকে, সেই সঙ্গে আমারও চোখ ছিল ওটার ওপরে। দেখলাম একটা দরজার অতি সরু ফাঁক দিয়ে অতি কষ্টে খরগোসটা গলে বেরিয়ে গেল। ওখানে যে একটা দরজা আছে, এক মুহূর্ত আগেও তা আমার নজরে পড়েনি। দরজাটা ক্রমশঃ চওড়া হতে হতে খুলে গেল আর তার ভেতর দিয়ে সেই এক কান ছোট এক কান বড় দোকানদারটি আবার এসে হাজির। তার মুখের হাসি তখনও মিলিয়ে যায়নি, কিন্তু আমার চোখে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম, হাসি-তামাসার সঙ্গে বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যও মিশে রয়েছে সেখানে।

যেন কিছুই হয়নি এমনি গোবেচারা গোছের মুখখানা করে, বিনয়-নম্র বচনে দোকানদার বলল—গরীবের দোকানখানা একটুখানি ঘুরে-ফিরে দেখবেন নাকি ? শুনেই জিপ আমার আঙুল ধরে টান লাগাল। আমি কাউন্টারটার দিকে তাকালাম, আবার দোকানদারের চোখের ওপরে চোখ পড়ল। দোকানদারের ম্যাজিকগুলো যেন একটু বেশীরকম খাঁটি ঠেকছে আমার কাছে !

সত্যি বলতে কি, খুব বেশী সময় এখন আমাদের নেই—আমি বললাম। কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই কেমন করে জানি না—দোকানদারের সঙ্গে সঙ্গে দোকানটার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছি।

এখানে যা কিছু দেখছেন, সব একেবারে পয়লা নম্বরের জিনিস,—এখানকার সব কিছু ; বেতের মত লিক্‌লিকে নরম হাত দুটো কচলাতে কচলাতে দোকানদার বলে চলল……এমন একটিও ম্যাজিকের জিনিষ পাবেন না এখানে—যাকে একেবারে খাঁটি বলা চলে না।

......মাফ করবেন - দোকানদারের কথায় চমকে তাকিয়ে দেখি, লোকটা আমার গায়ের জামার আস্তিন থেকে একটা লাল রঙের পোকা টেনে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। পোকাটার লেজ ধরে লোকটা ঝুলিয়ে রেখেছে আর সেটার সমস্ত শরীর রাগে পাক খাচ্ছে, দোকানদারের হাতে কামড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

দোকানদার বলল, মাফ করবেন,—বলেই কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে পোকাটাকে একটা কাউণ্টারের পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পরে অবশ্য বোঝা গেল—ওটা আসল পোকা নয়, রবারের তৈরী নকল পোকা মাত্র। কিন্তু প্রথমটায় দস্তুরমত ঘাবড়েই দিয়েছিল আমাদের! তা ছাড়া, দোকানদার এমন ভাবটা দেখিয়েছিল, যেন সত্যিকারের একটা পোকাই ওকে কামড়াতে যাচ্ছিল আর ও সরে সরে যাচ্ছিল। জিপের দিকে একবার তাকালাম, কিন্তু জিপ তখন তাকিয়ে ছিল একটা দোলন-খাওয়া ঘোড়ার দিকে। যাক্, ভালই হলো যে পোকাটাকে জিপ দেখতে পায়নি। শুনুন—চাপা গলায় বললাম দোকানীকে, চোখের ইসারায় জিপ আর সেই পোকাটাকে দেখিয়ে চুপিচুপি বললাম, ঐরকম বস্তু নিশ্চয়ই খুব বেশী নেই এখানে--মানে, আপনার দোকানে?

ওগুলো তো এখানকার নয় মোটেই। আপনাদের সঙ্গেই এসে থাকবে হয়ত--দোকানী চাপা গলায় জবাব দিল, আর তার মুখে ফুটে উঠল অতি ধারালো এক টুকরো হাসি।

অজান্তে কত কী না মানুষ বয়ে বেড়ায়,– ভাবলে আশ্চর্য লাগে! আবার তক্ষুনি দোকানদার জিপকে বলল—এখানে কিছু পছন্দ হচ্ছে কি তোমার, খোকা? খোকার পছন্দসই বস্তু মেলাই ছিল সেখানে। এই অদ্ভুত দোকানদারটির দিকে জিপ ফিরে তাকাল, তার ওপরে বিশ্বাসে আর শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠল। ওটা কি ভুতুড়ে তলোয়ার? —জিপ জিজ্ঞাসা করল। হ্যাঁ, ছোট্টি, খেলনা ম্যাজিক-তলোয়ার ওটা একটা। ওটা ভাঙা যায় না,—হাত পা-ও কাটা যায় না ওটা দিয়ে।

কিন্তু ওটা যার কাছে থাকবে—দোকানী বলতে লাগলো—আঠারো বছরের নীচের কোন শত্রু তাকে হারাতে পারবে না। ছোট বড় সব রকমেরই আছে। দাম হচ্ছে গিয়ে এই—আধ ক্রাউন থেকে সাত পেনি, ছ' পেনি পর্যন্ত, সাইজ অনুযায়ী। পিসবোর্ডের তৈরী এই বর্মগুলো ছোট-খাট বীরপুরুষদের খুব কাজে আসে। এই যে ঢালটা, তোমাকে সব বিপদ থেকে বাঁচাবে; এই যে চটি জোড়া—এ তোমাকে সবেগে উড়িয়ে নিয়ে যাবে; আর এই পাগড়ীটি দেখছ, এ একবার পরলেই হল;—কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না।

ও বাবা!—জিপের নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়!

ওগুলোর দাম কত পড়বে জানবার চেষ্টা করলাম দু' একবার, কিন্তু দোকানদার আমার কথাতে কানই দিল না। সে এখন জিপকেই পেয়ে বসেছে; জিপও আমার আঙুল ছেড়ে দিয়েছে। তার পুঁজিতে যত কিছু কিম্ভূত, উদ্ভট জিনিস ছিল সব সে উজাড় করে জিপের কাছে ঢেলে দিতে বসেছে; কার সাধ্য এখন তাকে থামায়! আমার আঙুলটা যেমন করে নিজের মুঠোতে চেপে ধরে, দেখলাম ঠিক তেমনি করেই চেপে ধরেছে জিপ এই লোকটার আঙুল। দেখামাত্র কেমন একটা সন্দেহ আর ঈর্ষ্যার ভাব মনটাকে নাড়া দিল। লোকটা ভারি মজাদার তাতে সন্দেহ নেই—মনে মনে ভাবলাম; যত রাজ্যের মজাদার নকল জিনিষে লোকটার দোকান ভর্তি;—সত্যিই ভারি মজার মজার নকল জিনিষ সব, কিন্তু তবু—

ওদের দু'জনের পেছনে পেছনে আমি দোকানটার ভেতরে ঘুরতে লাগলাম। কথা খুব কমই কইছিলাম, কিন্তু সর্বদাই দৃষ্টি ছিল আমার এই লম্বা লিক্‌লিকে আঙুলওয়ালা লোকটার ওপরে। আর যাই হোক, জিপ যে বেশ খুশি হয়েছে, এটা দেখছিলাম। তা ছাড়া, কতক্ষণই বা থাকব এই দোকানটাতে! একটু বাদেই ত জিপকে নিয়ে চলে যাব।

দোকানঘরটার মধ্যে নানা দিকে নানা রকম জিনিষ-পত্র এলোমেলো করে সাজানো ; এধারে ওধারে স্টল, মাঝে মাঝে থাম আর কাঠের তাকে সাজানো জিনিষ, নানা রকমের অদ্ভুত আয়না আর পর্দা—আর আঁকাবাঁকা পথ। তার মধ্যে দোকানদারের যে সব কর্মচারীরা বসে বসে জটলা পাকাচ্ছে আর কেউ সামনে দিয়ে গেলে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে—তাদের মূর্তিগুলিও একেবারে জবরজঙ। সব কিছুতে মিলে দোকানটাকে এমন করে রেখেছে যে, ওর ভেতরে খানিকটা ঘুরলে মাথা গুলিয়ে যায়। আমারও যেন কি রকম সব গোলমাল হয়ে গেল,—চট্ করে খুঁজেই পেলাম না কোন্ দিক্ দিয়ে ঢুকেছিলাম আর কোন দিক দিয়ে বেরোতে হবে।

দোকানদার তখন জিপকে ম্যাজিক-রেলগাড়ী দেখাচ্ছিল। সেগুলো চালাতে ষ্টীম কিংবা স্প্রিং কিছুরই দরকার হয়না, একবার কেবল সিগন্যাল নামিয়ে দিলেই হল, ব্যস! তারপর দেখাল খুব দামী বাক্সে ভর্তি কতকগুলো সৈন্য। বাক্সের ঢাকনাটা খুলে একটিবার শুধু বললেই হল—ব্যস, দেখবে একেবারে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে সেই সৈন্যদল! দুঃখের বিষয়, ফুস্‌মন্তরটা জিপ শুনতে পেলেও আমার শোনা হলোনা, কারণ, আমার কান ততটা সজাগ নয়। তা ছাড়া ওটা উচ্চারণ করতে জিভের কসরতও বড় কম হয়না। কিন্তু জিপের কান তার মায়ের মতই প্রখর, চট্ করেই শিখে নিতে পারল সে। বহুৎ আচ্ছা, সাবাস! দোকানদার বাহবা দিয়ে উঠল জিপকে। তক্ষুনি আবার চট্ করে সৈন্যদলকে পুরে ফেলল বাক্সর মধ্যে, তারপর সেগুলো জিপের হাতে তুলে দিল। দিয়ে বলল—আচ্ছা, দেখি কেমন পার? মুহূর্ত না যেতে জিপ তাদের জ্যান্ত করে তুলল। বাক্সটা তুমি নিয়ে যাবে? দোকানদার জিপকে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ, বাক্সটা আমরা নেব,—আমি বললাম, ওর দামটা যদি কিছু

কমিয়ে দেন ; তা না হলে—বুঝতেই পারছেন, এতগুলো জোয়ান-মার্কা সেপাই পুষতে লক্ষপতির পুঁজি—

আজ্ঞে হ্যাঁ,—তা নিশ্চয় দেব বৈকি—বলতে না বলতে দোকানদার সেপাইগুলোকে আবার বাক্সের মধ্যে পূরে ফেলল, তারপর বাক্সটা বন্ধ করে একবার একটু দোল খাওয়ালো—আর অমনি দেখা গেল, সেটা প্যাকিং কাগজে মোড়া হয়ে, ফিতে-বাঁধা হয়ে গেছে পর্যন্ত,—জিপের পূরো নাম আর ঠিকানা পর্যন্ত তার ওপরে লেখা !

আমাকে একেবারে থ' মেরে যেতে দেখে একটু হাসল দোকানদার। বলল—আজ্ঞে, এ হচ্ছে আসল ম্যাজিক। একেবারে খাঁটি জিনিষ।

এ যেন একেবারে বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের খাঁটি ঠেকছে আমার কাছে—আমি এবার বললাম।

ও তখন জিপকে নানা রকম ম্যাজিকের খেলা দেখাতে দেখাতে মেতে উঠল ; নানা রকমের অদ্ভুত, শক্ত শক্ত খেলা। তাকে সে সব বোঝাতে লাগল, উল্টেপাল্টে ম্যাজিকের ভেতরকার সব কায়দাকানুন সমঝাতে লাগল। আর তার সামনে বসে বসে ছোট ছেলেটি মাঝে মাঝে তার ছোট্ট মাথাখানি কাৎ করে পরম বিজ্ঞের মত তার মতামত জানাচ্ছিল।

আমি পূরোপুরি মন দিতে পারিনি ওদের দিকে। এই, শীগগির··· এস,···যাদুকর দোকানদারটি কাকে ডেকে উঠল, আর একটু পরেই শোনা গেল কচি গলার স্পষ্ট স্বর—এই তো যাচ্ছি ! কিন্তু আমার মন ছিল তখন অন্য দিকে।

জায়গাটা যে কি রকম সেকেলে ধরণের আর ভয়ঙ্কর অদ্ভুত, এই ভাবনাটাই আমার মনকে পেয়ে বসেছিল। সত্যি, কেবলই মনে হচ্ছিল, যেন একটা অদ্ভুত, সেকেলে, পুরানো আবহাওয়া চারিদিক থেকে এসে চেপে ধরেছে। ঘরের ছাদ, দেয়াল, মেঝে, কিংবা এলোমেলো করে এখানে-ওখানে রাখা চেয়ারগুলো—সব কিছুতে যেন লেগে রয়েছে

এই সেকেলে আর কেমন একটা অদ্ভুত রকমের গন্ধ। আমার কি রকম যেন মনে হতে লাগল যে, যখনি আমি ঐ সব জিনিষের দিকে সোজাসুজি না তাকিয়েছি, ওগুলো যেন সাঁ করে এদিকে ওদিকে সরে যাচ্ছে, নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে আর আমার পেছন দিকে গিয়ে নিঃশব্দে 'কাণামাছি' খেলা করছে। কার্ণিশটা ছিল মুখোস-ঢাকা, সাপের মত নক্সা করা; সাধারণ চুণ-বালি দিয়ে তৈরি মুখোসগুলো যে এমন জ্যান্ত দেখাবে—কে জানত!

এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়লো দোকানদারের কিম্ভুত-কিমাকার কর্মচারীদের একজনের ওপর। আমাদের থেকে একটু-খানি তফাতেই ছিল লোকটা এবং বোঝাই যাচ্ছিল, আমাদের দিকে তার নজর ছিল না। লোকটার শরীরের প্রায় বারো আনা অংশ একগাদা খেলনা পুতুলের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে ছিল লোকটা—খুব আরামের ভঙ্গীতে। তার শরীরটা নিয়ে সে যে-সব কাণ্ড করছিল, তা দেখে ত আমার চক্ষুস্থির! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করছিল ওর নাকটা নিয়ে। কোন কাজ হাতে নেই বলে সময় কাটাবার জন্যেই হয়ত ঐ রকম করছিল। প্রথমে দেখা গেল একটা ছোট্ট মোটা-সোটা নাক, তারপর হঠাৎ হুস্ করে সেটাকে টেলিস্কোপের মত লম্বা করে দিল। তারপরে ক্রমশঃ সেই নাক সরু, আরো সরু হতে হতে লম্বা, লাল টক্‌টকে, লিক্‌লিকে বেতের মত হয়ে দাঁড়াল। মনে হল যেন জেগে স্বপ্ন দেখছি!

লোকটা সেই লম্বা নাকটাকে এপাশে ওপাশে দিব্যি খেলাতে লাগল, আবার সামনের দিকেও ছুঁড়ে মারতে লাগল,—ছিপের সুতোতে টোপ গেঁথে জলে ছুঁড়ে ফেলবার মত করে।

সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, জিপ যাতে এই লোকটাকে দেখতে না পায় সে চেষ্টা করতে হবে। ফিরে তাকালাম জিপের দিকে। দেখি, সে তখনও দোকানদারের সঙ্গেই খুব জমে রয়েছে—কোনো বিদঘুটে চিন্তা

ওর মাথায় ঢুকতে পারেনি। দু'জনে কি যেন কানাকানি করছে আর তাকাচ্ছে আমার দিকে। জিপ ছিল একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে, আর দোকানদার একটা মস্ত ঢোলক হাতে নিয়ে ছিল।······চোর-চোর খেলব—বাবা! জিপ আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল - তুমি কিন্তু চোর!

ওকে থামাবার চেষ্টায় কিছু বলার আগেই দোকানদার তার হাতের সেই মস্ত বড় ঢোলকটা দিয়ে জিপকে চাপা দিয়ে দিল।

কি যে হবে এর ফলে, স্পষ্টই দেখতে পেলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম— শীগ্‌গির ওটা তুলে নিন্‌, এই মুহূর্তে। ছেলেটাকে ভয় খাওয়াবেন দেখছি। সরিয়ে নিন্‌ ওটা।

অসমান কানওয়ালা দোকানদার বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ঢোলকটা তুলে নিয়ে আমার দিকে ঘুরিয়ে দেখাল যে ওটার ভেতরটা একেবারে ফাঁকা।

দেখলাম, ঢোলকটা খালি পড়ে রয়েছে, আর এই এক মুহূর্তেই জিপ একেবারে উধাও!

একটা অজানা ভয়ঙ্কর আশঙ্কা,—একটা ভীষণ ত্রাস যেন হৃদপিণ্ড-টাকে সবলে আঁকড়ে ধরেছে···বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে,···এমনি অবস্থা মানুষের কখনো কখনো আসে। আমারও তখন ঠিক তাইই হয়েছিল।

দোকানদার তখনও দাঁত বের করে হেসে চলেছে। সোজা তার কাছে গিয়ে টুলটাতে এক লাথি মেরে একপাশে সরিয়ে দিলাম।

বললাম, রাখো ওসব বুজরুকি! আমার ছেলে কোথায়, বল?

আজ্ঞে দেখুন না—ঢোলকটার ফাঁকা দিকটা তখনও সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে,······দেখুননা, এর ভেতরে ফাঁকি কিছু নেই—

হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে যেতেই লোকটা সাঁ করে এক দিকে সরে গেল। আবার গেলাম ধরতে, ও তক্ষুনি ফিরে এক ধাক্কায় একটা দরজা খুলে ফেলে সেইখান দিয়ে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল।

দাঁড়াও—চেঁচিয়ে বললাম আমি। সে হাসতে হাসতে সরে যেতে লাগল। তক্ষুনি লাফিয়ে লোকটার পিছনে ছুটতে গিয়ে—পড়লাম গিয়ে কালো, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাজ্যে—

দড়াম্!

হা ভগবান!.........

আজ্ঞে, মাপ করবেন, আপনি ওদিক থেকে আসছিলেন, দেখতে পাইনি!

দেখলাম, রিজেন্ট ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে আছি, আর ঠোক্কর খেয়েছি এক সুদর্শন দিনমজুরের সঙ্গে। আমার থেকে প্রায় দু'হাত দূরে জিপ দাঁড়িয়ে- মুখখানা তার একেবারে কাঁচুমাচু। যেন সে কত অপরাধ করেছে, এই রকম ভাবখানা। একটু পরেই হাসি-হাসি মুখটি নিয়ে সে এল আমার কাছে; যেন মাত্র দু' দণ্ড আগেও আমাকে খুঁজে পাচ্ছিল না।

চারটে বাণ্ডিল সে দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে!

আর দেরি না করে চট করে সে আমার আঙুলটি দখল করল।

আমি যেন মুহূর্তের জন্য বোকা বনে গেলাম। চারিদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগলাম। ম্যাজিকের দোকানটার দরজাটা কোথায়—অবাক কাণ্ড! কোথাও সেটা নেই!

দরজা নেই, দোকান নেই—কোন কিছু নেই সেখানে। সেই ছবি বিক্রীর যায়গাটা আর সেই মুর্গীর ছানা দেখা যাচ্ছে যে জানালাটায়, তাদের মাঝখানে পুরোনো থামটা দাঁড়িয়ে রয়েছে!......

মনের এই অবস্থায় যা করা চলে, তাই করলাম। গাড়ী দাঁড়াবার জায়গাটাতে গিয়ে ছাতাটা তুলে ধরলাম, গাড়ী!

আনন্দে গলে গিয়ে জিপও বলে উঠল,—গাড়ী!

জিপকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমার বাড়ীর ঠিকানাটা অতি কষ্টে মনে করে ড্রাইভারকে বললাম এবং আমিও ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

কোটের পকেটে কি যেন একটা রয়েছে মনে হল, অথচ বোঝা যাচ্ছিলনা কী সেটা।

আবিষ্কার করলাম—একটা কাঁচের গুলি!

রেগে-মেগে ওটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেললাম। জিপ নির্বাক।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমরা দু'জনেই রইলাম চুপচাপ। অবশেষে জিপ বলল—বেশ ভাল দোকানেই কিন্তু গিয়েছিলাম আমরা, না বাবা?

জিপের কথায় আমার চমক ভাঙল,—তাই তো, এই সব ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে ও না জানি কি ভাবছে! কিন্তু মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, কিছুই হয়নি ওর! যাক, বাঁচা গেল তবু। বিদঘুটে কাণ্ড দেখে দেখে যে ও মনে মনে খুঁত খুঁত করছে কিংবা ভয় পেয়েছে, এমন মনে হলনা। সমস্ত বিকেলটা ওর আজ কী আনন্দে কেটেছে, এই ভাবনাতেই ও মহা খুসি। চার চারটে বড় বড় বাণ্ডিল এখন ওর বগলদাবায় রয়েছে।

কিন্তু কী আছে ওগুলোর মধ্যে? মাথা না মুণ্ডু?

বললাম, হুঁ! কিন্তু ও রকম দোকানে ছোট ছোট ছেলেরা তো রোজ যেতে পারে না! শুনে সে গম্ভীর হয়ে রইল—যেমন গম্ভীর আর নির্লিপ্ত তাকে সদাই দেখা যায়। দেখে আমার দুঃখ হল—আমি ওর বাবা, ওর মা নই,—এই ভেবে। তাই সেই ট্যাক্সির মধ্যেই তক্ষুণি ওকে একটু চুমু খেতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, এমন কিছু মন্দ নয় দোকানটা। কিন্তু আমার ধারণাই যে ঠিক, এ সম্বন্ধে বিশ্বাস আরও পাকা হয়ে গেল যখন ঐ চারটে পুঁটুলি ক্রমে ক্রমে খোলা হতে লাগল। তিনটে পুঁটুলি থেকে বেরোলো কেবল কয়েক বাক্স সেপাই—অতি সাধারণ, সীসের তৈরি মামুলি সেপাই। কিন্তু পুতুলগুলো দেখতে সত্যি খুব সুন্দর,—ওগুলো যে গোড়াতে একেবারে খাঁটি ম্যাজিক-পুতুল ছিল, জিপের সে কথা আর মনেই নেই। চার নম্বর পুঁটুলি থেকে বেরোল একটা বেড়াল-বাচ্চা। ছোট্ট ধবধপে সাদা

বাচ্চাটি,—দিব্যি মোটাসোটা; তার যেমন ক্ষিধে, তেমনি সুন্দর মেজাজ। মনে মনে একটা উদ্বেগ মেশানো স্বস্তির ভাব নিয়ে দেখছিলাম,—পুঁটলিগুলো খোলা হচ্ছে একে একে। এমনি করে কতক্ষণ যে জিপের ঘরে কেটে গেল—আমার হুঁশই ছিল না।

এই ঘটনা ঘটেছিল ছ' মাস আগে।

আমার মনে হয়, এ-সবই সত্যি। বেড়াল-বাচ্চার মধ্যে যেমন ম্যাজিকের সাধারণ গুণ থাকে—আমাদের বাচ্চাটির মধ্যেও তার চেয়ে বেশী কিছু নেই। সীসের সেপাইগুলি ঠিক তেমনি ধীর-স্থির, যেমনটি হলে খুসি হত যে-কোনও জাঁকালো সেনাপতি।

আর জিপ ?…

ওর সম্বন্ধে যে খুব হুঁশিয়ার হয়েই চলছি—আশা করি যেকোন বিচক্ষণ পিতামাতাই এটা বুঝবেন। একদিন কি করলাম, তাই বলছি। জিপকে বললাম, আচ্ছা জিপ, তোমার সেপাইগুলো যদি ব্যস্ত হয়ে ওঠে আর নিজে-নিজেই চারদিকে মার্চ করতে শুরু করে দেয়, তা হলে কেমন হয় ?

ওরা ত মার্চ করেই,……জিপ বলল—আমার জানা একটা মন্তর আছে কিনা, বাক্সর ঢাকনাটা খোলবার ঠিক আগেতে সেইটে একবার বললেই, ব্যস্।

তখন ওরা নিজেরাই মার্চ করে বেড়ায় ?

হ্যাঁ বাবা, খুব জোর্‌সে মার্চ করে ওরা। তা না করলে কি আমার ওদের ভাল লাগত !

আমি যে অত্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি—এমন ভাব ওকে দেখালাম না। এর পর থেকে মাঝেমাঝে আচমকা ওর খেলাঘরে গিয়ে হাজির হতাম; দেখতাম ওর সেপাইরা তখন মার্চ করতে বেরিয়েছে। অবশ্য

ম্যাজিক-দুরন্ত ভাবভঙ্গির কোনও লক্ষণই কোনদিন ওদের কোন কিছুতে দেখতে পাইনি।······

কাউকে এসব বুঝিয়ে বলা শক্ত। তা ছাড়া টাকা-পয়সার দিকটাও রয়েছে এর মধ্যে। পাওনাদারের বিল্ চুকিয়ে দেওয়া আমার একটা নিতান্ত বদভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়েছে বলা চলে। রিজেন্ট স্ট্রীট দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছি বেশ কয়েকবার—ঐ দোকানটার খোঁজে। আমার মনে হয় আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি—সুতরাং আমার মর্যাদাও তাতে রক্ষা পেয়েছে। তা ছাড়া, জিপের নাম আর ঠিকানা ত ওরা জেনেই গিয়েছিল! ওদের খুসিমত যে কোন দিন বিল্টা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার পথ ত ওদের খোলা রইল!

—বিনয় ঘোষ

প্রাচীরের দরজা

প্রায় মাসতিনেক আগে এক নিভৃত সন্ধ্যায় ওয়ালেস আমাকে এই কাহিনী শোনায়। তার দিক দিয়ে অন্ততঃ তখন এ কাহিনী আমার সত্য বলেই মনে হয়েছিল।

তার বিবৃতিতে যে সহজ সুর, যে স্থির প্রত্যয় ফুটে উঠেছিল, তাতে আমি তাকে বিশ্বাস না করে পারিনি। পরদিন নিজের ঘরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে ঘুম ভাঙতে শুয়ে শুয়ে তার বৃত্তান্ত চিন্তা করতে লাগলাম। তার অনুচ্চ কণ্ঠস্বরের মধুর আবেশ, সেই স্তিমিত বাতি, পারিপার্শ্বিকের আবছায়া, হোটেলের পানাহারের সুন্দর সরঞ্জাম,—দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে মুহূর্তের জন্য এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ অন্য অবস্থার মধ্যে জেগে উঠে তার কাহিনী নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কী অদ্ভুতভাবে ও আমার ওপরে মোহ বিস্তার করেছিল! ওর কাছে অন্ততঃ এতটা নিখুঁত কাজ আশা করিনি।

অথচ ওর এই অসম্ভব কাহিনীকে তো সত্য বলেই মনে হয়েছিল! বিছানায় বসে চা পান করতে করতে এই অহেতুক অনুভূতির কারণ সন্ধানে তৎপর হলাম। মনে হল, ওর এই অবাস্তব স্মৃতিকাহিনী হয়ত আমার মনের গহনে কোন অনুরূপ অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে—যে অনুভূতির প্রকাশ অন্যভাবে সম্ভব নয়।

ও আলোচনা এখন থাক। ওর বিবৃতি শোনবার পর তার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে যে সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, এত দিনে তা দূর হয়েছে। ওয়ালেস যে তার কাহিনীর যথাসম্ভব নগ্ন রূপটাই আমার কাছে তুলে ধরেছিল, এতে আর আমার সন্দেহ নেই। তবে সত্যই সে এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল, না এ কেবল তার ধারণা

মাত্র,—এবিষয়ে কোন নিশ্চিত ধারণা আমার নেই। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রশ্নের সমাধানের ওপরে যবনিকাপাত হয়েছে, এবং সেই মৃত্যুর ঘটনাবলী পর্যন্ত এ রহস্যের ওপরে কিছুমাত্র আলোকসম্পাত করে না।

সুতরাং সে বিচারের ভার পাঠকের ওপরেই রইল। আমার কোন্ মতামত, অথবা কোন্ বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিচলিত হয়ে ওর মত স্বল্পবাক্ ব্যক্তি নিজের গোপন তথ্য আমার কাছে প্রকাশ করেছিল, সে আজ আমার মনে নেই। কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে বোধহয় ওর ওপরে বিরক্ত হয়ে ওর মনোযোগ অথবা দায়িত্বজ্ঞানের ওপরে কটাক্ষপাত করেছিলাম, আর ও নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছিল। ও হঠাৎ বলে উঠেছিল, কী যেন একটা আমাকে ভয় করে রয়েছে……

কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, আমি জানি, আমি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিনি। ব্যাপারটা—ভৌতিক কিছু নয়—কিন্তু রেডমণ্ড, শুনতে হয়ত তোমার অদ্ভুত লাগবে,- এমন কিছু একটা আমাকে আশ্রয় করেছে যার প্রভাবে সমস্ত জগৎ আমার কাছে নিরানন্দ হয়ে উঠেছে,—যা আমার মধ্যে বাসনার শিখা জ্বালিয়ে তুলেছে।…

এই সুন্দর করুণ দৃশ্যের বর্ণনার সময়ে সাধারণ ইংরেজের মত ওয়ালেসও সলজ্জ হয়ে উঠল। বলল, তুমি ত চিরটা কাল এ্যাল্‌থেল্‌স্ট্যানে কাটিয়েছ। তার এই কথা আমার সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। তবে,……এই পর্যন্ত বলে সে থেমে গেল। তারপর সে শুরু করল তার জীবনের সেই গোপন অধ্যায়ের কথা। প্রথমটা ধীরে ধীরে আরম্ভ করে ক্রমশঃ সহজ ভাবে বলতে লাগল তার জীবনের সেই হারানো অধ্যায়ের কাহিনী,- যে সৌন্দর্য, যে অপার আনন্দ তার মনে বাসনার শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে, যার অভাবে সমস্ত জগৎ তার কাছে মিথ্যা, অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে ওর গোপন তথ্যের একটা সূত্র লাভ করলাম। ওর মুখের অভিব্যক্তিতেই যেন তা প্রকাশ পেল। ওর মুখের সেই অনাসক্তির

ছবি আমার ক্যামেরা নিখুঁত ভাবে ধরে রেখেছে। সেই ছবি দেখলে মনে পড়ে এক রমণী ওর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, যে রমণী ভালবাসতেন ওকে,—হঠাৎ ওর সমস্ত উৎসাহ দূর হয়ে যায়, ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিকে পর্যন্ত ও এতটুকু গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু চিরদিন ঠিক এমনটি ছিল না। এমন দিন ছিল যখন ওয়ালেসের যে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করবার অসামান্য ক্ষমতা ছিল, সাফল্যই যেন তাকে অনুসরণ করে ফিরত। পশ্চিম কেনসিংটনের সেন্ট্ এ্যালথেল্স্ট্যান কলেজে আমরা সহপাঠী ছিলাম। আমার সহপাঠী হিসাবে এসেও অতি সহজেই সে আমাকে অনেক পেছনে ফেলে গিয়েছিল, লাভ করেছিল সুদুর্লভ সম্মান, বৃত্তি। জগতের বুকে যে স্থান সে অধিকার করেছিল, তা আমার সাধ্যাতীত। তার বয়স হয়েছিল মাত্র উনচল্লিশ, কিন্তু সাধারণের ধারণা, অকালমৃত্যু না হলে এতদিনে সে নতুন মন্ত্রীসভায় স্থান পেত।

প্রথম যখন তার মুখে প্রাচীরের দরজার কথা শুনি, তখন আমরা স্কুলে পড়ি। দ্বিতীয়বার শোনবার একমাস পরেই তার মৃত্যু হয়।

তার দিক থেকে অন্ততঃ যে প্রাচীরের দরজা কবি-কল্পনা মাত্র ছিল না, ছিল সনাতন সৌন্দর্যলোকের প্রবেশপথ, এ বিষয়ে আর আজ আমার সন্দেহমাত্র নেই। আমার কাছে বসে ধীর গম্ভীর ভাবে তার কাহিনীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট তারিখের চুলচেরা হিসাবের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। একটা গাঢ় রক্তবর্ণ ভার্জিনিয়া লতা সেই সাদা প্রাচীর বেয়ে উঠেছিল। সে বলল,······কী করে জানিনা, এই ছবি আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। আরো মনে পড়ে, সবুজ দরজাটার বাইরের উঠোনের ওপরে বাদাম-জাতীয় একটা গাছের পাতা পড়ে ছিল—পাতাগুলোয় ছিল হলদে আর সবুজ রঙের ছোপ। পাতাগুলো শুকিয়ে যায়নি কিংবা ধুলোয় ময়লা হয়ে যায়নি,

সুতরাং তা থেকে অনুমান করা যায় তখন অক্টোবর মাস, কারণ প্রতিবৎসরই আমি ঐ পাতার সন্ধানে থাকতাম বলে ওর সম্বন্ধে এ খবরটুকু আমার জানা ছিল।

এ ধারণা যদি আমার সত্যি হয় তাহলে আমার বয়স তখন পাঁচ বছর চার মাস হবে।

সে বলত, ছেলেবেলা থেকেই সে বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী শিখেছিল। অদ্ভুত কম বয়সেই সে কথা বলতে পারত। এত বিজ্ঞের মত প্রাচীনদের ভঙ্গীতে সে কথা বলত যে ঐ অল্প বয়সেই সাত-আট বছরের ছেলেদের পক্ষেও দুরূহ অনেক কিছু বিষয় জানবার সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছিল। মাত্র দুবছর বয়সে সে মাতৃহীন হয়। যে নার্সের হাতে তার শুশ্রূষার ভার পড়েছিল, তার মধ্যে যথেষ্ট মনোযোগের অভাব ছিল। তার পিতা ছিলেন এক গম্ভীর প্রকৃতির আইনজীবী, নিজেকে নিয়েই সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন। পুত্রের প্রতি তাঁর যথোচিত যত্নের অভাব ছিল, কিন্তু তবুও তিনি তার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেছিলেন। ...অপূর্ব প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই জীবন ওয়ালেসের কাছে নীরস, অর্থহীন বোধ হত। একদিন সে বেরিয়ে পড়েছিল।

কোন্ অবহেলার সুযোগ নিয়ে সে গৃহত্যাগ করেছিল, অথবা পশ্চিম কেনসিংটনের কোন্ রাস্তা ধরে সে চলেছিল, সে তার মনে পড়েনা; বিস্মৃতির অমোঘ অস্পষ্টতায় আজ তা ম্লান। কিন্তু সেই সাদা প্রাচীর আর তার সবুজ দেওয়াল আজও তার স্পষ্ট মনে আছে।

ছেলেবেলার কথা ওর যতদূর মনে পড়ে, দরজাটা প্রথমবার চোখে পড়তেই ওর মনে এক অদ্ভুত আবেগের সঞ্চার হয়, দরজাটা খুলে ভিতরে যাবার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মনে হয়, এ লোভ দমন করতে না পারলে অবিবেচনার কাজ হবে। ওর স্মৃতিশক্তি যদি ওকে সম্পূর্ণভাবে প্রবঞ্চনা করে না থাকে,—

প্রথম থেকেই ওর মনে স্থির ধারণা হয়েছিল যে দরজাটা খোলাই থাকবে, সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন বাধা ছিলনা।

ছোট্ট ছেলেটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে,—এ দৃশ্য আমার কল্পনানেত্রে ভেসে উঠছে। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল (কিন্তু এ ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ সে খুঁজে পায়না) যে, সে যদি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তার বাবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।

তার মনের এই ইতস্তত ভাবের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ওয়ালেস অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছিল। দরজাটার সামনে দিয়ে চলে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে প্রাচীরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সে চলে যায়। সেখানে কয়েকটা নোংরা দোকানের কথা তার মনে পড়ে, বিশেষ করে মনে পড়ে একটা ড্রেনপাইপের দোকানের কথা,······চারিদিক ধূলোয় ধূলো, কয়েকটা মাটির পাত্র, সীসের পাত, নল, দেওয়ালের কাগজের প্যাটার্নের বই, এনামেল আর টিন,—চারিদিকে এলোমেলো ছড়ানো রয়েছে। অন্যমনস্ক ভাবে এসব লক্ষ্য করতে করতে সবুজ দেওয়ালটার কাছে যাবার বাসনা তার প্রবল হয়ে উঠল।

এমন সময়ে তার মধ্যে এক আকস্মিক আবেগের প্রাবল্য সে অনুভব করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দরজার দিকে ছুটে চলল, পাছে আবার দ্বিধায় পড়ে যায়। দুহাত বাড়িয়ে দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল, আর সে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল। চক্ষের নিমেষ ফেলতে না ফেলতেই সে সেই বাগানে গিয়ে উপস্থিত হল,—যে বাগান সারা জীবন তাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে এসেছে।

সেই বাগান সম্বন্ধে তার সম্পূর্ণ ধারণা কথায় প্রকাশ করা ওয়ালেসের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

···সেখানকার বাতাসে পর্যন্ত এমন কিছু মেশানো ছিল, যার হাল্কা সুর, সহজ সাচ্ছন্দ্য আর সমৃদ্ধি আমাকে অসীম আনন্দে অভিভূত করে তুলেছিল। প্রথম দর্শনেই সেখানকার সমস্ত কিছু সুস্পষ্ট, বর্ণবহুল

হয়ে আমার চোখে ধরা দিয়েছিল; প্রবেশমাত্রেই সুদুর্লভ আনন্দে মনপ্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেখানকার যা কিছু সব অপূর্ব সৌন্দর্যে ছাওয়া।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর ওয়ালেস্‌ আবার শুরু করল,······দেখ,······এই পর্যন্ত বলে দ্বিধাভরে সে থেমে গেল,—যেন এমন কিছু সে বলতে যাচ্ছে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেখানে দুটো বড় বড় চিতাবাঘ ছিল···· ·ভেলভেটের মত নরম গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ। আমি তাদের একটুও ভয় করলাম না। দুদিকের বাগানের মধ্যে দিয়ে যে মার্বেল-বসানো পথটা চলে গেছে, অতিকায় চিতা দুটো একটা বল নিয়ে সেখানে খেলা করছিল। তাদের একটা আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু এগিয়ে এল— মনে হল, আমার সম্বন্ধে তার কৌতূহল জেগে উঠেছে। সোজা আমার কাছে চলে এল, আমার ছোট ছোট নরম হাতে তার কান বোলাতে বোলাতে শব্দ করে উঠল। এ বাগান যে যাদুমন্ত্রে তৈরী, তাতে আর সন্দেহ কি? কি বলছ, কত বড় বাগানটা? ওঃ, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত! দূরে, অনেক দূরে পাহাড় ছিল মনে হচ্ছে—পশ্চিম কেন্‌সিংটন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে কে জানে! অথচ কেন জানিনা, এখানে এসে মনে হল আমি যেন বাড়ীতেই এসেছি।

আমি ভেতরে প্রবেশ করবার পর দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই, সেই বাগানের পাতা-বিছানো পথ, গাড়ী-ঘোড়া, সবকিছুই সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলাম। বাড়ীর শাসনের গুরুতর ভয়, যত কিছু· দ্বিধা ভয় দুশ্চিন্তা, বাস্তবজীবনের সমস্ত অনুভূতি, আমার মন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল, মুহূর্তমধ্যে আমি এক বিভিন্ন জগতের বাসিন্দায় পরিণত হলাম,— আনন্দের বিস্ময়ে মন প্রাণ ভরপুর। এ এক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জগৎ; এখানে আলোয় কোমলতা আছ, আছে সুদূরপ্রসারী শক্তি; বাতাসে আনন্দের মৃদু হিল্লোল; আকাশের নীলিমায় সূর্যকরোজ্জ্বল মেঘে অবাস্তবতার স্পর্শ। আমার সামনের বিস্তৃত পথ,······দুধারের অযত্নবর্ধিত

অথচ আগাছাবিহীন ফুলের সারি আর সেই চিতা দুটো নিয়ে হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। নিঃসঙ্কোচে ওদের নরম গায়ে আমায় ছোট্ট হাতদুটো রেখে ওদের সুডৌল কানে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করতে লাগলাম। তারপর ওদের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিলাম। ওরা যেন আমাকে বাড়ীতে অভ্যর্থনা করে এনেছে। এ যে আমার নিজের ঘর-বাড়ী, এ ধারণা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আমাকে পেয়ে বসল; তাই যখন সুন্দর লম্বা মেয়েটি পথে এসে আমাকে কোলে তুলে চুমু খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ,—আশ্চর্য হওয়া তো দূরের কথা, খুসিতে মন পূর্ণ হয়ে উঠল,—মনে হল, এই তো ঠিক, এতদিন কেন যে এ আনন্দ অবহেলা করে এসেছি! কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে বড় বড় লাল সিঁড়ি দেখা গেল। বহু পুরোনো, ছায়াবহুল গাছের মধ্যে দিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম। এই পথের ধারে এদিকে ওদিকে অনেক সম্মানসূচক মার্বেলের স্তম্ভ ছিল, আর ছিল খুব শান্ত পোষ-মানা ঘুঘুর ঝাঁক ·········

এই ছায়াশীতল পথ ধরে মেয়েটির পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তার কমনীয় মুখে অপার করুণা ফুটে উঠেছিল। তার চিবুকের সুন্দর রেখা আজও আমার মনে পড়ে,—মনে পড়ে তার ধীর মধুর কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করা, মজার মজার গল্প বলা। কিন্তু কী সে গল্প, সে আর আমার মনে নেই·········হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরণের বানর একটা গাছ থেকে আমার কাছে নেমে এসে আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে একেবারে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠল। বানরটার চোখে শান্ত দৃষ্টি, বেশ ফিটফাট চেহারা। মহা আনন্দে আমরা পথ চলতে লাগলাম।

এই পর্যন্ত বলে সে থামল।

থামলে কেন, বল।

কয়েকটা ছোটখাট ঘটনা মনে পড়ছে। এক জায়গায় লরেন

গাছের ঝোপের মধ্যে দেখলাম এক বৃদ্ধ চুপ করে বসে রয়েছে। সেখান থেকে যেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, রঙ্‌-বেরঙের ফুলের শোভায় জায়গাটা মনোরম দেখতে হয়েছে। তারপর একটা ছায়াঘন কুঞ্জ-পথ অতিক্রম করে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের কাছে এসে উপস্থিত হলাম। কী সুন্দর জায়গাটা! চারিদিকে সুন্দর সুন্দর ঝরণা, আরো কত মনোহর দৃশ্য! মনের মত আরও কত কি জিনিষ সেখানে রয়েছে! কত রকমের লোক, কত কি জিনিষ দেখলাম;—তাদের কোনটার কথা স্পষ্ট মনে রয়েছে, কোনটার স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছে। কেন জানিনা আমার মনে হল, তারা সবাই আমার ওপরে সন্তুষ্ট, আমার পেয়ে সুখী হয়েছে। তাদের বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গি, সস্নেহ দৃষ্টিপাত, তাদের কোমল স্পর্শ,—আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। সত্যি……

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে আবার সে বলতে শুরু করল—যাদের সঙ্গে আমি খেলা করতাম তারা আমাকে বড় ভালবাসত। ঘাসে ছাওয়া এক মাঠে একটা সূর্য-ঘড়ি ছিল, ফুলে ঢাকা; সেখানে কত সব সুন্দর সুন্দর খেলা আমরা খেলতাম! যত খেলতাম ততই ভাল লাগত।

কিন্তু আশ্চর্য, এর পরেই আমার স্মৃতিতে একটু ছেদ পড়েছে। কী খেলা যে খেলতাম কিছুতেই মনে পড়ে না—হাজার চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। পরে শিশুকাল অতিক্রম করে যখন কৈশোরে পদার্পণ করেছি, সেই সব ভুলে-যাওয়া খেলা মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টায় চোখে জল পর্যন্ত এসেছে, কতবার ইচ্ছে হয়েছে, একা-একাই এইসব খেলা খেলি। কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে পড়েনি। মনে পড়েছে শুধু সেই অপূর্ব সুখের স্মৃতি, আর আমার অভিন্নহৃদয় সঙ্গী দুজনের কথা।……এমন সময়ে এলেন এক শান্ত, গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ফ্যাকাশে মুখে চোখে স্বপ্নের ছায়া। তাঁর পরণে লাল রঙের নরম দীর্ঘ পোষাক, হাতে একটা বই। আমাকে

হাতছানি দিয়ে একটা বড় হলঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। আমার বন্ধুদের ইচ্ছা ছিল না আমি তাদের কাছ থেকে চলে যাই, তাই আমাকে চলে যেতে দেখে তারা খেলা ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

—ফিরে এসো, আবার শিগ্‌গিরই আমাদের কাছে ফিরে এসো, —তারা চীৎকার করে বলল। আমি মুখ তুলে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালাম, কিন্তু তিনি তা' গ্রাহ্য করলেন না, শান্ত, গম্ভীর ভাব বজায় রেখে পথ চলতে লাগলেন। তিনি গ্যালারীতে বসে বই খুলতে আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, বইতে কী আছে দেখব। পাতাগুলো খুলে-খুলে যেতে তিনি আমাকে দেখাতে লাগলেন। অবাক বিস্ময়ে আমি সেই বইয়ের পাতাগুলো লক্ষ্য করতে লাগলাম। সেই জীবন্ত বইয়ে আমি দেখলাম নিজেকে—তাতে ছিল আমারই জীবনের কাহিনী—আমার জন্ম থেকে সমস্ত ঘটনার নিখুঁত বর্ণনা।

আরো আশ্চর্য হলাম কেন জান? সেই বইয়ের পাতায় কোন ছবি ছিল না; ছিল শুধু বাস্তব ঘটনা।

একটু থেমে, গম্ভীর, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওয়ালেস্ আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

বলে যাও, আমি বললাম, আমি বুঝতে পারছি।

বাস্তব—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাস্তব সে সব ঘটনা। কত মানুষ, আরও কত কি, এল আর মিলিয়ে গেল—আমার মা, যাকে আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, আমার কঠোর, কর্তব্যনিষ্ঠ পিতা, ভৃত্যের দল, আমার খেলাঘর, আমাদের বাড়ীর বহুপরিচিত আরও অনেক কিছু। তারপর দেখলাম আমাদের সদর দরজা, জনবহুল পথে যান-বাহনের চলাচল। যত দেখি ততই চমৎকৃত হই, আবার সন্দিগ্ধ ভাবে তাকাই স্ত্রীলোকটির দিকে,—আর তাড়াতাড়ি পাতা উলটে এই অদ্ভুত বইয়ের যতটা পারি দেখে নিতে চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত এসে থামি সেই

সাদা প্রাচীরের সবুজ দরজার সামনে। আমার প্রাণে জাগে সন্দেহ, ভীতি; দ্বিধায় দুলে ওঠে মন।

তারপর, তারপর কি? চীৎকার করে উঠলাম। তাড়াতাড়ি পাতাটা ওলটাতে যাব, এমন সময় তাঁর শীতল হাতের ছোঁয়ায় বাধা পেয়ে আমাকে থামতে হল।

তারপর কী? আবার জিজ্ঞাসা করলাম; আমার কচি কচি হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে তাঁর হাত সরিয়ে দিয়ে জোর করে দেখতে চেষ্টা করলাম। তখন তিনি হাত সরিয়ে নিলেন, তারপর নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে আমার কপালে চুমু খেলেন। পাতাটা উলটে গেল।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কোথায় সেই সুন্দর বাগান, চিতা বাঘ দুটো, আর আমার খেলার সঙ্গীরা,—কোথায় সেই মেয়েটি যে আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল? এসবের কিছুই সে বইয়ে দেখা গেল না;—তার জায়গায় দেখা গেল শুধু শীতল-হয়ে-আসা অপরাহ্ণে পশ্চিম কেন্‌সিংটনের এক বিস্তৃত ধূলি-ধূসর পথ। তখনো আলো জ্বলেনি। সেখানে দেখলাম আমাকে,—ছোট খাট বেচারাটি, কিছুতেই কান্নার বেগ দমন করতে পারছিনা,—কাঁদছি, কারণ আমার খেলার সঙ্গীদের ডাকে সাড়া দিতে পারছিনা—তাদের কাছে ফিরে যেতে পারছি না। তাদের ডাক শুনতে পাচ্ছি,—ফিরে এস, শীগ্‌গির আমাদের কাছে ফিরে এস। আমি গেলাম সেখানে। কিন্তু এ তো বইয়ের পৃষ্ঠার কোন ঘটনা নয়, এ যে রূঢ় বাস্তব! কোথায় সেই মনোমুগ্ধকর বাগান, কোথায় সেই মায়ের মত স্নেহময়ী স্ত্রীলোকটি যার কোলের কাছে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, কোথায় তাঁর সেই গম্ভীরভাবে আমাকে বাধা দেওয়া? কোথায় গেল সব?

এই পর্যন্ত বলে আবার সে চুপ করল, তারপর কিছুক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেখান থেকে সেই ফিরে আসা,—সে এক অত্যন্ত দুঃখের কাহিনী···বিষণ্ণ স্বরে সে বলল।

এমনি আমার ভাগ্য, সঙ্গে সঙ্গে আবার এই নিরানন্দ জগতে ফিরে এলাম। সমস্ত ঘটনাগুলো ভালো করে চিন্তা করতেই মন নিবিড় বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। সকলের সামনে কেঁদে ফেলার অপমান, বাড়ী ফিরে আসার নিগ্রহ, আজও মনে পড়ে,—আর মনে পড়ে সেই নিরীহগোছের, সোনার চশমা পরা ভদ্রলোককে, যিনি প্রথমে ছাতার খোঁচায় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে আমার সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আহা, বেচারা ছেলেমানুষ,—পথ হারিয়ে ফেলেছ বুঝি?—আমি লণ্ডনের ছেলে, বয়স তখন সবে পাঁচ পেরিয়েছে। তিনি ঠিক করলেন, একজন ভালমানুষ, ছোকরা-গোছের পুলিশ ডেকে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন—অর্থাৎ আমার অবস্থা দেখে ভীড় জমে যাক আর কি! ভয়ে বিহ্বল হয়ে, উর্ধ্বস্বরে কাঁদতে কাঁদতে, আমি সেই বাগান থেকে বাড়ী ফিরলাম।

সেই বাগানের কথা এর বেশী আর আমার মনে পড়ে না, কিন্তু তার নেশা আজও আমার মধ্যে প্রবল রয়েছে। সেই বর্ণনাতীত অলৌকিক সৌন্দর্য, সাধারণ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সেই পরিবেশ, —এর কিছুই আমি বর্ণনায় সঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। কিন্তু এ তো স্বপ্ন নয়,—আর যদি স্বপ্নই হয় তো বলব, দিবাস্বপ্ন —স্বপ্ন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

—হুঁ, তারপর? তারপর আর কি? পিসিমা, বাবা, নার্স, এক ধার থেকে সকলের কাছ থেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে উঠলাম।······

সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করবার ফলে জীবনে এই প্রথম মিথ্যা বলার অপরাধে বাবার কাছে আমাকে প্রহার খেতে হল। পরে পিসিমার কাছেও একগুঁয়েমির জন্য শাস্তি পেয়েছিলাম। বারণ

করে দেওয়া হল সকলকে, কেউ যেন আমার কথায় কান না দেয়ঃ এবং আমার কল্পনাশক্তির উর্বরতার অপরাধে আমার রূপকথার বইগুলো পর্যন্ত আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। বিশ্বাস হচ্ছে না বোধ হয়? কিন্তু আমি যা বলছি এর প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য—বাবা অত্যন্ত সেকেলে ধরণের ছিলেন কিনা!

আমার কাহিনী কেউ বিশ্বাস না করায় তা আমার কাছেই রয়ে গেল। আমার বালিশকে আমি সে ইতিবৃত্ত শুনিয়েছি; শিশুর অশ্রুতে ভেজা বালিশের কাছে চুপি চুপি বলতে গিয়ে কতদিন জিভে নোনা স্বাদ লেগেছে। দৈনন্দিন প্রার্থনার পর প্রাণের এই নিভৃত বাসনা জানিয়েছি,—হে ঈশ্বর, আমি যেন আমার সেই বাগানের স্বপ্ন দেখি। প্রায়ই সে বাগানের স্বপ্ন দেখতাম। বাস্তবে যা দেখেছিলাম স্বপ্নে তাতে কিছু যোগ করেছি কিনা, কিংবা তার কিছু রূপান্তর ঘটেছে কিনা, তা আজ বলতে পারি না।···এ শুধু কেবল স্মরণের কণা সংগ্রহ করে করে সুদূর অতীতের আধ-ভুলে-যাওয়া এক সম্পূর্ণ বিবরণ গড়ে তোলবার চেষ্টা। বাল্যের এ ঘটনা আর তার পরবর্তী ঘটনার মধ্যে রয়েছে বিস্মৃতির যবনিকা। হতাশ হয়ে কতদিন মনে করেছি, এ যবনিকা বোধহয় কোনদিনই উদ্‌ঘাটিত হবে না।

আমার মনে স্বভাবতই যে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, তার উত্তরে ওয়ালেস বলল, না, সেই বয়সে আর কখনো সেই বাগানে ফিরে যেতে চেষ্টা করেছিলাম বলে মনে পড়ে না। আজ একথা চিন্তা করলে আশ্চর্য হয়ে যাই। হয়ত আমার চলাফেরার ওপরে কড়া নজর রাখা হয়েছিল, যাতে এই দুর্ঘটনার পরে আর আমি বিপথে যেতে না পারি।—না, তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার আগে পর্যন্ত আর কখনো সেই বাগানে যাবার চেষ্টা করিনি। এখন অবশ্য আমার নিজেরই তা বিশ্বাস হয় না;—কিন্তু আমার

জীবনে এমন এক সময়ে সত্যিই হয়ত এসেছিল যখন আমি সেই বাগানের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স বোধহয় আট কিংবা নয়।

সেণ্ট্ এ্যাল্থেলস্টানে পড়বার সময়কার আমার ছোটখাট চেহারাটা তোমার মনে পড়ে?

পড়ে বৈকি।

আমার ব্যবহারে কি এমন কিছুর আভাস তোমরা তখন পেয়েছিলে যাতে মনে হতে পারত,—আমার মনের গহনে কোন গোপন স্বপ্ন বাসা বেঁধেছে?

—দুই—

হঠাৎ হেসে মুখ তুলে তাকাল ওয়ালেস—তুমি কি কখনো আমার সঙ্গে 'উত্তর-পশ্চিম পথ' খেলা খেলেছিলে? না, তা কী করে হবে—তুমি তো আমার পথে আসতে না?

কল্পনা-বিলাসী বালকমাত্রেই সারাদিন ধরে ওই ধরণের খেলা খেলে। ব্যাপারটা হল, উত্তর-পশ্চিম পথ ধরে নতুন রাস্তায় স্কুলে পৌছোন। স্কুলে যাবার সহজ পথ তো ছিলই; কিন্তু আমাদের খেলা ছিল, এমন কোন রাস্তা আবিষ্কার করতে হবে যা মোটেই সোজাসুজি নয়। আমরা করতাম কি, প্রায় দশ মিনিট আগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এমন এক পথ ধরে চলতাম, যে-পথে স্কুলে পৌঁছোন প্রায় অসম্ভব মনে হত। অনেক অজানা পথ ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত ঠিক স্কুলে গিয়ে পৌঁছতাম।

একদিন এইভাবে চলতে চলতে ক্যাম্ডেন হিলের ওপারের বস্তির মধ্যে গিয়ে পড়লাম। মনে হল, এবারে বোধহয় খেলায় হার হল, কোন মতেই ঠিক সময়ে স্কুলে পৌছতে পারব না। শেষ পর্যন্ত

মরীয়া হয়ে এমন একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম যেখান থেকে বেরিয়ে আসবার অন্য কোন পথ আছে বলে আমার ধারণা ছিল না। যাই হোক, ভাগ্যক্রমে শেষ পর্যন্ত একটা পথ পাওয়া গেল। নতুন আশা নিয়ে সেই পথ ধরে ছুটতে লাগলাম। কয়েকটা দোকানের সামনে দিয়ে যেতে কেন জানি না তাদের পরিচিত বলে মনে হল। এমন সময় হঠাৎ সেই প্রাচীর আর তার সেই সবুজ দরজার কাছে গিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল,—সেই সুন্দর বাগান তাহলে শুধু স্বপ্নমাত্রই নয়!

একটু থেমে ওয়ালেস্ আবার শুরু করল, স্কুলের ছেলের ব্যস্ত জীবন, আর শিশুর কর্মহীন অনন্ত বিশ্রাম—এ দুয়ের মধ্যে যে কী অপরিমেয় পার্থক্য, সেই সবুজ দরজার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকেই তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে যাই হোক, এবারে কিন্তু আমার একবারও ইচ্ছা হল না সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করি। ব্যাপারটা কি জান, আমার মনে তখন একমাত্র চিন্তা, কী করে ঠিক সময়ে স্কুলে পৌছতে পারি।

স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতির খ্যাতি বজায় রাখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। সেই বাগানের লোভ একেবারে যে আমার হয়নি তা অবশ্য নয়—একটু আধটু নিশ্চয়ই হয়েছিল··· মনে পড়ে যেন, বাগানে প্রবেশের সেই লোভকে আমার স্কুলে যাবার অদম্য বাসনার বাধাস্বরূপই ধরে নিয়েছিলাম। আমার এই আবিষ্কারে অবশ্য আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম, এবং আমার মনের মধ্যেও তার ক্রিয়া চলছিল,—কিন্তু সে বাধা অগ্রাহ্য করে ঘড়িটা বের করে ছুটতে লাগলাম,—তখনো দশ মিনিট সময় রয়েছে। ঢালু পথ বেয়ে কিছুদূর যেতেই চেনা জায়গায় গিয়ে পড়লাম। ঘামে ভিজে, দম হারিয়ে হাঁপতে হাঁপাতে যখন স্কুলে পৌছলাম, তখনো স্কুল বসেনি। কোট, হ্যাট খুলে যথাস্থানে

রেখে দেওয়ার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।...দরজাটার সামনে দিয়ে এভাবে চলে যাওয়া—অত্যন্ত অদ্ভুত, নয় কি ?

চিন্তাতুর মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার সে বলতে লাগল, তখন কি জানতাম যে পরে আর দরজাটা সেখানে দেখতে পাব না ? ছোট ছেলের সীমাবদ্ধ কল্পনায় তখন হয়ত আমার মনে হয়েছিল, বাগানের পথ যখন জানা রইল, তখন আর ভাবনা কি ? ভারী মজা হবে। আপাতত তো স্কুলটা সেরে আসি ! সেদিন সকালটা আমার অত্যন্ত উদ্বেগের ওপর দিয়ে কেটেছিল, পড়াশুনোতেও বিশেষ মন দিতে পারিনি। ছুটির পরে সেই বাগানে গিয়ে যে সব অদ্ভুত, সুন্দর মানুষদের দেখা পাব, তাদের চিন্তাতেই বিভোর হয়ে ছিলাম। কেন জানি না আমার মনে হল, আমাকে পেয়ে তারা খুব খুসি হবে।...বাগানটা সেদিন আমার কাছে যেন শুধু এক সুন্দর বিশ্রামের জায়গা বলেই মনে হয়েছিল, সেখানে কেবল পড়াশুনোর চাপের মধ্যে সময় করে কখনো সখনো যাওয়া চলে।

কিন্তু সেদিন আমার যাওয়া হয়ে উঠল না। পরের দিন স্কুলের তাড়াতাড়ি ছুটি হবে একথা ভেবেই হোক, অথবা পাঠে অমনোযোগের হেতু ছুটির পর যথেষ্ট সময়ের অভাবের জন্যই হোক, সে আজ মনে নেই। এইটুকু শুধু মনে আছে, সেই অপূর্ব বাগানের স্মৃতি এত নিবিড়ভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে আমি আর তা আমার মধ্যে গোপন রাখতে পারলাম না।

সেই যে ছোট মত ছেলেটা পিটপিট করে তাকাতো,—যাকে আমরা স্কুইফ্ বলে ডাকতাম,—কি যেন নামটা তার ?

হপ্‌কিন্স, আমি বললাম।

হ্যাঁ, হপ্‌কিন্স। ঠিক যে ওকে বলতে চেয়েছিলাম তা নয় ; কেমন যেন মনে হয়েছিল, ওকে একথা জানানোটা আইন-বিরুদ্ধ কাজ হবে। আমরা দুজনে একসঙ্গে বাড়ীর পথে ফিরছিলাম।

অত্যন্ত কথা বলত সে ; সুতরাং সেই বাগানের কথা না তুললে অন্য কোন প্রসঙ্গ তুলতে হত, আর আমার তখনকার মনের অবস্থার পক্ষে অন্য কোন প্রসঙ্গের অবতারণা একেবারে অসহ্য ছিল। বাধ্য হয়েই তাই আমাকে সমস্ত কথা খুলে বলতে হল।

আমার গোপন কথা হপ্‌কিন্স ফাঁস ক'রে দিল। পরের দিন স্কুলে খেলার বিরতির সময়ে প্রায় গোটা ছয়েক বড় বড় ছেলে সেই বাগানের গল্প শোনবার জন্য কৌতূহলী হয়ে আমাকে ঘিরে ধরে। সেই বড় ছেলেটা, ফসেট,—মনে পড়ে তাকে ? কার্নেবি আর মর্লে রেনল্ডস্‌ও তাদের মধ্যে ছিল। তুমিও ছিলে নাকি ? না, তাহলে আমার মনে থাকত।

ছোট ছেলেদের অনুভূতি সাধারণ মানুষের সাপকাঠিতে একটু অদ্ভুত ধরণের মনে হয়। সত্যি বলতে কি, কথাটা বলে ফেলবার জন্যে নিজের ওপরে আন্তরিক বিরক্তি সত্ত্বেও এই সব বড় বড় ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছি বলে বেশ একটু গর্ব অনুভব করলাম। ক্রশোকে মনে পড়ে—গীতকার ক্রশোর ছেলে ? তার প্রশংসাতেই আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম সবচেয়ে বেশী। সে বলেছিল, জীবনে এত সুন্দর মিথ্যা এর আগে কখনো শোনেনি। কিন্তু আমার একান্ত নিজস্ব গোপন কথা এভাবে প্রকাশ করে দেবার জন্য লজ্জায় মন ব্যথিত হয়ে উঠল। পশু ফসেট সবুজ পোষাক পরা মেয়েটির সম্বন্ধে একটু রসিকতা করতে পর্যন্ত ছাড়ল না !

সেই লজ্জাকর ঘটনার সুস্পষ্ট স্মৃতিতে ওয়ালেসের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল। বলল, আমি এমন ভাব দেখালাম, যেন ওর কথা শুনতে পাইনি। হঠাৎ কার্নেবি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গাল দিল ; আমি যত বলতে লাগলাম আমার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্যি, ততই সে আমাকে অবিশ্বাস করতে লাগল। তখন আমি বললাম, আমি জানি দরজাটা কোথায় এবং দশ মিনিটের মধ্যে সকলকে

সেখানে নিয়ে যেতে পারি। এতে কার্ণেবি আমাকে আরো পেয়ে বসল, বলল, যদি আমি তাদের না নিয়ে যেতে পারি তো আমাকে শাস্তি পেতে হবে। কার্ণেবির হাতের মোচড় যদি কখনো খেয়ে থাক তাহলে আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে। আমি শপথ করে বললাম যে আমি যা বলেছি সব সত্যি, কিন্তু সারা স্কুলে এমন কেউ ছিল না যে কার্ণেবির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে। কেবল ক্রশোই সামান্য আপত্তি তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত কার্ণেবির কথামতই আমাকে চলতে হয়েছিল। ভয়ে, উত্তেজনায় আমার কাণ পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল। কোথায় ছুটির পর একা সেই বাগানে যাব, তার জায়গায় আমার নিজের বোকামির জন্য ছচ-ছ'টা স্কুলের ছেলেকে পথ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে হচ্ছে—মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কাণ জ্বালা করছে, চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে; আর আমার সঙ্গীরা টিটকিরি করতে করতে, শাসাতে শাসাতে আমার সঙ্গে চলেছে।

কিন্তু সাদা প্রাচীর বা তার সবুজ দরজা কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

এঁ্যা!

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না! খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না, সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম।

এর পরে কতবার একা সেখানে গিয়েছি, তবুও খুঁজে পাইনি। স্কুলে থাকতে থাকতে আরো কতবার খোঁজ করেছি, কিন্তু এক-বারের জন্যও সেই সাদা প্রাচীর বা তার সবুজ দরজার সন্ধান পাইনি—একবারের জন্যও না।

বন্ধুরা তোমার জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল তো?

ওঃ, সে কী পাশবিক ব্যবহার···। বেপরোয়া মিথ্যা বলাব অপরাধে কার্ণেবি সভা আহ্বান করল। সেই প্রহারের চিহ্ন লুকোবার জন্য কিভাবে চোরের মত বাড়ী ফিরেছিলাম, সে আমার

আজও মনে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, —প্রহারের জন্য নয়,……কেঁদেছিলাম, আমার এত সাধের সেই বাগান খুঁজে না পাওয়ার দুঃখে। কত আশা করেছিলাম বিকাল বেলাটা আনন্দে কাটবে,—সেই সুন্দর মেয়েদের দেখা পাব, আমার প্রতীক্ষমান সঙ্গীদের সঙ্গে কত খেলা খেলব, সেই ভুলে-যাওয়া সুন্দর সুন্দর খেলাগুলো আবার নতুন করে শিখে নেব!

আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, আমার গোপন রহস্য যদি প্রকাশ না করতাম,…

তারপর কিছুদিন আমার অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, —সারারাত ধরে কেবল কেঁদেছি, আর সারাদিন বিফল আশায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এমনি করে আমার দু-দুটো পরীক্ষা হয়ে গেল, ফলাফল মোটেই আশানুরূপ হয়নি। তোমার মনে আছে হয়ত, —হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মনে থাকবে—অঙ্কে তুমি আমার থেকে বেশী নম্বর পেতেই আবার আমাকে পড়াশুনোর জাঁতাকলে আবদ্ধ হতে হল।

—তিন—

কিছুক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে ওয়ালেস্ আবার শুরু করল, এর পরে যখন আমি সেই দরজা দেখি, তখন আমার বয়স সতেরো।

বৃত্তি পরীক্ষার জন্য অক্সফোর্ডের পথে প্যাডিংটন দিয়ে চলেছি, হঠাৎ তৃতীয়বারের মত দরজাটা মাত্র এক পলকের জন্য আমার সামনে দেখা দিল। সিগারেট মুখে দিয়ে গাড়ীর বাইরে তাকিয়ে মনে মনে নিজের সম্বন্ধে অনেক আকাশ-কুসুম রচনা করে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল সেই প্রাচীর, সেই দরজা,—মনে জাগল সেই সব জিনিষের স্মৃতি যা মানুষ ভুলতে পারে না অথচ যা লাভ করাও অসম্ভব নয়।

শব্দ করতে করতে আমাদের গাড়ী চলতে লাগল। বিস্ময় কাটিয়ে সজাগ হয়ে উঠতেই মোড় ফিরল গাড়ীটা। তারপর এল এক অপূর্ব মুহূর্ত,—দু'রকম বিপরীত মনোভাব একসঙ্গে আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। গাড়োয়ানকে ইসারা করে ঘড়িটা বের করলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান সাড়া দিল, আজ্ঞে স্যার ?—ইয়ে কি বলছিলাম - না, কিছু না—আমি বলে উঠলাম,—আমারই ভুল। চল চল, বেশী সময় নেই। গাড়োয়ান এগিয়ে চলল।

বৃত্তি পেলাম। তার পরদিন রাত্রে আমার ছোট ঘরে আগুনের ধারে বসে বাবার উপদেশ, বাবার সুদুর্লভ প্রশংসাবাণী শুনছি, কাণে বাজছে তাঁর যুক্তিপূর্ণ উপদেশ,—মন কিন্তু পড়ে রয়েছে সেই সাদা প্রাচীরের সবুজ দরজাটার ওপরে। মনে মনে ভাবলাম, সেদিন যদি সেই দরজার কাছে নেমে পড়তাম, তাহলে আমার বৃত্তি, অক্সফোর্ড, আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সবই নষ্ট হয়ে যেত! না গিয়ে ভালই করেছি। তন্ময় হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম,—এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ওরকম লোভ সংবরণ করা ঠিকই হয়েছে।

সেই প্রিয় বন্ধুর দল, সেই অপূর্ব পরিবেশের চিন্তা আমার অত্যন্ত মধুর লেগেছিল, কিন্তু তবুও তাদের মনে হয়েছিল নিতান্ত সুদূর পরাহত। জগতের বুকে তখন আমি সপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছি, আমার সামনে আর একটা দরজা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে - আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রবেশপথ।

আবার সে আগুনের দিকে তাকাল। আগুনের রক্তিম আভায় তার মুখের অনমনীয় দৃঢ়তার ছবি পলকের জন্য ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, আমার সে ভবিষ্যৎকে আমি সাফল্যমণ্ডিত করেছি। পরিশ্রম করেছি,—হাড়ভাঙা, কঠোর পরিশ্রম। হাজার বার সেই দরজার স্বপ্ন দেখেছি, আর তাকে প্রত্যক্ষ করেছি—আমার

সামনে ক্ষণিকের ছায়ার মত তা ফুটে উঠেছে—চারবার,—হ্যাঁ, ঠিক চারবার। পার্থিব সুখের আতিশয্যে কথনো কথনো আত্মহারা হয়ে উঠেছি, মনে হয়েছে, এ জীবন সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ। সুযোগের সদ্ব্যবহারেও বিশ্বাস করেছি, এই সুখের তুলনায় সেই বাগানের আধো-ভুলে-যাওয়া স্মৃতিও মনে হয়েছে ম্লান, কুয়াসাচ্ছন্ন। সুন্দরী মহিলার সঙ্গে, বিশিষ্ট নাগরিকের সঙ্গে ভোজে যাবার পথে কার আর ইচ্ছে হয়, গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে চিতা বাঘের পিঠে হাত বুলোই? অক্সফোর্ড থেকে অনেক উচ্চাশা নিয়ে যে লণ্ডনে এসেছি!…অথচ তবুও আমাকে হতাশ হতে হয়েছে।

…ভালবাসা দুবার আমার জীবনে এসেছে। সে কথা আর এখন তুলব না।—একটা ঘটনা বলি। এমন একজনের কাছে চলেছি, যার মনে সন্দেহ আছে আমি সাহস করে যেতে পারব কিনা। তাড়াতাড়ি হবে বলে আর্ল্স্ কোর্টের একটা জনবিরল পথ ধরে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখলাম সেই সাদা প্রাচীর আর সেই বহুপরিচিত সবুজ দরজা! কী আশ্চর্য, নিজের মনেই বলে উঠলাম, আমার তো ধারণা ছিল এ দরজা ক্যামডেন হিলে! অথচ আমার এই ধ্যানের ধনকে এতদিন কিছুতেই খুঁজে পাইনি!—সেই দরজার সামনে দিয়েই আমার গন্তব্য পথে চলে গেলাম; সেদিন আর আমার ওপরে সেই দরজার কোন আকর্ষণ ছিল না।

মুহূর্তের জন্যে কেবল ইচ্ছা হয়েছিল, একবার ভেতরে যাই, মাত্র তো তিন পদক্ষেপের ব্যবধান! আমি গেলেই যে দরজাটা তক্ষুনি খুলে যাবে, এতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, তাহলে তো আর যথাসময়ে পৌঁছতে পারব না, খেলো হয়ে যেতে হবে! এই নিয়মানুবর্তিতার জন্য পরে আমাকে অনুতাপ করতে হয়েছিল। একবার শুধু উঁকি দিয়ে দূর থেকে চিতা দুটোর উদ্দেশ্যে হাত নেড়েও তো চলে আসতে পারতাম! কিন্তু আসল কথাটা

কী জান! এটুকু জ্ঞান তখন আমার হয়েছিল যে, যা খুঁজে পাওয়া যায় না তার পেছনে ঘুরে বেড়ানো নিরর্থক। সেবার আমার সত্যিই অত্যন্ত দুঃখ হয়েছিল……।

তারপর বহু বছর কঠোর পরিশ্রম করেছি, কিন্তু একবারও সেই দরজার দেখা পাইনি। কিছুদিন হল আবার আমি তার দেখা পেয়েছি। সেই সঙ্গে এ-ও মনে হয়েছে, কিসের যেন একটা পাতলা আবরণ আমার জগৎকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে বাগান আর আমাকে দেখা দেবেনা—একথা চিন্তা করে মনে ব্যথা পেয়েছি। হয়ত অতিপরিশ্রমের ফলে অসুস্থ বোধ করছিলাম, কিংবা হয়ত, যাকে বলে,—চাল্‌শে ধরেছিল। সেই বাগানের নেশা কিছুদিন অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অনুভাব করেছিলাম।·· হ্যাঁ, আরো তিনবার আমি তা দেখেছি।

কী দেখেছ, সেই বাগান?

না, দরজাটা। অথচ একবারও প্রবেশ করিনি।

টেবলের সামনে ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত ব্যথাভরা স্বরে সে বলতে লাগল, তিনবার আমি সে সুযোগ পেয়েছিলাম,—হ্যাঁ, তিন তিনবার। প্রতিজ্ঞা করেছি, আর যদি কখনো সে দরজা দেখতে পাই,—এই ধূলিধূসর জীবনের উত্তাপ, এই প্রাণহীন আড়ম্বর, এই ব্যর্থ পরিশ্রম ত্যাগ করে চিরদিনের মত চলে যাব, আর ফিরব না। এবারে বলব,……প্রতিজ্ঞা করেছি, কিন্তু চরম মুহূর্তে পেছিয়ে পড়েছি বারবার।

গত এক বছরের মধ্যে তিনবার আমি ওই দরজার সামনে দিয়ে চলে গিয়েছি, অথচ একবারও বাগানে প্রবেশ করতে পারিনি।

প্রথম যে রাত্রে তার সামনে দিয়ে যাই, ভাড়াটিয়াদের বিষয়ে কি একটা নিয়ে সেদিন পার্লামেণ্টে ভীষণ উত্তেজনা। মাত্র তিন ভোটের জন্য গভর্মেণ্ট সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল।—তোমার মনে আছে কি?

আমাদের পক্ষের কেউ ত নয়ই, এমন কি শত্রুপক্ষেরও বিশেষ কেউই এ ধারণা করতে পারেনি। তারপরে হঠাৎ নিতান্ত সহজ ভাবেই বিতর্কের শেষ হল। হচ্‌কিসের সঙ্গে সেদিন তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা দুজনেই কুমার ছিলাম,— টেলিফোনে নিমন্ত্রিত হয়ে তার গাড়ীতে করে গেলাম। সময় অত্যন্ত অল্প ছিল। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল সেই প্রাচীর, সেই সবুজ দরজা,—চাঁদের আলোয় ফ্যাকাশে দেখতে হয়েছে, আমাদের গাড়ীর হলদে আলোর ছিটে এখানে ওখানে ফুটে উঠেছে। খুব স্পষ্ট দেখা না গেলেও এ-ই যে সেই সবুজ দরজার প্রাচীর, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। হা ঈশ্বর! আমি চীৎকার করে উঠলাম। কী ব্যাপার? হচ্‌কিস জিজ্ঞাসা করল। না, ও কিছু নয়, আমি উত্তর করলাম। লগ্ন বয়ে গেল।

ভোজসভায় প্রবেশ করে তুইপাকে বললাম, আমি একটা বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার করে এসেছি।

সে ত ওরা সকলেই করেছে, বলে তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন।

ও ক্ষেত্রে আর আমার এ ভিন্ন কীই বা করবার ছিল? এর পরে আবার যখন সেই দরজা প্রত্যক্ষ করি, তখন আমি আমার কর্তব্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার কাছে বিদায় নিতে চলেছি। কর্তব্যের দাবী সেক্ষেত্রেও ছিল অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু তৃতীয়বার সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে আমি দরজাটার দেখা পাই। এ হল এক সপ্তাহ আগেকার ঘটনা। সে কথা চিন্তা করতেও মন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যায়। গারকর আর র‍্যালফ্‌স্ আমার সঙ্গে ছিল—গারকরের সঙ্গে আমার সেই কথোপকথন, সে আর এখন গোপন নেই। ফ্রোবিশারের বাড়ীতে সেদিন আমাদের ভোজ ছিল। আলাপ আলোচনা বেশ ঘরোয়া ধরণেরই হয়ে উঠছিল—নতুন গড়ে-ওঠা মন্ত্রিসভায় আমার স্থান পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিলই যত আলোচনার বিষয়বস্তু।.........হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মীমাংসা হয়ে গেছে। এখনো অবশ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত নয়, তবুও তোমাকে জানাতে বাধা নেই।

…হ্যাঁ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ !—যাক, আমার কাহিনী আগে শোনো।

সেদিন রাত্রে কোন কিছুরই মীমাংসা হল না। আমার নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গারকরের কাছ থেকে পাকা কথা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু র‍্যালফ্‌সের উপস্থিতি বিঘ্ন ঘটাতে লাগল। যাতে খোলা-খুলিভাবে আমার সম্বন্ধে আলোচনা না হয়, সেই চেষ্টায় অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছিল। র‍্যালফ্‌সের পরবর্তী ব্যবহারে বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে আমার এ সাবধানতার প্রয়োজন ছিল। ঠিক করেছিলাম, কেন্‌সিংটন হাই স্ট্রীটের কাছ বরাবর গিয়ে র‍্যালফ্‌স্ আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করলে সেই সুযোগে হঠাৎ সরাসরি কথাটা তুলে গারকরকে হকচকিয়ে দেব। এ রকম ছোটখাট মতলবের সাহায্য মানুষকে মাঝে মাঝে গ্রহণ করতে হয়……

এ হেন সময়ে আমাদের সামনে, আমার দৃষ্টিরেখার সীমাদেশে, সেই সাদা প্রাচীর আর সেই সবুজ দরজার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম !

কথা বলতে বলতে আমরা ওর সামনে দিয়ে চলে গেলাম। আজও যেন দেখতে পাই,—গারকরের মুখের একটা দিকের, তার খাড়াই নাকের ওপরে ঝুঁকিয়ে-দেওয়া অপেরা-হ্যাটের, আর তার কাঁধের চাদরের ভাঁজগুলোর ছায়া,—আমার আর র‍্যালফ্‌সের ছায়ার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

যেখান দিয়ে আমরা চলে গেলাম, দরজাটা সেখান থেকে কুড়ি ইঞ্চিরও বেশী দূরে হবে না। মনে মনে বলেছিলাম, ওদের কাছে বিদায় নিয়ে যদি ঐ দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ি তো কেমন হয় ? কিন্তু গারকরের সঙ্গে কথাটা শেষ না করে কী করেই বা তা সম্ভব !

আরো অনেক সমস্যা এসে আসল প্রশ্নটাকে গোলমাল করে দিল। মনে হল, ওরা হয়ত আমাকে পাগল মনে করবে। আচ্ছা, আমি যদি সবার অগোচরে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাই ? 'বিখ্যাত রাজনীতিবিদের অদ্ভুত অন্তর্ধান !' এই সব চিন্তা, আরও হাজারটা

অতি তুচ্ছ বৈষয়িক বুদ্ধি, সেই পরম মুহূর্তে আমাকে এর বিপক্ষে যুক্তি দিল।

দুঃখের হাসি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে ওয়ালেস্‌ বলল, তারপর,—এই আমি।

এই আমি। আমার সুযোগ চলে গিয়েছে। এক বছরের মধ্যে তিন তিনবার সেই দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছি—যে দরজা নিয়ে যায় শান্তি ও আনন্দের দেশে, স্বপ্নাতীত সৌন্দর্যের এলাকায়, করুণার অন্তঃপুরে—যে অসীম করুণা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। আর আমি সেই দরজা প্রত্যাখ্যান করেছি, রেডমণ্ড; আর সে ফিরে আসবে না।

কেন এ কথা বলছ!

জানি, আমি জানি। যে কাজের অজুহাতে সে দরজাকে আমি এত অবহেলা করে এসেছি, সেই কাজ আজও আমার শেষ হয়নি। তুমি হয়ত বলবে, আমি সাফল্য লাভ করেছি,—এই অর্থহীন, বিরক্তিকর সাফল্য, যার জন্য আমাকে অনেকের ঈর্ষ্যাভাজন হতে হয়েছে। হ্যাঁ, সে সাফল্য আমি লাভ করেছি।—একটা আখরোট তার হাতে ধরা ছিল, সেটা দেখিয়ে বলল—এ-ই যদি আমার সাফল্য হয় তাহলে দেখ—বলে সেটা গুঁড়ো করে আমার সামনে তুলে ধরল।

একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। গত দু'মাস—দু'মাস কেন, গত দশ সপ্তাহের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ভিন্ন আমি কিছুই করিনি। যে অনুশোচনায় আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার সান্ত্বনা নেই। রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে, যখন আমাকে চিনতে পারার সম্ভাবনা অল্প, আমি বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে বেড়াই কেবল। লোকে জানতে পারলে কী বলবে কি জানি, হয়ত বলবে,…মন্ত্রিসভার একজন সভ্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি,—একটা দরজা, একটা বাগানের জন্য শোক প্রকাশ করছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে বারবার!

—চার—

তার পাণ্ডুর মুখের ছায়া এখনো যেন আমার সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে। সেই কাহিনীর বর্ণনার সময়ে যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ধূমল, অগ্নিময় জ্যোতি তার চোখে দেখা দিয়েছিল, তার স্মৃতি আজ রাত্রেও আমার কাছে স্পষ্ট। ঘরে বসে তার কথা, তার বাচনভঙ্গী মনে করবার চেষ্টা করছি,—এখনো সোফার ওপরে পড়ে রয়েছে গতরাত্রের ওয়েস্ট-মিনস্টার গেজেট, যাতে তার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ক্লাবের ভোজে আজ কেবল তার সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে।

গতকাল অতি প্রত্যুষে পূর্ব-কেনসিংটন স্টেশনের কাছে এক গভীর গর্তের মধ্যে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকে রেল লাইন বসাবার জন্য যে দুটো গর্ত করা হয়েছিল, এই গর্তটা তাদেরই একটা। জন-সাধারণের অবগতির জন্য এর ওপরে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল, আর শ্রমিকদের প্রবেশের জন্য ছিল একটা ছোট দরজা। দু'জন কুলির মধ্যে ভুল-বোঝার ফলে দরজাটা রাত্রে খোলাই ছিল, যার ফলে এই দুর্ঘটনা।

অনেক প্রশ্ন, অনেক সন্দেহের বাষ্পে আমার মন ভরে উঠেছে।

গত সেশনের অভ্যাসমত সেদিনও বোধহয় সে সমস্ত পথটা পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। কল্পনায় দেখতে পাই, আপাদমস্তক আবৃত এক ছায়ামূর্তি গভীর রাত্রে নির্জন পথ ধরে আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলেছে। স্টেশনের কাছাকাছি আসতে ইলেকট্রিকের ম্লান আলোয় কি তার বিভ্রম ঘটেছিল, না কি, সেই সর্বনাশা খোলা দরজা তার মনে কোন অতীত স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল?

প্রাচীরের গায়ে সত্যিই কি কোন খোলা দরজার অস্তিত্ব ছিল?

জানিনা। তার কাহিনী যেমনটি তার কাছে শুনেছি, ঠিক তেমনই তুলে দিলাম। কখনো মনে হয়েছে, এক অদ্ভুত ধরণের ভ্রান্তি ওয়ালেসের

মনকে আশ্রয় করেছিল,—হয়ত বা কোন ফাঁদে পড়েছিল সে। কিন্তু আমার আন্তরিক বিশ্বাস তা নয়। আপনারা হয়ত আমাকে মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করবেন, কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার প্রায় নিশ্চিত ধারণা,—কোন অলৌকিক ক্ষমতা, সুদুর্লভ কোন অনুভূতি কিংবা ঐ রকম একটা কিছু,—একটা প্রাচীর, একটা দরজার রূপ পরিগ্রহ করে দৈনন্দিন জীবনের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক সুন্দরতর জগতের পথে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত! আপনারা হয়ত বলবেন, শেষ পর্যন্ত তাকে প্রতারিত হতে হয়েছিল। এইখানেই আমরা এই সব স্বপ্নালস, কল্পনাবিলাসীদের রহস্যের সম্মুখীন হই। সাধারণের চোখে জগৎ একই রূপে দেখা দেয়, কোথাও তার খাদ, কোথাও ঢিবি। নগ্ন বাস্তবের মাপ-কাটিতে দেখতে গেলে আমরা বলব, জীবনের নিশ্চিন্ত স্বচ্ছলতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে অন্ধকারে, বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর তাতেই হল তার মৃত্যু।

কিন্তু সে নিজে কি ব্যাপারটা সেভাবে দেখেছিল?

—অমিয়কুমার চক্রবর্তী

পরলোকগত মিঃ এল্ভসহ্যামের কাহিনী

যে গল্প এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চলেছি, লোকে যে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেবে, এ আশা করি না ; তবে, আমারই মতন আর যদি কেউ বিপন্ন হন, তা হলে, সেই বিপদ এড়াবার একটা পথ খুব সম্ভবত এই গল্প থেকে তিনি খুঁজে পেতে পারেন। আমার অবস্থা, আমি বেশ ভালভাবেই জানি যে সব আশা-ভরসার বাইরে এবং এখন ভাগ্যকে স্বীকার করে নেবার মতন কথঞ্চিৎ নিজেকে প্রস্তুত করেও নিয়েছি।

আমার নাম হল এডওয়ার্ড জর্জ ইডেন। স্ট্যাফোর্ডশায়ার অঞ্চলে ট্রেণ্টহামে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার বাবা সেখানকার বাগানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যখন আমার তিন বছর বয়স সেই সময় আমার মা মারা যান, তার দুবছর পরেই বাবাকে হারাই। অগত্যা আমার কাকা জর্জ ইডেন আমাকে তাঁর নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত একক জীবন যাপন করতেন। নিজের চেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। করিৎকর্মা সাংবাদিক হিসেবে বার্মিংহামে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। আমার লেখাপড়া সম্পর্কে তিনি মুক্তহস্তে খরচ করেছিলেন এবং আমার মধ্যে তিনি জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন জগতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার কামনার শিখাকে। বছর চারেক আগে যখন তিনি পরলোক গমন করেন তখন তাঁর সমগ্র সম্পত্তি আমাকেই দিয়ে যান, সমস্ত প্রাসঙ্গিক খরচ-খরচা বাদ দিয়ে সে সম্পত্তির অঙ্ক দাঁড়ালো পাঁচশো পাউণ্ডে। তখন আমার আঠারো বছর বয়স। এই টাকাটা দিয়ে আমার অসমাপ্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার উপদেশ তিনি উইলে লিখে যান। আমি ইতিমধ্যেই ডাক্তারী পড়বার কথা ঠিক করে

রেখেছিলাম। তাঁর পরিত্যক্ত সেই দানের সাহায্যে এবং সৌভাগ্যবশত অর্জিত একটা স্কলারশিপের ভরসায় আমি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ডাক্তারী পড়বার জন্যে ভর্তি হলাম। আমার এই কাহিনী যে-সময় থেকে শুরু হয়, সে-সময় আমি ১১-এ য়ুনিভার্সিটি ষ্ট্রীটের বাড়ীর উপরতলায় একটা ছোট ঘরে বাস করছিলাম। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো······অন্ধকার, ছোট্ট ঘর। এই একটি ছোট্ট ঘরেই শোয়া-বসা সব সারতে হত, কারণ আমার হাতে সামান্য যে টাকা-কড়ি ছিল, যাতে তার পাই-পয়সাটিরও উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে আমাকে জীবনযাত্রা করতে হত।

সেদিন একজোড়া পুরাণো জুতো মেরামত করিয়ে নেবার জন্যে যখন আমি টোটেনহাম কোর্ট রোডের দোকানের অভিমুখে যাত্রা করেছি, তখন সেই খর্বাকৃতি বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। বয়সের দরুণ বৃদ্ধের মুখের রঙ হলদে হয়ে এসেছিল। আজ আমার জীবন এই বৃদ্ধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। দরজা খুলে সবে মাত্র যখন রাস্তায় নামব, দেখি, ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে বাড়ীর নম্বরের প্লেটের দিকে চেয়ে আছে। নিষ্প্রভ ধোঁয়াটে দুই চোখ—চোখের ভেতরে কোলে কোলে একটা লাল রেখা ফুটে উঠেছে। দরজা খুলে দাঁড়াতেই সোজা চোখ দুটো আমার মুখের ওপর এসে পড়ল। আমাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধের মুখে একটা বহু দিনের অভ্যস্ত সুপ্রাচীন আন্তরিকতার ছাপ ফুটে উঠল।

ঠিক মুহূর্তে তুমি এসে পড়েছ দেখছি! বৃদ্ধ বলে উঠল। তোমার বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গিয়েছিলাম। কেমন আছ মিঃ ইডেন?

এই অতি-পরিচিত সম্বোধনের ভঙ্গীতে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম, কারণ এর পূর্বে আর কোন দিন এই বৃদ্ধকে আমি চোখে দেখিনি পর্যন্ত। তা ছাড়া, বগলে ছেঁড়া জুতো নিয়ে সেই অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে

মনে রীতিমত বিরক্তিও বোধ করছিলাম। প্রত্যুত্তরে আমি যে অনুরূপ ভদ্রতা দেখাতে পারলাম না, সে জিনিষটা বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়াল না।

– কি! ভাবছ এ আপদ আবার কে এল? বিশ্বাস কর, আমি তোমার বন্ধু। যদিও তুমি আমাকে দেখো নি, কিন্তু আমি তোমাকে এর আগে দেখেছি। বলি, নিরবিলি কোন জায়গায় তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। আমার ঘরের অগোছালো কদর্যতার মধ্যে যে কোন অপরিচিত লোককে নিয়ে যাওয়া চলে না! তাই বললাম, বেশ তো, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা হতে পারে। আপাতত এখন আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া······

আমার বক্তব্যটা অঙ্গভঙ্গী দিয়েই শেষ করলাম।

বৃদ্ধ বলে উঠল, তা ঠিকই বলেছ! বলার সঙ্গে সঙ্গে এদিক এদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল।

—রাস্তায়···এঁ্যা···তাই হবে! কোন্ দিক দিয়ে তাহলে যাওয়া যাবে?

বগল থেকে পুরোণো জুতোজোড়াটা নিয়ে দরজার ভেতরে ফেলে রেখে দিলাম।

হঠাৎ বৃদ্ধ বলে উঠল, দেখ, আমি যেজন্যে তোমার কাছে এসেছি, সে ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া গোছের। তাই বলি কি, চল এক জায়গায় বসে লাঞ্চ খাওয়া যাক। দেখছ তো, আমি বুড়ো মানুষ, একান্ত বুড়ো মানুষ··· সব কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা হারিয়েছি···আর তা ছাড়া, রাস্তার এই অষ্ট-প্রহর ঘড়ঘড় শব্দের মধ্যে আমার গলার এই মিহি আওয়াজ······

আমি যাতে আর অমত না করি, বৃদ্ধ তার লোমচর্ম হাতখানি দিয়ে আমার হাত ধরে মিনতি জানাল। দেখলাম, তার হাত কাঁপছে।

অবশ্য আমার দিক থেকে আমি ততখানি বৃদ্ধ হই নি যাতে করে আর একজন বৃদ্ধ লোক তার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আমাকে আমন্ত্রণ না করতে পারে। কিন্তু এই হঠাৎ-আপ্যায়নকে আমি ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। তাই বললাম, আমি বলি কি···

কিন্তু আমাকে বলতে না দিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠল, বলতে যদি হয় আমিই বলি, আমার এই পাকা চুলের দরুণ অন্তত আমি খানিকটা সহৃদয়তা দাবী করতে পারি !

অগত্যা আমাকে রাজী হতেই হল এবং বৃদ্ধের সঙ্গেই চলতে শুরু করলাম।

বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে ব্ল্যাভিট্‌স্কীর হোটেলে গিয়ে উঠল। তার গতির সঙ্গে তাল রেখে চলবার জন্য আমাকে বাধ্য হয়েই ধীর পদক্ষেপে চলতে হচ্ছিল। খাওয়ার সময় দেখলাম, বৃদ্ধ সযত্নে আমার সমস্ত কৌতূহলী প্রশ্নকে এড়িয়ে চলতে লাগল। সেই অবকাশে বৃদ্ধের চেহারাটা আমি ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার ভাবে কামানোর দরুণ মুখটা পাতলা দেখাচ্ছিল এবং প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। ঠোঁট শুকিয়ে কুঁচকে গিয়েছে, তার ভেতর থেকে তৈরী-করা নকল দাঁতের পাটি ধরা পড়ছে। মাথার চুল সাদা হয়ে কমে এসেছে কিন্তু বেশ লম্বা···চেহারা গড়নের দিক থেকে ছোট-খাট···অবশ্য আমার দেহের তুলনায় অধিকাংশ লোককেই আমার ছোটখাট বোধ হয়। বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে দেখবার সময়, আমি বুঝলাম, বৃদ্ধও আমাকে ঠিক তেমনি ভাবে লক্ষ্য করছে। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা আশ্চর্য লোভাতুর কামনার শিখা যেন জ্বলছে ; আমার প্রশস্ত কাঁধ থেকে আরম্ভ করে রৌদ্র-পুষ্ট বলিষ্ঠ দুই বাহুর ওপর দিয়ে আমার সারা অঙ্গ যেন ক্ষুধাতুর দৃষ্টি দিয়ে বারবার লেহন করে চলেছে। সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে বলে উঠল, হ্যাঁ, এখন যে কাজের জন্যে এসেছি, সেই কাজের কথা বলা যাক্‌ !

প্রথমেই অবশ্য বলে রাখছি, আমি বৃদ্ধ। বলেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়ে আবার বলতে শুরু করল,—এবং ব্যাপারটা হচ্ছে যে, আমার কিছু টাকাকড়ি আছে, যা আমাকে অবিলম্বেই ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে হবে···তবে, দিয়ে যাব এমন কোন সন্তান-সন্ততি আমার নিজের নেই।

বৃদ্ধের কথায় আমার মনে পড়ে গেল, এইভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে ধূর্ত লোকেরা তাদের ব্যবসা চালায়। তাই আমার পাঁচশো পাউণ্ডের অবশিষ্ট যা পড়ে আছে, সে-সম্বন্ধে আমি মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলাম। তার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা বৃদ্ধ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিস্তারিত ভাবে জানাতে লাগল এবং বলল, টাকাটার ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেইজন্যে তার দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

এটা-ওটা-সেটা নানা রকমের পরিকল্পনার কথা আমি ভেবে দেখেছি; দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে যাওয়া, কোন ভাল প্রতিষ্ঠানে দেওয়া, স্কলারশিপের ব্যবস্থা কিম্বা কোন লাইব্রেরীর জন্যে দান, সবই ভেবে দেখেছি। শেষকালে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি যে,······এইখানে বৃদ্ধ আমার মুখের ওপর বদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আবার বলতে শুরু করল, আমি স্থির করেছি যে আমি এমন একজন তরুণ যুবাকে খুঁজে বার করব, দেহে ও মনে যার স্বাস্থ্য অটুট, জীবনে যার দুরাকাঙ্ক্ষা আছে, মন যার সুপবিত্র এবং অর্থের দিক থেকে যে দরিদ্র। তাকেই আমার উত্তরাধিকারী স্বরূপ আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে যাব।

শেষ কথাটার পুনরাবৃত্তি করে সে আবার বলল, তাকেই আমি সব দিয়ে যাব···তার ফলে সেই যুবা তার আদর্শের সংগ্রামের দরুণ যে দুর্ভোগ আর বিপত্তির মধ্যে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে, হঠাৎ একদিন তার ভেতর থেকে মাথা ঠেলে উঠবে, স্বাধীন জীবনে আর নিঃশঙ্ক প্রতিপত্তিতে।

নিজেকে উদাসীন দেখাবার চেষ্টা করলাম। একান্ত স্বচ্ছ আত্ম-প্রবঞ্চনার সুরে বলে উঠলাম, এবং আপনি সেই ব্যাপারে আমার সাহায্য চান, অর্থাৎ ডাক্তার হিসাবে সেই যোগ্য যুবকটিকে খুঁজে বার করতে যাতে আপনার সহায় হতে পারি?

বৃদ্ধ হেসে উঠল এবং সিগারেট খেতে খেতে এমন ভাবে আমার দিকে চাইল যাতে আমার বুঝতে বাকি রইল না যে আমার এই বিনীত আত্মপ্রবঞ্চনা বৃদ্ধ অনায়াসেই ধরে ফেলেছে। ফলে আমিও হেসে উঠলাম।

বৃদ্ধ বলে উঠল, আমি ভাবি, সেই টাকা নিয়ে সেই যুবকটি জীবনকে কতভাবেই না গড়ে তুলতে পারে! মনে মনে হিংসা হয় যখন ভাবি, আমি সারাজীবন ধরে সঞ্চয় করে গেলাম, যাতে আর একজন লোক খরচ করতে পারে!

কিন্তু কতকগুলি সর্ত অবশ্য থাকবে, কতকগুলি বোঝা তাকে বইতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধর, প্রথমে তাকে আমার নামটিকে গ্রহন করতে হবে। বিনিময়ে কোন কিছু না দিয়ে জগতে কেউ কিছুই পেতে পারে না। তাকে গ্রহণ করার আগে, তার জীবনের সমস্ত ব্যাপার তন্ন তন্ন করে আমি পরীক্ষা করে দেখব। তাকে সব রকমে বলিষ্ঠ হতে হবে। তার জন্যে আমাকে তার বংশের খবর জানতে হবে, তার বাবা ঠাকুরদা কিভাবে দেহত্যাগ করেছেন জানতে হবে, তার নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে—

বৃদ্ধের উক্তিতে মনে মনে সে সংগোপন আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম, তা যেন কমে এল। বলে উঠলাম, তাহলে কি আমি বুঝব···আপনি আমাকে······

তীব্র, উত্তেজিতভাবে বৃদ্ধ বলে উঠলো, হ্যাঁ! তুমি! তুমিই!

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না। মনের ভেতর তখন কল্পনা উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিয়েছে, আমার সমস্ত সাংসারিক নেতিবাদ কোনমতেই আর তাকে ধরে রাখতে পারছে না। মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। কী যে বলব, কিভাবেই বা তা বলব কিছুই ঠিক করে উঠতে

পারলাম না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করে উঠলাম, কিন্তু বিশেষ করে আমাকেই এ অনুগ্রহ কেন?

বৃদ্ধ তার উত্তরে জানাল, অধ্যাপক হাস্‌লারের কাছ থেকে আমার বিষয়ে সে শুনেছিল যে আমি শরীর ও মনের দিক থেকে একজন সাঁচ্চা যুবক। বৃদ্ধের বাসনা, এমন লোকের কাছেই সে তার সম্পত্তি রেখে যাবে, যেখানে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

সেই খর্বাকার বৃদ্ধের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। নিজের সম্বন্ধে বৃদ্ধ কোন রহস্যই আমাকে ভেদ করতে দিল না, এমন কি তার নামটি পর্যন্ত জানাল না। আমার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করে বৃদ্ধ হোটেলের দরজার সামনে থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেল। হোটেলের দাম চুকিয়ে দেবার সময়, আমি লক্ষ্য করলাম, বৃদ্ধ পকেট থেকে মুঠো করে কতকগুলো মোহর তুলল। দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপর বৃদ্ধের সেই অত্যাধিক ঝোঁক আমার কেমন যেন বিস্ময়কর লাগল। বৃদ্ধের সঙ্গে আমার যে বন্দোবস্ত হয়, তারই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি সেইদিনই লয়্যাল ইন্‌সিওরেন্স কম্পানীতে একটা মোটা টাকার বীমার জন্য দরখাস্ত করলাম। পরের সপ্তাহে সেই কম্পানীর ডাক্তারেরা এসে আমায় আগা-পাশ-তলা পরীক্ষা করে গেল। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বৃদ্ধ বলল, স্বনামখ্যাত ডাক্তার হেণ্ডারসনকে দিয়ে আবার নতুন করে পরীক্ষা করাতে হবে। খৃষ্ট-পর্বের সেদিন শুক্রবার, বৃদ্ধ মতিস্থির করল। তখন সন্ধ্যা উত্‌রে প্রায় ন'টা হয়ে গিয়েছে, আমি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দরুণ একমনে রসায়নের সমীকরণ নামতা মুখস্থ করছি—এমন সময় বৃদ্ধ আমাকে নীচে থেকে ডাকল। গ্যাসের বাতির ক্ষীণ আলোর তলায় বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল। আলো-ছায়ার রেখায় বৃদ্ধের মুখ বিস্ময়কর, ভয়াবহ লাগছিল। প্রথম যা দেখেছিলাম, সেদিন মনে হল বৃদ্ধ যেন

আরো কুঁজো হয়ে গিয়েছে, তার দুই গণ্ড যেন আরো ভেঙে গিয়েছে।

আবেগে তার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। সমস্ত অনুসন্ধানের ফল খুব ভালই হয়েছে মিঃ ইডেন—বৃদ্ধ বলে উঠল, চমৎকার, সত্যিই চমৎকার হয়েছে! আজ সব রাতের সেরা এই রাত, আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে খাবে এবং আজই হবে তোমার প্রাপ্তি-যোগ।

হঠাৎ কাশতে গিয়ে বৃদ্ধ থেমে গেল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে, বৃদ্ধ তার হাড়-বার-করা হাতের থাবা দিয়ে আমার হাত সজোরে ধরে বলে উঠল, তোমাকে বেশীদিন অপেক্ষা করেও থাকতে হবে না……আমি বলছি, বেশীদিন নয়……

রাস্তায় নেমে একটা গাড়ী ডাকলাম। সেইটুকু রাস্তার সব কিছুই আজ স্পষ্ট আমার মনে পড়ছে। গাড়ীর সেই স্বচ্ছন্দ দ্রুতগতি, পথ চলতে চলতে গ্যাস, তেল আর বিদ্যুতের আলোর সেই পরস্পর-পার্থক্য, রাস্তায় লোকের ভিড়, রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের যে হোটেলে আমরা গিয়ে উঠেছিলাম, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে যে-সব উপাদেয় খাদ্য আমরা গ্রহণ করেছিলাম,—সবই স্পষ্ট মনে পড়ছে। মনে পড়ে, হোটেলের সুসজ্জিত বেয়ারাগুলো যখন আমার এলোমেলো পোষাকের দিকে কটমট করে চাইছিল, সেই সময় প্রথমটা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু দেহের ভেতর শ্যাম্‌পেনের রস যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত আবার চনচনে হয়ে উঠল, নিজের ওপর আস্থা আবার ফিরে এল। গোড়ার দিকে বৃদ্ধ তার নিজের কথাই বলে চলেছিল। গাড়ীতে আসবার সময়েই বৃদ্ধ তার নাম আমাকে জানিয়েছিল। সুবিখ্যাত দার্শনিক এগবার্ট এভ্‌স্‌হ্যাম্‌, যাঁর নাম আমি স্কুলে ছাত্রাবস্থা থেকে শুনে আসছি! একথা ভাবতেই বিস্ময় লাগে যে, যাঁর অসামান্য প্রতিভা সেই বালককাল থেকেই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, আজ এইভাবে সেই সুমহান্ কল্পনার ছবি আমার সামনে এই খর্বাকার, অতিপরিচিত

বৃদ্ধের মূর্তিতে প্রকট হয়ে উঠেছে! আমার বিশ্বাস, প্রত্যেক তরুণই যখন তাদের ধ্যানের মহাপুরুষকে সহসা এইভাবে চোখের সামনে মূর্ত দেখে, তখন আমারই মতন নৈরাশ্যের বেদনা ভোগ করে। তিনি অচির-ভবিষ্যতের কথা তুলে বললেন, শীঘ্রই তাঁর শীর্ণ জীবন-ধারা শেষ হয়ে আসবে; তখন আমি তাঁর কাছ থেকে সব কিছুই পাব,—বাড়ী, কপিরাইট, বিভিন্ন কম্পানীর শেয়ার। কোনদিন আমার সুদূরতম কল্পনাতেও আমি ভাবতে পারিনি যে দার্শনিকেরা এত ধনী হয়। আমি যেভাবে পান করছিলাম এবং যে-মাত্রায় খাদ্য গ্রহন করছিলাম, আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, তিনি রীতিমত যেন তা ঈর্ষ্যার চোখে দেখছেন। তিনি বলে উঠলেন, বাঁচবার কি দুরন্ত শক্তিই না তোমার মধ্যে রয়েছে!

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, আর বেশী দেরী নেই!

আমার মাথায় তখন শ্যাম্‌পেনের তীব্র সুরা টলমল করছে। বলে উঠলাম, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন আমার সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ রয়েছে······সুন্দর বৈকি···অবশ্য আপনার অনুগ্রহের ফলেই! আজ থেকে আপনার নাম ব্যবহার করবার সৌভাগ্য আমার হবে। কিন্তু আপনার যে গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়ে গেল, তার কাছে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ অতি তুচ্ছ।

মনে হল, আমার সেই প্রসন্ন প্রশংসাবাণী যেন তিনি ঈষৎ ম্লান হাসি হেসে গ্রহণ করলেন।

হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমার সেই ভবিষ্যৎ, সত্যিই কি তুমি চাও পরিবর্ত হিসেবে দিতে?

এমন সময় বেয়ারা আরো সুরা পরিবেশন করে গেল।

আমার নাম গ্রহণ করতে তুমি রাজীই আছ—হয়ত আমার সুনাম, প্রতিপত্তিও নিতে পার, কিন্তু সত্যিই কি তুমি স্বেচ্ছায় আমার এই বার্ধক্যকে নিতে চাও?

বীরত্ব দেখিয়ে বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই, যদি তার সঙ্গে পাই আপনার কীর্তিকে!

তিনি আবার হেসে উঠলেন।

বেয়ারার দিকে চেয়ে আদেশ করলেন,······দুটো থেকেই দাও, কুমেলও দাও।

পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বার করলেন। বললেন, এক পেট খাওয়ার পর লোকে সাধারণত হাল্‌কা জিনিষ নিয়েই আলোচনা করে। আমার অপ্রকাশিত বিদ্যার মধ্যে এইটে হলো এক টুকরো একটা হাল্‌কা জিনিষ!

এই বলে কম্পান্বিত জীর্ণ হাত দিয়ে সেই কাগজের মোড়কটা খুলে তার মধ্যে খানিকটা লালচে রঙের গুঁড়ো মেশালেন।

বললেন, এই যে দেখছ, এটা যে কী, তা তুমি যা হোক অনুমান করে নিতে পার। কিন্তু এই যে এক গেলাস কুমেল্‌, এতে এই গুঁড়োর একটু ফেলে দাও, এখনি তা হয়ে যাবে হিমেল্‌।

আমার ভাবতে রীতিমত আঘাত লাগছিল যে, এতবড় একজন দার্শনিক এমনি ভাবে মদে বেসামাল হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, আমি এমনি ভাব দেখাতে চেষ্টা করলাম, যেন তাঁর এই ব্যাপারে আমার রীতিমত একটা ঔৎসুক্য জন্মেছে। আমারও মাথায় যেন মদের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই ঐ সব ছোটখাট পাগলামি সহ্য করতে আমারও কোথাও বাধছিল না।

দুটো গ্লাসেই সেই গুঁড়ো একটু একটু করে দিয়ে তিনি হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এক মহিমান্বিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং আমার দিকে আমার গেলাসটি এগিয়ে দিয়ে নিজের গেলাসটি তুলে ধরলেন। আমিও দেখাদেখি অনুরূপভাবে আমার গেলাসটি তুলে ধরলাম। দুটো গেলাসে ঠেকাঠেকি করা হল। তিনি বলে উঠলেন, যাতে অতি দ্রুত তুমি তোমার অধিকার পাও, তার জন্য এই পান-পাত্র তুললাম।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, তা কেন, তা কেন ?

গেলাসটা চিবুকের কাছে ধরে রেখে তিনি থেমে পড়লেন, তারপর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি সেই দৃষ্টির উত্তরে বলে উঠলাম, আপনার দীর্ঘ জীবন কামনায় এই পাত্র আমি তুললাম !

প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে হেসে উঠে বললেন, হ্যাঁ দীর্ঘ জীবনই বটে !

পরস্পরের চোখের ওপর চোখ রেখে আবার আমরা যে-যার গেলাস ওপরে তুলে ঠেকাঠেকি করলাম। আমি যখন এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করছিলাম, তিনি স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। পাত্র শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহের মধ্যে এক তীব্র আলোড়ন অনুভব করতে লাগলাম। তার প্রথম স্পন্দনে, বিচিত্র মনে হল, মস্তিষ্কের মধ্যে যেন উন্মাদ কলরোল শুরু হয়েছে। মাথার খুলির ভেতর থেকে কি যেন শরীরী হয়ে জেগে উঠেছে, দু'কান ভরে যেন অবিরল গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। মুখেতে কোন আস্বাদ-বোধই ছিল না। শুধু চোখে পড়ল, আমার সামনে তাঁর সেই ধূসল চোখের দৃষ্টি যেন শাণিত ছুরিকার মত আমাকে ভেদ করে চলেছে। সেই সুরা, আনুষঙ্গিক মানসিক আলোড়ন, মস্তিষ্কের ভিতর সেই কোলাহল,—যেন মনে হতে লাগল সমগ্র কালকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চেতনার সীমান্ত-রেখায় যেন অর্ধ-বিস্মৃত ঘটনার বিচিত্র সব অস্পষ্ট ছায়া নৃত্য করে চলেছে। অবশেষে বৃদ্ধ সেই মায়াজাল ছিন্ন করে একটা সু-উচ্চ দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন।

কেমন ? বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করে উঠলেন।

অপূর্ব !

মাথাটা ঘুরছিল। বসে পড়লাম। মাথার ভেতর সমস্তটা যেন এলোমেলো, গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ ধীরে চেতনা স্পষ্ট

হয়ে উঠল এবং অবতল আয়নার ভেতর দিয়ে যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সব দেখা যায়, তেমনি যেন সব দেখতে লাগলাম। বৃদ্ধের দিকে চেয়ে দেখলাম, তাঁর ভাবভঙ্গী যেন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে···চঞ্চল, ·নার্ভাস। পকেট থেকে ঘড়ি বার করে মুখবিকৃত করে বলে উঠলেন, এগারোটা-সাত! আজ রাত্রে আমাকে—নিশ্চয়ই—সাতটা-পঁচিশ······ঈস্! ওয়াটার্‌লু! আমাকে যেতেই হবে এক্ষুণি!

তাড়াতাড়ি বিল আনতে বলে কোন রকমে কোটটা গায়ে চড়িয়ে নিলেন। আমাদের সাহায্য করবার জন্য হোটেলের নিযুক্ত লোক অপেক্ষা করেই ছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম।

সেই জিনিষটা, তিনি বলে উঠলেন; তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন,—তোমাকে দেওয়া ঠিক হয়নি। কাল সকালে তার জন্যে মাথা যন্ত্রণায় ভেঙে পড়বে। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও!

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিডলিজ পাউডারের মোড়কের মতন একটা জিনিষ আমার হাতে দিয়ে বললেন, যখন শুতে যাবে, জলে গুলে একটা খেয়ে নিয়ো। এর আগে যে জিনিষটা তোমাকে দিয়েছিলাম, সেটা একটা ওষুধ। মনে থাকে, ঠিক শোবার সময় খেয়ে নেবে, কেমন? তাহলেই সকালবেলা মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্যস···দেখি হাতটা··· বিদায়, হে আমার ভবিষ্যৎ!

বৃদ্ধের চর্মসার থাবা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বৃদ্ধ বলে উঠলেন, বিদায়! বৃদ্ধের চোখের পাতা দেখলাম আরো ঝুলে পড়েছে। বুঝলাম, সেই মস্তিষ্ক-বিদারক ওষুধের প্রভাবে তিনিও কথঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

চলে যাবার মুখে বৃদ্ধ হঠাৎ নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, কি যেন হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে। বুক-পকেট হাতড়ে আর একটা মোড়ক বার করলেন। মোড়কের ভেতরের জিনিষটা কামাবার সাবানের

মতন দেখতে। এই দেখ, আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল আমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এটা খুলো না···তবে এটা এখন তোমার কাছেই রেখে দাও······

জিনিসটা এত ভারী লাগলো যে হাত থেকে পড়ে যাবার মতন হল।

বেশ···তা···ই দিন্···আমি উত্তর দিলাম। গাড়ীর জানলার ভেতর থেকে বৃদ্ধের বাঁধানো দাঁত ঝিকমিক করে উঠল।

গাড়োয়ান চাবুকে ঘোড়াকে সজাগ করে তুলতেই গাড়ী চলতে আরম্ভ করে দিল।

যে জিনিষটি বৃদ্ধ আমাকে রাখতে দিলেন, দেখলাম সেটা সাদা মোড়কে ঢাকা, দুদিকে লাল গালা দিয়ে আঁটা। ভাবলাম, এতে যদি টাকা না থাকে, তাহলে এতে নিশ্চয়ই প্ল্যাটিনাম কিংবা সীসে আছে।

বিশেষ যত্নসহকারে জিনিসটি বুক পকেটের ভেতরে রেখে দিয়ে রিজেন্ট ষ্ট্রীটের পদচারী জনতার মধ্য দিয়ে, পোর্টল্যাণ্ড রোড পেরিয়ে, অন্ধকার গলি-পথ ধরে বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কে বাড়ীর পথ ধরলাম। বাড়ী আসবার পথে যে সব বিচিত্র অনুভূতি সেদিন অনুভব করেছিলাম, আজও তার চেতনা একান্ত স্পষ্টভাবে মনে জেগে আছে। তখনো পর্যন্ত আমি নিজের সত্তার জ্ঞান এতদূর পর্যন্ত হারাই নি যে, নিজের মনে কি হচ্ছে তা বুঝতে পারব না। তাই বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, পান-পাত্রের সঙ্গে যে পদার্থটি বৃদ্ধের কাছ থেকে গলাকঃরণ করেছি, সেটা বোধহয় আফিং হবে—এমন কোন জিনিষ যার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেই সময় আমার মনের মধ্যে যে বিচিত্র আবেশের সৃষ্টি হয়, তার লক্ষণ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা আজ আমার অসাধ্য। কতকটা বলা যেতে পারে যে, আমার নিজের মধ্যে যেন তখন দুটো মনের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রিজেণ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হঠাৎ আমার মধ্যে কে যেন জোর করে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, এটা

রিজেণ্ট ষ্ট্রীট নয়, এটা হল ওয়াটার্‌লু ষ্টেশন ·····এবং সেই সঙ্গে একটা বিচিত্র বাসনা জেগে উঠছিল যে, এখনি পলিটেক্‌নিক বাড়ীতে গিয়ে উঠে পড়ি। ভাল করে একবার চোখটা রগড়ে নিলাম, হ্যাঁ এটা তো রিজেণ্ট ষ্ট্রীটই ! কী করে বোঝাব আমার তখনকার অবস্থাটা কি রকম ? ধরুণ আপনি দেখছেন, আপনার সামনে একজন প্রতিভাশালী অভিনেতা আপনার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে··· হঠাৎ অভিনেতাটি একটা মুখভঙ্গী করল, সঙ্গে সঙ্গে সে বদলে সম্পূর্ণ আলাদা লোক হয়ে গেল ! এটা কি শুনতে খুবই আজগুবি লাগবে যদি বলি রিজেণ্ট ষ্ট্রীট যেন আমার সামনে ঠিক সেই ব্যাপারটি করে তুলল ? তারপর যখন আবার ধারণা ফিরে এল যে, এটা রিজেণ্ট ষ্ট্রীটই, তখন মনের মধ্যে হঠাৎ কি যেন সব অলৌকিক স্মৃতি জেগে উঠল। ভাবতে লাগলাম, ত্রিশবছর আগে, এইখানে, আমার ভায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম ! তারপর হঠাৎ নিজের মনে হেসে উঠলাম। আমার সেই হাসি দেখে একদল নিশাচর পদচারী বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখল। হাসলাম, ত্রিশ বছর আগে আমার তো জন্মই হয়নি, আর তা ছাড়া, আমার যে ভাই বলে কেউ আছে, একথা গর্ব করেও বলতে পারি না। হয়ত যে জিনিষটা মদের সঙ্গে গ্রহণ করেছি, সেটাই মূর্তিমান তরল ভ্রান্তি ; কেননা তখনও পর্যন্ত যে ভাই আমার নেই তাকে হারানোর ব্যথা আমার মনের পেছনে ধাক্কা দিচ্ছিল। পোর্টল্যাণ্ড রোড দিয়ে যাবার সময় দেখি, আমার এই উন্মাদনা আর এক রূপ গ্রহণ করেছে। আমার মনে পড়তে লাগল, রাস্তার দুধারে আগে যে-সব দোকান ছিল, সেগুলো এখন আর নেই। মনে মনে রাস্তাটার আগেকার চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার তুলনা করতে লাগলাম। যে-মাত্রায় সুরা গ্রহণ করেছিলাম, তাতে যে চিন্তা এলোমেলোভাবে জড়িয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে, সে কথাটা বুঝতে খুব কষ্ট হল না,

কিন্তু যে চিন্তা আমাকে বিচলিত করে তুলল, সেটা হল এই,—মনের মধ্যে কোথা থেকে এই সব ছায়াময় বিচিত্র স্মৃতির তুরন্ত অভ্যুদয় সম্ভব হল? শুধু যে এই সব বিচিত্র স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল তা নয়, সেই সঙ্গে বহু স্মৃতি যেন পিছলে সরে সরে যেতে লাগল। ষ্টিভেন্‌স্-এর জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত দোকানের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম, মাথা খুঁড়ে কিছুতেই বার করতে পারলাম না, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক থাকতে পারে। পাশ দিয়ে একটা বাস্ চলে গেল, স্পষ্ট মনে হল ট্রেণের আওয়াজের কথা। হারানো স্মৃতি খুঁজে বার করবার জন্য যেন গভীর অন্ধকারময় এক গহ্বরে পড়ে গিয়েছি। অবশেষে বলে উঠলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল সে কথা দিয়েছে, তিনটে ব্যাঙ্ আমাকে এনে দেবে······আশ্চর্য, সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম······

আজও কি ছেলেদের সেই খেলা দেখানো হয়, কাঁচের ভেতর দিয়ে একটার পর একটা দৃশ্য চলে যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে? মনে পড়ে সেই ছবির খেলাতে দেখেছি, একটা ছবি প্রথমে আবছা ভূতের মতন অস্পষ্ট দেখা দেয়, তারপর সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আবার অস্পষ্ট হয়ে আর একটা ছবির সঙ্গে মিশে যায়। ঠিক সেই রকম ভাবে মনে হচ্ছিল, আমার ভেতরে আমার নিজের প্রতিদিনের সত্তার চেতনার সঙ্গে যেন সম্পূর্ণ নতুন এক সেট ভুতুড়ে চেতনা জড়িয়ে মিশিয়ে যাচ্ছিল।

ইউস্টন রোড দিয়ে টোটেনহ্যাম কোর্টে যাবার সময় কেমন যেন একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। তখন লক্ষ্যই করিনি যে, সাধারণতঃ এ-পথ দিয়ে আমি কোন দিন বাড়ী ফিরি না। সেখান থেকে ঘুরে য়ুনিভার্সিটি ষ্ট্রীটে ঢুকে মনে পড়ে গেল, তাইত, আমার বাড়ীর নম্বর তো ভুলে গিয়েছি! অনেক চেষ্টার ফলে ১১-এ নম্বর মনে পড়ল, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হল যে এই নম্বরটা একজন লোক আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেই লোকটা যে কে, তা আর মনে

পড়ল না। মনকে সুস্থির করবার জন্যে সান্ধ্য ভোজনের কথা মনে করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও যে-লোকটি আমাকে আপ্যায়িত করে খাওয়াল, তার মুখের চেহারা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। বহু চেষ্টার ফলে শুধু একটা ছায়াময় রেখা মনে পড়ল, জানলার ভেতরে যেমন নিজের অস্পষ্ট চেহারার ছায়া চোখে পড়ে। যে জায়গায় সেই লোকটির বসবার কথা, আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখলাম সেখানে যেন আমিই বসে আছি টেবিলের সামনে, মুখ-চোখ টলটল করছে···অনবরত কথা বলে চলছি।

ভাবলাম, সঙ্গে যে আর একটা পাউডার আছে, সেটা খেয়ে দেখব···এ অসম্ভব হয়ে উঠেছে!

বাতি আর দেশলাই হলের যে কোণে থাকে, আমি তার উল্টো কোণে গিয়ে খুঁজতে লাগলাম। সেই সঙ্গে মনে সন্দেহ এল, কোন্ চত্বরে আমার ঘর তা ঠিক করে উঠতে পারছিনা।

নিশ্চয়ই মাতাল হয়ে গিয়েছি, এবং সেই কথাটাই প্রমাণ করবার জন্য ইচ্ছা করেই সিঁড়ির ওপরে ভুল পা ফেলতে লাগলাম।

প্রথম চোখ পড়তেই মনে হল, এ ঘরটা যেন ঠিক আমার পরিচিত নয়। মনে মনে বলে উঠলাম, কী আজগুবি ভাবছি! এবং চারিদিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার ফলে নিজের সম্বিৎ ফিরে পেলাম এবং এতক্ষণ ধরে যে ভুতুড়ে ভাবনা মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল, দেখলাম সেই পরিচিত পরিবেশের মধ্যে সে নিঃশব্দে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেই পুরাণো আয়না, আয়নার কোণে কোণে গোঁজা আমার হাতের লেখা কাগজের টুকরো, মেঝেতে ইতঃস্তত ছড়ানো সেই আমার জীর্ণ প্রতিদিনের পোষাক,···সবই ঠিক রয়েছে তবুও কেমন যেন মনে হতে লাগল, যা দেখেছি তা যেন সত্য নয়। আমার মনের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা যেন জোর করে জেগে উঠছিল, আমি যেন একটা

ট্রেনের কামরায় বসে আছি, ট্রেণটা একটা ষ্টেশনে এসে এইমাত্র থেমেছে, আমি কামরার জানালা দিয়ে যেন আর একটা অজানা ষ্টেশনকে দেখতে পাচ্ছি। নিজের প্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আমার খাটের রেলিঙ্ জোর করে মুঠো দিয়ে ধরলাম। বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই আমি কোন প্রেত-তত্ত্ববিদের হাতে পড়ে গিয়েছি···এখুনি সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিকে লিখে জানাতে হবে।

সেই গোল পদার্থটি টেবিলের ওপর রেখে, বিছানার ওপর বসে পায়ের জুতো খুলতে লাগলাম। মনে হল, আমার সেই সময়কার মনের অবস্থার ছবি যেন সামনের আর একটা ছবির ওপর আঁকা রয়েছে। নিজেকে অভিশাপ দিয়ে বলে উঠলাম, একি, পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি ? না, একই সঙ্গে আমি দু'জায়গায় রয়েছি ?

কোনরকমে আধাআধি পোষাক খুলে সেই গুঁড়োটা একটা গেলাসে ঢেলে খেয়ে ফেললাম। গেলাসে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়োটা ফুলে ফেঁপে উঠলো···স্বচ্ছ নীলার মত রঙ। বিছানায় শোবার সময় দেখি মন শান্ত হয়ে এসেছে। দুই গাল দিয়ে মাথার বালিশটা চেপে অনুভব করে দেখলাম···তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি।

বিচিত্র সব বন্য জন্তুদের স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, বিছানায় পিঠ দিয়ে সোজা শুয়ে আছি। প্রত্যেকেই জানেন, ভয়ার্ত স্বপ্নের মধ্যে যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, জেগে উঠলেও তখনো মনের মধ্যে বিচিত্র ভয়ের ভাবনা চলতে থাকে। মুখের মধ্যে কেমন যেন বিস্বাদ বোধ হতে লাগল, সারা অঙ্গের মধ্যে তীব্র ক্লান্তি, গায়ের চামড়ায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

বালিশে মাথা রেখে চুপটি করে শুয়ে রইলাম ; মনে হল এই ভাবে কিছুক্ষণ চুপটি করে শুয়ে থাকলে এই ভয়ার্ত ভাব এবং বিচিত্র অনুভূতির চেতনা কেটে যেতে পারে এবং আবার হয়ত ঘুমিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখলাম, সেই ভয়ার্ত অনুভূতি যে বেড়েই চলেছে। কোথায়

যে কী গণ্ডগোল ঘটেছে, কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছিল, এত ক্ষীণ যে তাকে অন্ধকারের সামিলই বলা যায়। সেই ক্ষীণ আলোয় ঘরের আসবাব-পত্রগুলোকেও মনে হচ্ছিল যেন এক বিরাট অন্ধকারের বিচ্ছিন্ন সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। বিছানার চাদরের ওপর দিয়ে শুধু চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ মনে হল, আমার টাকার বাণ্ডিলটা চুরি করবার জন্য ঘরে যেন অন্য আর একজন কেউ ঢুকেছে। ঘুম আনবার চেষ্টায় নিয়মিত জোরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘুম এলো না বটে কিন্তু চোরের ভাবনা কেটে গেল। বুঝলাম, ওটা আমার কল্পনা। কিন্তু মনের মধ্যে তখনও সমান ভাবে কে যেন আমাকে বোঝাতে চাইছে যে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে। চেষ্টা করে বালিশ থেকে মাথা তুলে অন্ধকারে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলাম। কী যে দেখলাম, তা বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার চারদিকের সেই সব অস্পষ্ট আসবাবপত্রের চেহারার দিকে চেয়ে চেয়ে শুধু মনে হতে লাগল, তারা টেবিল বা আলমারী, বা বই-এর শেলফ্ নয়, তারা যেন যে-যার আকৃতি অনুযায়ী ছোট-বড়-মাঝারি রকমের টুকরো টুকরো অন্ধকার। ক্রমশঃ সেই ছিন্নভিন্ন অন্ধকারের মধ্যে সব যেন কেমন অপরিচিত মনে হতে লাগল। বিছানাটা কি ঘুরিয়ে নতুন করে পাতা হয়েছে? ঘরের ঐখানটাতে তো বই-এর শেলফ্গুলো থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে যতই চেয়ে দেখি, ততই যেন দেখতে পাই, বস্ত্রাবৃত বিবর্ণ কি একটা রয়েছে, তাকে আর যাই মনে করা যাক্, বই-এর শেলফ্ কিছুতেই মনে করা যায় না। চেয়ারের ওপরে আমার শার্টটা খুলে রেখেছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে যে জিনিষটি চোখে পড়ছে, সেটা এত লম্বা যে কিছুতেই শার্ট হতে পারে না।

শিশু-সুলভ ভয় জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, গায়ের চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নামবার জন্য পা বাড়ালাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পা-টা তো মেঝেতে গিয়ে লাগল না! তার বদলে দেখি, পা-টা বিছানার

ওপরে তোষকের কাছে গিয়ে পড়েছে। আর এক পা এগিয়ে বিছানার ধারে গিয়ে বসলাম। সাধারণতঃ আমার বিছানার ধারেই মোমবাতিটা থাকে এবং দেশলাইটা পাশের ভাঙা চেয়ারে থাকে। অভ্যাসমত হাত বাড়ালাম কিন্তু হাতে কিছুই ঠেকল না। অন্ধকারে হাত তুলতে হাতে ভারী নরম কি একটা জিনিষের স্পর্শ লাগল,—মশারির পশমি ঝালর, খুব মোটা আর নরম। হাতের সংস্পর্শে মোলায়েম খস্‌খস্‌ শব্দ উঠল। সেটা ধরে টান দিতে দেখলাম, বিছানার ওপর টাঙানো ঝালরওয়ালা মশারি।

ইতিমধ্যে চোখ থেকে ঘুমের রেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বুঝলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ঘরে আমি শুয়ে আছি। অবাক হয়ে গেলাম। রাত্রির ঘটনা মনে করতে চেষ্টা করলাম এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, এখন স্পষ্ট সব মনে পড়তে লাগল। হোটেলে খাওয়া, সেই ছোট ছোট দুটো কাগজের মোড়ক, নেশা হয়ে গিয়েছে বলে আমার দুর্ভাবনা, পোষাক ছাড়া, বালিশে মুখ দিয়ে স্পর্শ করা, সবই মনে পড়ল। হঠাৎ একটা সন্দেহ জেগে উঠল। এই যে সব ঘটনা মনে করছি, এগুলো কি গত রাত্রিতে ঘটেছিল, না তার আগের দিন রাত্রিতে ঘটেছিল? যাই হোক্‌, এটা কিন্তু সুনিশ্চিত বুঝতে পারলাম, এই ঘর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং কি করে যে এখানে এলাম, কিছুতেই মনে করে উঠতে পারলাম না। সামনে বস্ত্রাবৃত যে অস্পষ্ট রেখাময় ছায়ামূর্তি দেখছিলাম, ক্রমশ তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল,—দেখলাম, সেটা হলো একটা জানলা, জানলার ভেতর দিয়ে নকল উষার ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে একটা গোল ড্রেসিং-আয়নার ওপরে। উঠে দাঁড়ালাম। একটা অদ্ভুত দুর্বলতা অনুভব করলাম, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কম্পান্বিত দুই হাত বাড়িয়ে জানলার দিকে অগ্রসর হলাম, একটা চেয়ারে ধাক্কা লেগে হাঁটুটা ছড়ে গেল। জানলার পর্দার দড়িটা খোঁজবার জন্যে আয়নার চারদিকে হাতড়ে বেড়ালাম। পেলাম না। হঠাৎ একটা দড়ির ওপর হাত পড়তে,

টানতেই স্প্রিংএর মতন শব্দ করে জানলার পর্দাটা উঠে গেল।

জানলার বাইরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আমার চোখে সম্পূর্ণ নতুন লাগল। তখনও আকাশ আচ্ছন্ন করে রয়েছে রাত্রি,···পুঞ্জীভূত ধূম্রল স্বচ্ছ মেঘের ভিতর থেকে অদূরাগত উষার অর্ধ পদধ্বনি বেজে উঠছে। নিম্ন আকাশে মেঘের চাঁদোয়ার তলায় তলায় ক্ষীণ রক্তবলয় রেখা ফুটে উঠছে। আকাশের তলায় তখনও পর্যন্ত সব কিছু অন্ধকারে অস্পষ্ট, দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ছায়ামূর্তি, স্তরের পর স্তর সৌধচূড়া অন্ধকারে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, এখানে-ওখানে ছিটোন কালির মতন বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানলার তলায় কালো ঝোপ-ঝাপ আর ছাই-রঙা পথ এক হয়ে মিশে আছে। এত পরিচিত এই পরিবেশ যে মনে হল, হয়ত এখনো স্বপ্ন দেখছি। সামনে প্রসাধনের টেবিলটা স্পর্শ করে দেখলাম, মনে হল, রীতিমত ভাল পালিশ-করা কাঠের তৈরী, তার ওপরে ছোট ছোট কাট্‌ গ্লাসের বোতল আর একটা ব্রাস্‌ রয়েছে। একটা রেকাবির ওপর ঘোড়ার ক্ষুরের মতন গড়ন কি একটা বিচিত্র বস্তু রয়েছে···কোথাও দেশলাই বা মোমবাতি কিছুই দেখতে পেলাম না।

সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে আবার আবদ্ধ করলাম। জানলার পর্দা উঠিয়ে দেওয়ার দরুণ ঘরের ভেতরকার আসবাবপত্রের স্পষ্ট অঙ্গ-রেখা সব দেখতে পেলাম।

প্রসাধন-টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে চোখ বন্ধ করলাম, আবার খুললাম; ভাবতে চেষ্টা করতে লাগলাম। সমস্ত ব্যাপারটা এত সত্য যে স্বপ্ন বলে আর ভাবা চলে না। তখনও পর্যন্ত আমার স্মৃতির মধ্যে একটা আবর্ত চলেছে। যে সম্পত্তি আমার পাবার কথা ছিল, সে সম্পত্তি পাওয়ার ঘোষণার আনন্দে হয়ত আমার পূর্ব-স্মৃতি সমস্ত হারিয়ে ফেলেছি। হয়ত আর একটু অপেক্ষা করে থাকলেই সব জিনিষ পরিষ্কার, স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। বৃদ্ধ এভস্‌হামের সঙ্গে আমার সেই নৈশ ভোজন তখনও পর্যন্ত আমার মনে গতরাত্রির ঘটনার মত

অতি স্পষ্ট হয়ে ছিল। শ্যাম্পেন, সেই বেয়ারাগুলো আমার পোষাকের দিকে যারা চেয়েছিল, সুরার পাত্রে সেই বিচিত্র গুঁড়ো মেশানো—আমি হলফ করে বলতে পারি, কয়েক ঘণ্টা আগেই তা আমার জীবনে ঘটেছিল। তারপরে এমন একটা জিনিষ ঘটে গেল যা অতি তুচ্ছ কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর,—যা মনে করতে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, কিন্তু এখানে এলাম কি করে? সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম, এ কণ্ঠস্বর আমার নয়!

এ কণ্ঠস্বর আমার নয়; পাতলা, উচ্চারণ ভাঙা-ভাঙা, মুখের প্রত্যেক পেশীর প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র। এই উপলব্ধি যে মিথ্যা নয়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য হাতের ওপর হাত রেখে দেখলাম, চামড়া আলগা হয়ে ঝুলে পড়ছে, বার্ধক্যের হাড় নড়বড় করছে। আমার কণ্ঠে যে স্বর তখন আধিপত্য করতে শুরু করে দিয়েছে, সেই ভয়াবহ কণ্ঠস্বরেই বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এটা স্বপ্ন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখের মধ্যে আঙুলগুলো পুরে দিলাম। একটিও দাঁত নেই! থাকের পর থাক সাজানো সঙ্কুচিত মাড়ির আর্দ্র গহ্বর-গুলোর ওপর দিয়ে আঙুলগুলো ফিরে এল। আতঙ্কে ও বিরক্তিতে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

সেই সময় একটা তীব্র বাসনা আমাকে পেয়ে বসল, এই মুহূর্তে দেখতে হবে, কী ভয়াবহ পরিবর্তন আমার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে,—তার সম্পূর্ণ মূর্তি দেখতে হবে। কোন রকমে টলতে টলতে ঘরের ভিতর টেবিলের কাছে গিয়ে দেশলাই পাওয়া যায় কি না দেখতে চেষ্টা করলাম। হঠাৎ একটা তীব্র কাশি গলার ভেতর থেকে উঠল। দেখলাম আমার গায়ে একটা পুরু ফ্ল্যানেলের নাইট-গাউন রয়েছে। সেইটাই তাড়াতাড়ি জড়িয়ে নিলাম। টেবিলের ওপর দেশলাই পেলাম না। সেই সময় বুঝতে পারলাম, আমার হাত-পা, আঙুলের ডগা, সব হিম হয়ে এসেছে। নাক দিয়ে সর্দি ঝরার সঙ্গে সঙ্গে আবার কাশি সুরু হল, কাঁপতে কাঁপতে

আবার বিছানায় গিয়ে উঠলাম। বিছানায় ফিরে গিয়ে ম্লান অনুযোগের স্বরে বলে উঠলাম, নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি···স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়! বৃদ্ধেরা ঠিক এই রকম করে এক কথাই বারবার বলে। ঘাড়ের দুদিকে দুকাণ ঢেকে চাদরটা টেনে নিলাম, শীর্ণ হাত দুখানি গরম করবার জন্য বালিশের তলায় চালিয়ে দিলাম, স্থির করলাম, নিজেকে সুস্থির করে নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করব! স্বপ্ন ছাড়া এ আর কিছুই নয়। সকাল বেলা স্বপ্ন যখন ভেঙে যাবে তখন আমি আবার যথাপূর্ব যৌবনের সমস্ত শক্তি আর তেজ নিয়ে শয্যা থেকে জেগে উঠব এবং আবার পূর্ণ উদ্যমে পড়াশোনায় মন দেব। চোখ বন্ধ করে নিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু কিছুক্ষণ করার পর বুঝলাম আমি জেগেই আছি। আপনার মনে ধীরে ধীরে তিনের নামতা আওড়াতে শুরু করে দিলাম।

কিন্তু যা কামনা করলাম, তা এল না। ঘুম আর কিছুতেই এল না। পরিবর্তনের রূঢ় বাস্তবতাকে আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্যে মনের মধ্যে আবার শুরু হল চেষ্টা। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, স্পষ্ট চোখ চেয়েই শুয়ে আছি, তিনের নামতা ভুলে গিয়েছি, অস্থিসার আঙুল দিয়ে মুখের ভেতরের মাড়ির গর্তগুলি অনুভব করছি। অকস্মাৎ এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যে সত্যই আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। কোন এক অনির্দেশ্য উপায়ে আমার জীবনধারা থেকে আমি বিচ্যুত হয়ে গিয়েছি এবং সহসা বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি। কে যেন সংগোপন এক প্রক্রিয়ায় আমার জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ······আমার যৌবন, প্রেম, শক্তি, সাধনা আনন্দ ও আশা,—সমস্তই আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। অসহায়ভাবে বালিশের মধ্যে যেন ঢুকে গিয়ে আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, এরকম মায়া-পরিবর্তন সম্ভব। অগোচরে, ধীরে, বাইরে ঊষার আলো তখন স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল।

অবশেষে যখন বুঝলাম নিদ্রার আর কোন সম্ভাবনা নেই তখন বিছানায় উঠে বসলাম এবং চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। হিমেল

ঊষার আলোয় ঘরের ভিতরটার সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দেখলাম সুপ্রশস্ত ঘরে দামী দামী সব আসবাব পত্র, সে রকম আসবাব-পত্রের মধ্যে জীবনে আর কোন দিন আমি রাত কাটাইনি। এক কোণে একটা ছোট টুলের ওপর দেখলাম, মোমবাতি আর দেশলাই রয়েছে। গা থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলে দিয়ে প্রথম ঊষার সেই হিমেল আবহাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে মোমবাতিটা জ্বাললাম। তারপর ভীষণ ভাবে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে আয়নার সামনে বাতি তুলে ধরে দাঁড়িয়ে দেখলাম,—দেখলাম, আয়নার ভিতরে স্পষ্ট এভস্‌হ্যামের মুখ! যদিও মনে মনে অস্পষ্ট সেই আশঙ্কাই করেছিলাম, কিন্তু এখন তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। যখন তাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন তার দুর্বল জীর্ণ দেহ দেখে আমার মনে করুণারই উদ্রেক হয়েছিল, কিন্তু এখন শুধু একটা আলগা নাইট-গাউনের ভিতর থেকে সেই সঙ্কুচিত-স্কন্ধ জীর্ণ দেহ যখন চোখে পড়লো, যদিও বুঝলাম এখন সেটা আমারই নিজের দেহ, তবুও তার সেই অসহায় স্থবিরত্বের বর্ণনা করা আমার পক্ষেও অসম্ভব বোধ হল! গালের দুদিকে দুটো গর্ত বসে গিয়েছে, মাথায় ধূসর নোংরা চুলগুলোর ডগা ঝুলে ঝুলে পড়েছে, বাতগ্রস্ত রোগীর মত নিষ্প্রভ চোখ, ঠোঁট দুটো শুকিয়ে চুপসে গিয়ে কাঁপছে, নিচের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ভেতরের মাড়ির লাল রেখা দেখা যাচ্ছে···আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না, আমার মধ্যে সেই পৈশাচিক অবরোধের যন্ত্রণা কী মর্মান্তিক হয়েই না জেগে উঠেছিল! এই কয়েক ঘণ্টা আগে আমি ছিলাম পূর্ণ যৌবনের অধিকারী, যৌবনের আশা ও আনন্দে উদ্বেল···আর তার কয়েক ঘণ্টা পরেই···ফাঁদে পড়ে···একটা মুমূর্ষু দেহের ধ্বংসাবশেষের বোঝার চাপে নিজেকে নিষ্পেষিত করে মেরে ফেলা······

কিন্তু আমার মূল কাহিনীর ধারা থেকে আমি সরে যেতে চাই না। নিশ্চয়ই কিছুকাল ধরে নিজের এই পরিবর্তনের বেদনায় মুহ্যমান হয়ে

কাটিয়েছিলাম। দিনের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কতকটা সংহত করে নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম। বুঝলাম, কোন অজ্ঞেয় এক উপায়ে আমি এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছি; কিন্তু ম্যাজিক ছাড়া এ যে কী করে সম্ভব হল তা কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে উঠল, এভসহামের শয়তানী বিদ্যার কথা। ক্রমশঃ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি যেমন তার দেহের বোঝা বইতে বাধ্য হয়েছি, তেমনি সে আমার সমস্ত যৌবন তার নিজের দেহে ভোগ করছে···আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত যৌবন, অর্থাৎ আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ এখন তার দেহগত। কিন্তু কী করে তা প্রমাণ করব? ভাবতে ভাবতে ব্যাপারটা এমন কি আমারও কাছে এমন অবিশ্বাস্য হয়ে উঠল যে আমার সমস্ত চেতনা যেন বিলুপ্ত হয়ে আসবার মতন হল, তাই নিজেকে নিজেই চিমটি কেটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের আঙুল দিয়ে মাড়িকে অনুভব করে দেখতে হল, আমি এখনো সচেতন আছি কি না। জীবনটা কি তাহলে একটা ভোজবাজির খেলা? আমি কি সত্যিই এভসহাম হয়ে গিয়েছি? আর সে হয়েছে আমি? গতরাত্রিতে কি তাহলে আমি ইডেনের স্বপ্নই দেখছিলাম? ইডেন বলে কি সত্যি কেউ ছিল? কিন্তু আমি যদি সত্যিই এভসহাম হই, তাহলে আমার মনে পড়া উচিত, আগের দিন সকালে কোথায় ছিলাম, কোন্ শহরে আমি বাস করতাম? রাত্রিতে স্বপ্ন দেখার আগেই বা কি ঘটেছিল মনে করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কাল রাত্রিতে আমার মনের মধ্যে যে দুটো লোকের স্মরণ-শক্তির সংঘাত বেধেছিল তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কিন্তু এখন আমার মন দিব্যি পরিষ্কার। সেখানে ইডেনের স্মৃতিতে যা থাকা উচিত, তা ছাড়া আর কারুরই কোন স্মৃতির চিহ্নমাত্র নেই।

সেই পরিবর্তিত ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম······এই ভাবেই লোকে উন্মাদ হয়? কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম, কোন রকমে দুর্বল

জরাগ্রস্ত দেহটাকে মুখ-ধোবার বেসিনের কাছে নিয়ে এলাম, এক বেসিন ভর্তি ঠাণ্ডা জলে বিরল-কেশ মাথাটি ডুবিয়ে দিলাম। তারপর গামছা দিয়ে মাথা মুছে আবার ভাবতে শুরু করলাম। কোন ফলই হল না। সন্দেহাতীত ভাবে বুঝলাম, আমার দেহের মধ্যে যে মন রয়েছে, যে মন হল ইডেনের কিন্তু হায়, দেহটা এভস্‌হ্যামের !

যদি তরুণ না হয়ে অন্য যে কোন বয়সের হতাম, তা হলে হয়ত যাদুমুগ্ধ হয়ে গিয়েছি বলে কোন রকমে নিজেকে শান্ত করতে পারতাম। কিন্তু আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে যাদুবিদ্যার তো চলন নেই। এ নিশ্চয়ই মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কোন সূক্ষ্ম কায়দা। এক মোড়ক ওষুধ, আর চোখের দৃষ্টিতে যা সম্ভব হয়েছে, হয়ত সেই ওষুধ আর সেই দৃষ্টির সাহায্যে চিকিৎসায় তার প্রতিবিধানও ঘটতে পারে। মানুষ যে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে, এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু···একজনের স্মৃতির বদলে আর একজনের স্মৃতি দেওয়া-নেওয়া, ঠিক যেমন ছাতি দেওয়া-নেওয়া,······তা কি সম্ভব ? হেসে উঠলাম। হায় ! যৌবনের সে বলিষ্ঠ হাসি নয়, বার্ধক্যের খনখনে কাষ্ঠ হাসি। হয়ত বৃদ্ধ এভস্‌হ্যাম আমার অবস্থা দেখে হাসছে···এই চিন্তা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দুরন্ত ক্রোধের বহ্নি সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মেঝের চারিদিকে যে সব পোষাক পড়ে ছিল, তাই নিয়ে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন করতে শুরু করে দিলাম কিন্তু পোষাক পরেই মনে হল, এ তো সান্ধ্য-পোষাক। পোষাকের বাক্স টেনে দেখলাম, ভেতরে থানকতক সাধারণ জামা আর প্যান্ট রয়েছে, আর একজোড়া পুরানো নাইট-গাউন। বার্ধক্য-মণ্ডিত শিরে বার্ধক্য-সুশোভন একটা টুপি পরলাম। পরিশ্রমের ফলে আবার কাশি দেখা দিল। কাঁপতে কাঁপতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

তখন হয়ত সকাল ছ'টা বেজে মিনিট পনেরো হবে। চারদিকে জানলায় দরজায় তখনো পর্দা জড়ানো, সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ। ঘরের বাইরের চত্বরটি বেশ প্রশস্ত, সেখান থেকে রীতিমত দামী কার্পেটে মোড়া

একটা চওড়া সিঁড়ি নীচের অন্ধকার হলঘরের দিকে নেমে গিয়েছে। সামনেই একটা দরজা একটুখানি খোলা, দরজার ফাঁক দিয়ে একটা লেখবার ডেস্ক, একটা ঘোরানো বই-এর শেল্‌ফ, বসে পড়বার একটা চেয়ারের পেছন দিকটা, আর শেল্‌ফের ওপর থাকের পর থাক সাজানো মোটা মোটা বাঁধানো সব বই দেখা যাচ্ছিল।

ঠোঁটে ঠোঁট জড়িয়ে বলে উঠলাম, আমার পড়বার ঘর! তারপর সেই দিকে এগিয়ে চললাম। নিজের গলার আওয়াজে হঠাৎ একটা কথা মনে এলো, শোবার ঘরে ফিরে গেলাম। একসেট নকল দাঁত পড়ে ছিল, সেটা পরলাম। পুরাণো অভ্যাসের মতন সেটা চমৎকার বসে গেল। দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম, তা মন্দ নয়!

পড়বার ঘরে এসে দেখলাম ডেস্কের ড্রয়ারগুলোতে চাবি দেওয়া। ডেস্কের ঘোরানো মাথাটাও বন্ধ। কোথাও চাবি দেখতে পেলাম না। জামার পকেট হাতড়ালাম, পেলাম না। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে নাইট-গাউনের পকেট, ইতস্ততঃ যে দু'একটা জামা পড়েছিল, তাদের পকেট হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম। চাবিটার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে ঘরটার যে অবস্থা করলাম, লোকে দেখলে মনে করত যে, রাত্রিতে নিশ্চয়ই ঘরে চোর ঢুকেছিল। চাবি ত পাওয়াই গেল না, একটা সামান্য পেনি বা এক টুকরো কোন কাগজ, কিছুই হাতে ঠেকল না। শুধু গত রাত্রির ডিনারের বিলটা দেখতে পেলাম।

একটা বিচিত্র অবসাদ সারা অঙ্গে নেমে এল। বসে পড়লাম, পোযাক-পত্র যেদিকে খুশি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। জামার পকেটগুলো সব ওলটানো, সেই দিকেই এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আমার প্রথম উন্মাদনার ধাক্কা তখন কেটে গিয়েছে বুঝলাম। যতই চিন্তা করি, ততই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি, আমার সেই শত্রু আমাকে ধরবার জন্যে যে ফাঁদ পেতেছিল, তার পিছনে ছিল কী বিপুল বুদ্ধি। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, কী অসহায় অবস্থায় না আমি পড়েছি! চেষ্টা করে আবার

উঠে দাঁড়ালাম এবং তাড়াতাড়ি পড়বার ঘরে আবার গিয়ে ঢুকলাম। সিঁড়ির ওপর দেখলাম একজন পরিচারিকা পর্দাগুলো টেনে সরিয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে আমার দিকে চোখ বার করে চেয়ে রইল। মনে হল, আমার মুখের ভঙ্গী দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। একটা কাঠি তুলে নিয়ে ডেস্কটা ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগলাম। তারা যখন আমাকে খুঁজে বার করে তখন দেখতে পায়, ডেস্কের ঢাকনাটা জোর করে ভাঙা, ভেতরে চিঠির খোপ থেকে চিঠিগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অসহায় বার্ধক্যের ক্রোধে, টেবিলের ওপর হাল্কা যে সব জিনিষ পেয়েছি সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি. দোয়াতটা উল্‌টে কালি ছিটিয়েছি। একটা বড় টব টেবিলের কাছে ছিল, সেটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে। কী করে ভেঙেছে তা জানি না। চেক বই বা টাকাকড়ি বা আমার দেহকে ফিরিয়ে পেতে পারি এমন কোন আভাস, ইঙ্গিত, কোথাও দেখতে পেলাম না। পাগলের মতন যখন ড্রয়ারগুলোকে আঘাত করে ভাঙতে শুরু করেছি, সেই সময় বাড়ীর বাট্‌লার তুজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে জোর করে আমাকে এসে বাধা দিল।

এই হলো আমার পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আমার এই প্রলাপ কেউই বিশ্বাস করবে না। মস্তিষ্ক বিকৃত বলে আমার চিকিৎসা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে আমি নজরবন্দীরূপে বাস করছি। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেনি—বিন্দুমাত্র না ; সেই কথা প্রমাণ করবার জন্যই আমার এই কাহিনী লিখতে বসেছি এবং এমনভাবে লিখছি, যাতে সামান্য একটা সূত্রও না বাদ যায়। আমি আমার পাঠকদের অনুরোধ করছি, তাঁরা আমার এই কাহিনী পড়ে বিচার করে দেখুন, এর লেখার ভঙ্গীর মধ্যে কিংবা গল্প-পরিচালনার মধ্যে কোথাও কোন মস্তিষ্ক-বিকৃতির চিহ্ন আছে কি না। একটি বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, স্থবির দেহের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে আমার যৌবনদীপ্ত আমি,—এই সহজ সত্যটি লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। যারা আমার এই কাহিনী বিশ্বাস করে না, স্বভাবতই

তারা আমাকে পাগল বলে ধরে নিয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমার সেক্রেটারীদের নাম আমি জানি না, যে সব ডাক্তার আমাকে দেখতে আসে তাদের আমি চিনি না, আমার ভৃত্য বা প্রতিবেশী কাউকেই আমি জানি না, এমন কি, যে সহরে আমি এসে পড়েছি, তার নামও জানি না। তাই নিজের বাড়ীতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি এবং তার দরুণ হাজার রকমের অসুবিধা ভোগ করি। তাই আমি যে সব প্রশ্ন করি, যারা শোনে স্বভাবতই তাদের অদ্ভুত লাগে। তাই একান্ত স্বভাবতই আমি হতাশায় কেঁদে উঠি মাঝে মাঝে। কোন আশার চিহ্ন কোথাও দেখতে পাই না। টাকা পয়সা আমার কিছুই নেই, চেক-বইও নেই। ব্যাঙ্ক আমার স্বাক্ষর স্বীকার করতে চায় না কারণ যদিও আমার হাত এখন জরাজীর্ণ কিন্তু তাতে ইডেনের অভ্যাস-মত ইডেনের হস্তাক্ষরই বেরিয়ে পড়ে। আমি যে নিজে ব্যাঙ্কে যাব, তাও এরা আমাকে যেতে দেবে না। বুঝছি, এই সহরে কোন ব্যাঙ্ক নেই এবং লণ্ডনের কোন একটা ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে। এভস্‌হ্যাম যে তার সলিসিটরের নাম বাড়ীর কাউকে জানায় নি, এটা তাদের কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারি। এভস্‌হ্যাম মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিল, তাই আমি এই ঘটনা সম্বন্ধে যে-সব কথা বলতে যাই, তারা মনে করে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলেই এই মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে আমি ছিলাম যৌবন-উদ্বেল একজন তরুণ, আমার সামনে ছিল জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ-সম্ভার। আর আজ আমি ক্রোধান্ধ, জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, অসহায়; সম্পূর্ণ অজানা বিরাট এক বাড়ীর ভিতরে বিপুল আসবাবের মধ্যে আর্ত, বন্য জন্তুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি···পাগল বলে সবাই আমাকে চোখে চোখে রেখেছে, সযত্নে সব বিষয় এড়িয়ে চলেছে। আর ঠিক এই সময়ে লণ্ডনে এভস্‌হ্যাম বলিষ্ঠ যৌবনদীপ্ত দেহ নিয়ে

সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন সম্ভোগ করে চলেছে, তার চরম সৌভাগ্য,...... আমার কাছ থেকে পাওয়া যৌবন-দীপ্ত দেহের আড়ালে আছে তার নিজের তিনকুড়ি আর দশ বছরের তিল তিল সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে চুরি করে নিয়েছে আমার জীবন।

কী ভাবে কী যে ঘটল, তা আমি স্পষ্ট করে জানি না। পড়বার ঘরে দেখলাম, রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি, মানুষের স্মরণ-শক্তির বিজ্ঞান-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা,—তার ধারে ধারে দেখছি সাঙ্কেতিক ভাষায় কি সব লেখা; তার পাঠোদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পাণ্ডুলিপির কোন কোন অংশ থেকে বোঝা যায় যে সে অঙ্কশাস্ত্রের দর্শন সম্বন্ধেও মাথা ঘামাত। আমার সিদ্ধান্ত হল, তার সমস্ত স্মৃতি যা তিল তিল করে তার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিল, সে তার ক্ষয়মান মস্তিষ্ক থেকে আমার মস্তিষ্কে চালিয়ে দেয় এবং ঠিক অনুরূপ কোন পদ্ধতিতে আমার স্মৃতিকে তার পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে চালিয়ে দেয়। কার্যতঃ সে এক দেহ থেকে আর এক দেহে নিজেকে পরিবর্তিত করল। কিন্তু কী ভাবে যে এই ঘটনা সম্ভব হতে পারে, তা আমার দর্শন-বুদ্ধির বাইরে। আমার যেটুকু চিন্তাময় জীবন ছিল তাতে আমি বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকই ছিলাম, কিন্তু এক্ষেত্রে সহসা দেখতে পেলাম যে মানুষ জড় বস্তু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও করতে পারে।

শেষ অবলম্বন স্বরূপ একটা চরম পরীক্ষা করে আমি দেখব। সেই বিষয়টা স্থির করে আমি লিখতে বসেছি। খাবার সময় একটা টেবিল-ছুরি আমি লুকিয়ে সরিয়ে রেখেছিলাম। তার সাহায্যে এই লেখবার ডেস্কের ভিতরে সম্পূর্ণ গোপন এক ড্রয়ার আমি ভেঙে দেখেছি যে তার ভিতরে একটা ছোট সবুজ কাঁচের শিশি রয়েছে, শিশির ভিতরে শাদা মতন কি একটা গুঁড়ো আছে। শিশিটার ঘাড়ের কাছে একটা লেবেলে শুধু একটা কথা লেখা রয়েছে, মুক্তি। হয়ত এটা—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই, বিষ। যদি এত যত্নে শিশিটাকে লুকিয়ে না রাখা হত, তাহলে আমি অনায়াসেই

ধরে নিতে পারতাম যে, এভস্‌হ্যাম আমারই জন্যে এই বিষ রেখে দিয়ে গিয়েছে, যাতে করে এই বিষ গ্রহণের ফলে আমি মরে যাই ; কারণ তার এই কার্যের একমাত্র সাক্ষী আমিই। এভস্‌হ্যাম নিশ্চয়ই অমরত্বের সন্ধান পেয়ে গিয়েছে ! আকস্মিকতার কথা বাদ দিয়ে, একথা অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, সে পরমানন্দে আমার দেহে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাস করবে। তারপর কালক্রমে যখন সে দেহ আবার বৃদ্ধ হয়ে আসবে, তখন সেটাকে আবার ফেলে দিয়ে, নতুন কোন তরুণ দেহকে ফাঁদে ফেলে তার যৌবন ও শক্তিকে গ্রহণ করবে। তার হৃদয়হীনতার কথা স্মরণ করে স্তম্ভিত হতে হয়, কিন্তু যখন ভাবি, এইভাবে দেহ থেকে দেহান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে সে কী অসামান্য জ্ঞান আর অভিজ্ঞতারই অধিকারী না হবে······আচ্ছা, কতদিন ধরে সে এইভাবে এক দেহ থেকে আর এক দেহে পরিক্রমণ করে আসছে ?···কিন্তু আর লিখতে পারছি না ; ক্লান্তি ছেয়ে আসছে···দেখছি গুঁড়োটা জলে গলে গেল···স্বাদটা খুব খারাপও নয়······

মিঃ এভস্‌হ্যামের ডেস্কের ওপর যে কাহিনীর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তা এইখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডেস্ক আর চেয়ারের মাঝামাঝি তাঁর মৃতদেহ পড়ে ছিল। চেয়ারটা উলটে পড়ে ছিল, মনে হয় মৃত্যু-যন্ত্রণার শেষ আক্ষেপের দরুণই উলটে যায়। পাণ্ডুলিপিটি পেন্‌সিলে খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় অক্ষরে লেখা, সাধারণতঃ মিঃ এভস্‌হ্যাম ধরে ধরে ছোট ছোট স্পষ্ট অক্ষরে যেভাবে লিখতেন, তা নয়। এই সম্পর্কে মাত্র দুটি বিচিত্র ব্যাপার উল্লেখ করা এখনো বাকি আছে। একথা আজ সুনিশ্চিত যে, ইডেন আর এভস্‌হ্যামের মধ্যে একটা কিছু যোগাযোগ ছিল কারণ এভস্‌হ্যামের মৃত্যুতে তার সমস্ত সম্পত্তি তরুণ ইডেনের ওপরই বর্তায়। কিন্তু ইডেন সে সম্পত্তি গ্রহণ করবার সুযোগ পায় নি। যখন এভস্‌হ্যাম আত্মহত্যা করে, আশ্চর্যের ব্যাপার, ইডেন তার আগেই পরলোক গমন করেছে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে, গাওয়ার ষ্ট্রীট যেখানে ইউষ্টোন রোডের সঙ্গে মিশেছে, সেই

জনাকীর্ণ মোড়ের মাথায় রাস্তা পার হবার সময় সে একটা গাড়ীর ধাক্কায় আহত পড়ে যায় এবং সেইখানেই তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং এই অলৌকিক কাহিনীর রহস্য ভেদ করবার উপযুক্ত যে একটি মাত্র লোক ছিল, সে-ও এইভাবে সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এইচ্ জি ওয়েল্সের এই বইগুলোর অনুবাদও
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়েছে—

- দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো (২য় সংস্করণ) ২৲
- দি ইনভিজিব্ল্ ম্যান (২য় সংস্করণ) ১৷০
- দি ওয়ার অব্ দি ওয়ার্লডস্ ২৲
- দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন ২৲

এর পরে বেরোবে

- দি ফুড অব্ দি গডস্
- দি স্লীপার এ্যায়োয়েকস্